পাওয়া যায়,—কিন্তু সম্পূর্ণ বোধগম্য ভাবে নয়। Dr. Lengyel-এর বইখানি Hitler-বিরোধী হলেও, Mein Kampf-এর পাশাপাশি পড়লে সম্ভবতঃ হিট্লার-স্বজীবনীর অবোধ্য অংশগুলি সরল হয়ে আসে।

Mein Kampf-এর অসাধারণ কিশোর বা বালকটি যা হিট্লার পাঠককে স্বীয় Vienna প্রবাসকালীন প্রতিকৃতি ব'লে বিশ্বাস করাতে চান,—Dr. Lengyel-এর কলমের খোঁচায় তার চেহারা দাঁড়ায় একজন সাধারণ ছোক্‌রা রাজমজুরের। হিট্লারের বাবা ছিলেন অষ্ট্রো-ব্যভেরীয় সীমান্তের সামান্য শুল্কবিভাগীয় নায়েব। তাঁর মা ছিলেন জাতিতে Czech ; বংশগত টিউটন্ আভিজাত্য—বা নর্ডিক প্রাধান্যবাদের মূলে যে সহজ বীজ থাকে হিট্লারের ভিতর তা নেই। হিট্লার্ নর্ডিক্ নন্ ; তিনি যে মিশ্র আল্পীয়, তা আমরা তাঁর চেহারা এবং বংশাবলী থেকে জান্‌তে পারছি। একজন আল্পীয়ের পক্ষে নর্ডিক্ প্রাধান্যবাদ প্রচার করা যে শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচায়ক—তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশেও আমাদের পরিচয় আছে। হিন্দুর পক্ষে হিন্দুপ্রাধান্য, এ্যাংলো-স্যাক্সন্ বা টিউটনের পক্ষে নর্ডিকপ্রাধান্য অথবা নিগ্রোর পক্ষে নিগ্রোপ্রাধান্য বিশ্বাস করা স্বাভাবিক,—যদিও অপরের পক্ষে তা কষ্টকর। কিন্তু মঙ্গোলীয়ের পক্ষে য়িহুদিজাতির প্রাধান্য প্রচার করা অশোভনীয় ও অস্বাভাবিক, অপরের পক্ষে কষ্টকর তো বটেই। হিট্লার্ চরিত্রের এই বিশেষ বিকৃতিগুলি রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ববিদের অনুশীলনযোগ্য।

শ্রীপ্রতাপকুমার বসু

প্রকাশক—শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগদ্বন্ধু দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

পরিচয়

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বার্ষিক ৪।০

প্রতি সংখ্যা ১৲

দ্বিতীয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

বিষয় সূচী

পুস্তক-পরিচয়

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

পরিচয়

আগামী ১লা শ্রাবণ ১৩৪০-এ পরিচয়ের তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা বাহির হইবে। গত দুই বৎসর ধরিয়া এই ত্রৈমাসিক পত্রিকাখানি সাহিত্য-রসিক ও বিদ্বজ্জন-সমাজে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে তাহা ইহার পাঠক-সমাজ নিশ্চয়ই অবগত আছেন। যে উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা এ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম পরিচয়ের সে ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সাধ্যমত প্রয়াস আমরা পাইয়াছি। আগামী বৎসরের পরিচয়কে আরো সমৃদ্ধিশালী করিবার আয়োজন চলিতেছে। এই আয়োজন সার্থকতালাভ করিবে গ্রাহক ও পাঠক গোষ্ঠীর সাহায্যে। সুতরাং যাঁহারা বর্ত্তমানে পরিচয়ের গ্রাহক আছেন তাঁহাদের প্রতি নিবেদন—তাঁহারা আগামী বৎসরের পরিচয়ের বার্ষিক মূল্য ৪৷৹ আনা মনিঅর্ডার করিয়া ১৫ আষাঢ়, ১৩৪০-এর মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন। পরিচয়কে যাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখেন, পরিচয় যাঁহাদের প্রিয় তাঁহারা নিজেদের বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়া গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ইহার প্রচার ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহায়তা করিবেন—এই অনুরোধও আমরা সকলকে জানাইতেছি। যদি একান্তই কোন গ্রাহক আপাততঃ পরিচয়ের গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হন, তিনি একখানি পত্রে সে-কথা আমাদের সময়মত জানাইয়া দিবেন। ৩১শে আষাঢ়ের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা টাকা পাঠাইবেন না—আগামী তৃতীয়বর্ষের প্রথম সংখ্যা আমরা যথারীতি তাঁহাদের নামে ভিঃ পিঃ করিব।

আশা করি, ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদের কেহ ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

পরিচয় কার্য্যালয়
ষ্টিফেন হাউস, রুম নং ১৭
৪।৫, ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫

তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।৬।২

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪০

পরিচয়

মুক্ত বা 'অস্তং গতঃ'

মুক্তি=ব্রাহ্মী স্থিতি

মোক্ষবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, যাহাকে মোক্ষ বা মুক্তি বলা হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ব্রহ্ম-সাযুজ্য' অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভবন।

ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি—বৃহ, ৪।৪।৬
ব্রহ্ম বিদ্বান্ ব্রহ্ম অভিপ্রৈতি—কৌষী, ১।৪
ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক, ৩।২।৯

ইহারই নামান্তর অমৃতত্ব-সিদ্ধি—

বিদ্বান্ ব্রহ্ম, অমৃতঃ অমৃতম্—বৃহ, ৪।৪।১৭
যে তদ্ বিদুঃ অমৃতাস্তে ভবন্তি—বৃহ, ৪।৪।১৪
তমেব বিদিত্বা অতি মৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—শুক্ল যজুঃ, ৩১।১৮

ঐ ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা অমৃতত্ব-সিদ্ধি যে দেহান্তে পরলোকেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই—দেহসত্ত্বে ইহলোকেও হইতে পারে।

এবং মুক্তি-ফলানিয়মঃ তদবস্থাবধৃতেঃ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫২

কেননা, মোক্ষ প্রতিবন্ধ-ক্ষয় বা 'অন্তরায়ধ্বস্তি'র উপরই নির্ভর করে। ঐহিক বা ইহলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম জীবন্মুক্তি—

অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি অত্র (অর্থাৎ ইহলোকে) ব্রহ্ম সমশ্নুতে—বৃহ, ৪।৪।৭
ইহ (এখানে) চেদ্ অবেদীদ্, অথ সত্যম্ অস্তি—কেন ২।১৩

—এবং আমুষ্মিক বা পরলোকে-সিদ্ধ মুক্তির পারিভাষিক নাম ক্রমমুক্তি।

অতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাৎ লোকাদ্ অমৃতা ভবন্তি—কেন, ২।৫
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে—মুণ্ডক, ৩।৬।২

এ প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

তস্মাৎ ঐহিকম্ আমুষ্মিকং বা বিদ্যা-জন্ম (অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহার ফল মুক্তি) প্রতিবন্ধ-ক্ষয়াপেক্ষয়া স্থিতম্ ইতি

ঐহিকম্ অপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে, তদ্ দর্শনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৩।৪।৫১

কিন্তু ঐ মুক্তি ঐহিকই হউক আর আমুষ্মিকই হউক, এভাবে দেখিলে, উহা ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ব্রাহ্মী স্থিতি, ব্রহ্মের সহিত একীভাব।

তস্য তাবদ্ এব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে—ছান্দোগ্য, ৬।১৪।২

'মোক্ষের অনন্তর, মুক্তির নিরন্তর ব্রহ্ম-সংপত্তি'—সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি (ছান্দোগ্য, ৬।৮।১)

তখন সেই সনাতন চিরন্তন, অজর অমর অক্ষর সতের সহিত, ব্রহ্মের সহিত, জীবের একীভাব হয়।

ঐ একীভূত ব্রহ্মিষ্টকে, ঐরূপ ব্রহ্মে স্থিত পুরুষকে যাজ্ঞবল্ক্য 'প্রতিবুদ্ধ' বলিয়াছেন—

যস্যানুবিত্তঃ প্রতিবুদ্ধ আত্মা
অস্মিন্ সংদেহে গহনে প্রবিষ্টঃ।—বৃহ, ৪।৪।১৩

'এই গহন (অনর্থ-সংকুল) দেহে প্রবিষ্ট হইয়া যাঁহার আত্মা অনুবিত্ত (ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে, তিনি 'প্রতিবুদ্ধ'।

'প্রতিবুদ্ধ' কেন? যেহেতু, তিনি মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়াছেন। তাই শাক্যসিংহের সার্থক নাম বুদ্ধ—কারণ, তিনি সম্বুদ্ধ—সম্যক্ জাগরিত—'The fully wake One'।

অনাদি মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজম্ অনিদ্রম্ অস্বপ্নম্ অদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥—মাণ্ডূক্যকারিকা, ১।১৬

'অনাদি-মায়া-ঘোরে সুপ্ত জীব যখন জাগরিত হয়, * তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে-ই স্বয়ং জন্মহীন নিদ্রাহীন স্বপ্ন-হীন দ্বৈতহীন ব্রহ্মতত্ত্ব।'

মজ্ঝিমনিকায়েরও ঐ কথা—

ধম্মং দেসিয়মানে চিত্তং পক্খন্দতি, পসীদতি সংতিট্‌ঠতি বেনিঞ্চতি।

'তখন চিত্ত উদ্‌বুদ্ধ হয়, প্রসন্ন হয়, সন্তুষ্ট হয়, অক্ষোভিত হয়।'

সেইজন্য কঠ-উপনিষদ্ মোক্ষকামীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—কঠ, ৩।১৪

'উঠ, জাগ, প্রবুদ্ধ হইয়া সদ্‌গুরুর সকাশে 'বোধি' সঞ্চয় কর'—ইহ-জীবনে স-শরীরেই কর—

---

*He *awakes* of the long dream of life, dreamt during *Sansara* and finds (it) resting upon the delusion that his real essence has something in common with the components of his personality (অর্থাৎ তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ) —The Doctrine of the Buddha, pp. 334 and 340.

এই Delusion বা মায়া অনাদি-সিদ্ধ (অনাদি মায়য়া সুপ্তঃ)—সেইজন্য Grimm ইহাকে 'Gigantic and *incessant* self-mystification' বলিয়াছেন।

ইহ চেদ্ অশকদ্ বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ—কঠ ৬।৪

'যদি শরীর ভ্রংশের পূর্ব্বেই প্রবুদ্ধ হইতে পার,' তবে—

প্রতিবোধবিদিতং মতম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেন, ২।৪

—প্রতিবোধ-বেদ্য সেই 'তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে' জানিয়া ব্রহ্ম-সাযুজ্যলাভ করতঃ অমৃতত্বের অধিকারী হইবে। ইহারই নাম মোক্ষ।

ব্রহ্মে স্থিতি না স্বরূপে অবস্থান?

অন্য ভাবে দেখিলে, মোক্ষকে ব্রহ্মসাযুজ্য না বলিয়া জীবের 'স্ব-রূপে অবস্থান' বলা যাইতে পারে।

সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।৪।১ 'মোক্ষে জীবের স্ব-রূপ-আবির্ভাব।'

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্ব-রূপস্য। (মোক্ষে) যং দশা-বিশেষং আপদ্যতে, স স্ব-রূপাবির্ভাবরূপঃ, ন অপূর্ব্বাকারোৎপত্তিরূপঃ—রামানুজ ভাষ্য।

এ সম্পর্কে ছান্দোগ্য-উপনিষদের উপদেশ স্মরণীয়—এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে—৮।৩।৪

'এই 'সম্প্রসন্ন' জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ উপসন্ন হইয়া স্ব-রূপে স্থিত হন।'

যাজ্ঞবল্ক্য এই ভাবেই জীবকে 'স্বয়ং জ্যোতিঃ' বলিয়াছেন এবং জীবের 'স্বেন ভাসা, স্বেন জ্যোতিষা'র উল্লেখ করিয়াছেন (বৃহ, ৪।৩।৯)।

বৌদ্ধেরা, জীবের এই 'স্ব-রূপে অবস্থান'কে লক্ষ্য করিয়া নির্ব্বাণ-দশার বর্ণনায় বলেন—

He reposes in the boundlessness and infinitude of his own highest essence. (Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 359.)

This, his inscrutable essence, the Saint (the Perfected One) enters, to it he withdraws, in it he rests. (Ibid, p. 196).*

---

* সম্ভবতঃ এই 'Inscrutable, Essence'ই বুদ্ধদেবের কথিত 'বিজ্ঞানধাতু', as opposed to 'বিজ্ঞানস্কন্ধ'। মৈত্রেয়ী-উপনিষদ্ ইহাকে 'প্রত্যক্ ধাতু' বলিয়াছেন—

অনন্দাব্ধিঃ পরঃ সোঽহমস্মি
প্রত্যক্ ধাতুর্ন তত্র সংশীতিরস্তি—১।১১

ঐ 'বিজ্ঞানধাতু' বিজ্ঞানস্কন্ধ নহে। বিজ্ঞান-ধাতু সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উক্তি এই :—বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সর্ব্বতোপহং—(দীঘনিকায়, ১১)

অর্থাৎ বিজ্ঞানধাতু 'is invisible, boundless, all penetrating'

ঐ বিজ্ঞানস্কন্ধ অন্যান্য চারিটি স্কন্ধের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের 'Personality' রচনা করে। ঐ Personality আমার প্রকৃত 'আমি' নহে। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—'তং ন এতং মম, ন এসোহম্ অস্মি, ন মে সো অত্তাতি— This does not belong to me, this am I not, this is not myself (মজ্ঝিমনিকায় 28th Discourse) ; কারণ, our true essence lies behind our personality (Grimm, p. 227). *All* determinants within us have nothing to do with our *essence,* which is not subject to the laws of arising and passing away (Ibid, p. 312).

এই Inscrutable Essence-ই হিন্দুর লোকোত্তর আত্মা (Transcendental Self)—যাজ্ঞবল্ক্য যাহাকে 'অসঙ্গ পুরুষ,' জীবের 'অতিচ্ছন্দ অপহতপাপ্মা অভয় রূপ' বলিয়াছেন—

তদ্ বা অস্য এতৎ অতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্মা অভয়ং রূপম্—বৃহ, ৪।৩।২১
অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।১৫-৬ ও ৪।৩।২২

যেহেতু ঐ Essence লোকোত্তর (transcendental), সেইজন্য ঐ 'স্ব-রূপ'কে উদ্দেশ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫
যিনি বিষয়ী (বিষয় নহেন), যিনি দ্রষ্টা (দৃশ্য নহেন), যিনি জ্ঞাতা (জ্ঞেয় নহেন) —তাঁহাকে, সেই pure subject-কে জানিবে কি প্রকারে ?

সেই আত্মা যে, নেতি নেতি—

স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—বৃহ, ৪।২।৪
'ঐ আত্মা নেতি নেতি—নির্দ্দেশের অতীত। তিনি অগ্রাহ্য—কথনও গৃহীত (বিদিত) হন না।'

বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

The Atma, our kernel, cannot be grasped at all, by means of cognition. × × × The true one is therefore not to be discovered as an object of cognition × × it is transcendent. (Grimm's Doctrine of the Buddha, pp. 499 and 515).

আমরা জানিয়াছি যে, চতুর্বেদ 'মহাবাক্যে' সমস্বরে জীব-ব্রহ্মের একত্ব ঘোষণা করেন—সোহং, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। বলা বাহুল্য, এই যে অহং ও ত্বং, এই যে আত্মা—ইনি জীবাত্মা নহেন—সেণ্ট পল যাহাকে Soul বলিয়াছেন সেই soul নহেন, ইনি প্রত্যগাত্মা (Monad)—সেণ্টপলের 'Spirit'।

পরমাত্মা (ব্রহ্ম) যখন অমৃত, তখন এই প্রত্যগাত্মাও নিশ্চয়ই অমৃত। যাজ্ঞবল্ক্য 'অন্তর্যামী'-ব্রাহ্মণে এই কথা ভূয়োভূয়ঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ (বৃহ, ৩।৭।৩-২৩)। এই 'ধ্রু' (Formula) তাঁহার মুখে একবার নয়, দুইবার নয়, ঐ স্থলে একুশবার শুনিতে পাই। আমরা আরও জানিয়াছি যে, ব্রহ্মে স্থিতি হইলে অমৃতত্ব লাভ হয়—

ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি (ছান্দোগ্য, ২।২৩।১)—বিদ্বান্ ব্রহ্ম অমৃতঃ অমৃতম্ (বৃহ, ৪।৪।১৭) 'অমৃত ব্রহ্মকে জানিলে অমর হওয়া যায়।'

জীবের স্বরূপে অবস্থানেরও ঠিক্ ঐ ফল—কারণ, এষ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ এবং ঐ অবস্থায় জীব 'realises his true nature'।

তদ্ ইদমপি এতর্হি য এবং বেদ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি। তস্য হ ন দেবাশ্চন অভূত্যৈ ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি—বৃহ, ১।৪।১০
'অতএব অদ্য ও এখানে যিনি জানিতে পারেন 'আমিই ব্রহ্ম', তিনি এ সমস্তই হন। দেবতাদের সাধ্য নাই—তাঁহার ঐ ভাব বারণ করিবে। কারণ তিনি এ সকলেরই আত্মা হন।'

ইহাই জীবের স্ব-রূপে অবস্থান। সাংখ্যেরা ইহাকে 'কৈবল্য' বলেন।

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি—যোগসূত্র, ৪।৩৪
তৎ পুরুষস্য কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাস-ভাষ্য

ইহাই মুক্তি—তখন পুরুষঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে (১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য)

তুরীয় ও মোক্ষ

আমরা জীববাদের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, জীবের সুষুপ্তি যখন প্রগাঢ় হয়, নিবিড় হয়—তখন জীব 'প্রাজ্ঞ আত্মা' কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া (অর্থাৎ প্রত্যগাত্মার সহিত একীভূত হইয়া) স্ব-স্বরূপে অবস্থিত হওয়ায়, বাহ্য বা অন্তর কিছুই জানে না।

এবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেন আত্মনা সংপরিষ্বক্তঃ ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্—বৃহ, ৪।৩।২১

অর্থাৎ সে অবস্থায় বিবিধতা, বিচিত্রতা, নানাত্ব বিলুপ্ত হওয়ায় জীবের একাকার অনুভূতি হয়। (পরিচয়, প্রথম বর্ষ ৫৫৭-৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং তখন ভেদাভেদৌ সপদি গলিতৌ—সমস্ত ভেদাভেদ তিরোহিত হয়—all distinctions are obliterated। যাজ্ঞবল্ক্য এই অবস্থার বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকাঃ, দেবা অদেবাঃ, বেদা অবেদাঃ। তত্র স্তেনঃ অস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, চাণ্ডালঃ অচাণ্ডালঃ, পৌল্কসঃ অপৌল্কসঃ, শ্রমণঃ অশ্রমণঃ, তাপসঃ অতাপসঃ। অনন্বাগতং পুণ্যেন, অনন্বাগতং পাপেন—বৃহ ৪।৩।২২

'তখন পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হন। ঐ অবস্থায় স্তেন (চোর) অস্তেন হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন। তখন পুণ্য ও পাপ অননুগত হয়।'

ঐ প্রগাঢ় সুষুপ্তি-অবস্থায় বিষয়-বিষয়ীর (subject and object-এর) দ্বৈত বিগলিত হইয়া সাময়িক ভাবে অদ্বৈতে স্থিতি হয়।

The transition is × × from the consciousness of being this or that to the consciousness of being all—whereby subject and object become one.—Deussen, p. 142.

এই সুষুপ্তির উপর তুরীয় অবস্থা—তখন স্বরূপে অবস্থানের ফলে ঐ একাকার ভাব আরও নিবিড়তর হয়।

অবস্থাত্রয়-ভাবাভাব-সাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা, তদা তুরীয়ং চৈতন্যম্ ইত্যাচক্ষতে—সর্ব্বসার-উপনিষদ্ অর্থাৎ—'the spiritual that subsists alone by itself—as a substance undifferentiated, set free from all existing things.'

ইহাই সমাধি-অবস্থা। জীবের সুষুপ্তি স্বভাবজ—কিন্তু এই সমাধি যোগজ, সুদীর্ঘসাধন-সাপেক্ষ।

কিন্তু সুষুপ্তিই হ'ক, আর সমাধিই হ'ক, সেই সেই অবস্থায় অন্তরাত্মার সহিত (with the eternal knowing subject) জীবের যে একীভাব হয়, তাহা সাময়িক মাত্র। ঐ স্বরূপে-অবস্থান অস্থায়ী (a transcient union)—ঐ যোগ 'প্রভাবাপ্যয়ৌ'—উহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য নিবিড় সুষুপ্তি বা তুরীয়ের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, জনক তাঁহাকে বলিলেন—অতঃ উর্দ্ধং বিমোক্ষায় এব ব্রূহি—'ইহ বাহ্য, পরে কহ আর'। তুরীয়ের উপরের যে অবস্থা, উহাই মোক্ষ। মোক্ষ সেই অবস্থা (condition)—যাহাতে ঐ স্বরূপে সমাপত্তি সুস্থিত, স্থায়ী ও অচ্যুত হয় ('becomes fixed, established and permanent')।

যাজ্ঞবল্ক্য ঐ মোক্ষের প্রতি জনকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—

সলিল একো দ্রষ্টা অদ্বৈতো ভবতি, এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাট্।—বৃহ ৪।৩।৩২

'মুক্ত পুরুষ সলিলের ন্যায় ভেদরহিত, দ্রষ্টা (সাক্ষী, * Sole Subject without Objects) এবং অ-দ্বৈত (One without a second)। হে সম্রাট্! ইহাই ব্রহ্মলোক।'

বলা বাহুল্য এ 'লোক' স্থান নহে, স্থিতি—place নহে, state—এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (গীতা, ২।৭২)। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, এখানে ব্রহ্ম-লোক ব্রহ্মণঃ লোকঃ নহে—ব্রহ্ম এব লোকঃ।

এষাস্য পরমাগতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষোস্য পরমোলোকঃ এষোস্য পরম আনন্দঃ—বৃহ, ৪।৩।৩২

'উহাই জীবের পরমাগতি, উহাই পরম সম্পদ্, উহাই পরম লোক, উহাই পরমানন্দ।'

---

*He (মুক্ত পুরুষ) takes 'his stand as a complete stranger (উদাসীনবৎ আসীনঃ) and thereby as a free man, over against the world, including the elements of his own personality.'—The Doctrine of the Buddha, p. 336.

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীর নিকট যে মোক্ষ-তত্ত্বের বিবৃতি করিয়াছেন, তাহা আরও গভীর, আরও অগাধ।

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এব, এবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব। এতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুত্থায়, তন্যেব অনু বিনশ্যতি—ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইত্যরে ব্রবীমি—বৃহ, ৪।৫।১৩

'যেমন সৈন্ধবখণ্ড (lump of salt) অনন্তর—অবাহ্য (অন্তর-রহিত ও বাহ্য-রহিত), সর্ব্বত্র রসঘন—তেমনি অরে! এই আত্মা অনন্তর অবাহ্য কৃৎস্ন-বিজ্ঞানঘন। অর্থাৎ 'নূর-তামাম' (কবীর)। এই আত্মা সমুদায় ভূত হইতে (পঞ্চভূতের সংঘাত দেহ হইতে—অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায়) সমুত্থিত হইয়া, তাহাদের অনুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হন। দেহের বিগমে (প্রেত্য) তাঁহার সংজ্ঞান থাকে না।'

যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে বৈনাশিকের (Nihilist-এর) কথার ঐরূপ প্রতিধ্বনি শুনিয়া মৈত্রেয়ী চঞ্চল হইয়া বলিলেন, 'স্বামিন্! এ কি বলিলেন? আমাকে যে গভীর মোহে নিক্ষেপ করিলেন! আমি যে কিছুই বুঝিতেছি না—

অত্রৈব মা ভগবান্ মোহান্তম্ আপীপিপৎ, ন বা অহম্ ইমং বিজানামি—বৃহ, ৪।৫।১৪

উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—'অয়ি! শঙ্কিত হইও না—আমি মোহকর কিছুই বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি—এই আত্মা 'অবিনাশী অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'—অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা (বৃহ, ৪।৫।১৪) —আত্মার উচ্ছেদ নাই বিনাশ নাই—আত্মা অব্যয়, অক্ষয়, অদ্বয়। কিন্তু যে মোক্ষদশার কথা বলিলাম, সে অবস্থায় যখন বিষয়-বিষয়ীর ভেদ অন্তর্হিত হয়, যখন subject ও object coalesce করে, যখন দ্বৈত স্তম্ভিত হয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান-রূপ ত্রিপুটী তিরোহিত হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে (as the pure objectless knowing subject) প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁহার সংজ্ঞান (consciousness) থাকিবে কিরূপে? দেখ—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং রসয়তে, তদিতর ইতরম্ অভিবদতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরং মনুতে, তদিতর ইতরং স্পৃশতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং রসয়েৎ, তৎ কেন কম্‌অভিবদেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং স্পৃশেৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৫।১৫

'যে অবস্থায় দ্বৈত যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে স্পর্শন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে। কিন্তু যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে? কে

কাহাকে আঘ্রাণ করিবে ? কে কাহাকে স্বাদন করিবে ? কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে মনন করিবে ? কে কাহাকে স্পর্শন করিবে ? কে কাহাকে বিজ্ঞান করিবে ?'

যাজ্ঞবল্ক্য এই কথাই অন্যত্র একটু ভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন—

যত্র বা অন্যৎ ইব স্যাৎ তত্র অন্যঃ অন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যঃ অন্যৎ জিঘ্রেৎ, অন্যঃ অন্যৎ রসয়েৎ, অন্যঃ অন্যৎ বদেৎ, অন্যঃ অন্যৎ শৃণুয়াৎ, অন্যঃ অন্যৎ মন্বীত, অন্যঃ অন্যৎ স্পৃশেৎ, অন্যঃ অন্যৎ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।৩১

'যে অবস্থায় অন্য যেন থাকে, তখনই একে অন্যকে দর্শন করে, একে অন্যকে আঘ্রাণ করে, একে অন্যকে স্বাদন করে, একে অন্যকে বচন করে, একে অন্যকে শ্রবণ করে, একে অন্যকে মনন করে, একে অন্যকে বিজ্ঞান করে।'

কিন্তু যে অবস্থায় দ্বৈত তিরোহিত হয়, 'অন্য' থাকেই না, উপাধি 'সপদি গলিত' হয়—তখন আত্মার সংজ্ঞান থাকিবে কিরূপে ? অতএব—

ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।

অর্থাৎ মুক্তদশায় বিদেহী আত্মা—The imperishable, indestructible Atma (অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা আত্মা) has no further consciousness of objects, because as knowing Subject, he has everything in himself, nothing outside of himself—consequently 'has no longer any contact with matter' (মাত্রা-অসংসর্গস্ত্ব অস্য ভবতি—মাধ্যন্দিনশাখা)—Deussen's Philosophy of the Upanishads, pp. 349-50.

ঐ মর্ম্মে অধ্যাপক ডয়সন অন্যত্র বলিয়াছেন—

It is the condition (of deep sleep) in which a man knows himself to be one with the universe, and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. × × × 'In it, there is no duality, no subject and object and consequently no consciousness in an empirical sense.'— কারণ, 'To be conscious means: There are objects for me' (Schopenhauer)—সেই কথা 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি'।

বৌদ্ধের দিক্ হইতে অধ্যাপক গ্রিম্ এই তত্ত্বই বুঝাইয়াছেন—

If we come to the true view of recognising everything as Anatta and thereby denying every predicate to our ego, then in that moment the ego ceases to be the subject, (i.e., being without object) ceases from its introduction by means of the I-idea into the world of experience. It vanishes again into nothing.—Grimm's Doctrine of the Buddha, p. 187.

অর্থাৎ 'Being all, he becomes nothing, because he ceases to have particular consciousness of anything.'

ইহাকেই বুদ্ধদেব 'শূন্যতা' বলিয়াছেন।

নাহং ক্বচনি কস্সচি কিংচন তস্মিং, ন চ মম ক্বচনি কিস্মিংচি কিংচনং নথি—মজ্ঝিমনিকায়।

'আমি কোন কুত্র নহি, কোন কাহারও নহি, কোন কিছুতে নহি ; কোন কিছু আমার নহে, কোন কেহ আমার নহে, কুত্র কিঞ্চিৎ আমার নহে।'

পুন চ পরং ভিক্খবে ! সারিপুত্তো ! সব্বসো বিঞ্ঞানানং চায়তনং সমতিক্কমা নত্থি কিঞ্চীতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি—মজ্ঝিমনিকায়, ৩

'পুনশ্চ হে ভিক্ষুগণ ! হে সারিপুত্র। (নির্ব্বাণী) বিজ্ঞান-আয়তন (sphere of boundless consciousness) সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া, 'কোন কিঞ্চিৎ নাই' এই ভাবে সিদ্ধ হইয়া অকিঞ্চন-আয়তনে (শূন্যতায়—sphere of Nothingness-এ) সুস্থিত হইয়া বিহরণ করেন।'

এই অবস্থাকে 'শূন্যতা' বলা খুব সঙ্গত নহে কি ? কারণ, 'Where all phenomenon has ceased, naming is gone' (Grimm).

'শূন্যতা-সিদ্ধি', 'প্রেত্য সংজ্ঞা নাস্তি'—'মোক্ষদশায় বিদেহী আত্মার সংজ্ঞান থাকে না, তিনি শূন্যতায় নিমজ্জিত হন'—এ সকল কথায়, যাঁহারা কোমল অধিকারী—যাঁহাদের মনের ধাতু সবল নহে, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী শ্লথ, অসংনদ্ধ—তাঁহারা যে শঙ্কিত হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। কারণ, 'সংজ্ঞা নাস্তি' বলায় আমরা চিন্তারাজ্যের এমন তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম, যেখানে তাঁহাদের শ্বাসরোধ হওয়া, যেখানে তাঁহাদের পক্ষে অস্বস্তি বোধ করা অবশ্যম্ভাবী। ঐরূপ কমল-বিলাসীদিগকে অধ্যাপক গ্রিম কৃপাপাত্র বলিয়াছেন—Shallow thinkers, who are still so closely bound up with their personality, that in their brains there is simply no room left for the idea of the ultra-mundaneness of their essence (The Doctrine of the Buddha, p. 164).

যে অবস্থায় জীবভাবের অভাব হইল, ব্যক্তিত্বের বিলোপ হইল, বিষয়-বিষয়ীর অন্তর্ধান হইল, ত্রিপুটী তিরোহিত হইল, এক কথায় নানাত্ব নিষিদ্ধ (negated) হইল—সেই মোক্ষের অবস্থাকে এইরূপ 'shallow thinker'-রা যদি 'নাস্তিত্ব' মনে করেন, তবে তাহা বিচিত্র মানিবার কারণ আছে কি ? তাঁহাদের এই সম্ভাবিত ভ্রম অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আত্মা চিরদিনই অবিনাশী—'অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা'। সেইজন্য মোক্ষের অবস্থায় বৃত্তির বিলোপ ঘটিলেও শক্তির বিলোপ হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য অতি হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ের বিবৃতি করিয়াছেন :—

যদ্ বৈ তন্ন পশ্যতি, পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি। নহি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি অন্যৎ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ। যদ্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি, জিঘ্রন্ বৈ তন্ন জিঘ্রতি। নহি ঘ্রাতুঃ ঘ্রাতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ জিঘ্রেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বদতি, বদন্ বৈ তন্ন বদতি। ন হি বক্তুঃ বক্তেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যদ্ বদেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন শৃণোতি শৃণ্বন্ বৈ তন্ন শৃণোতি, ন হি শ্রোতুঃ শ্রুতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততঃ অন্যৎ বিভক্তম্ যৎ শৃণুয়াৎ।

যদ্ বৈ তন্ন মনুতে মন্বানো বৈ তন্ন মনুতে, ন হি মন্তুঃ মতেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ মন্বীত।

যদ্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, স্পৃশন্ বৈ তন্ন স্পৃশতি, ন হি স্প্রষ্টুঃ স্পৃষ্টেঃ বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ,—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্যৎ বিভক্তং যৎ স্পৃশেৎ।

যদ্ বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি, ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতে বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ—ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি, ততঃ অন্য বিভক্তং যদ্ বিজানীয়াৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩-৩০

অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তিনি দর্শন করেন না। দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। দ্রষ্টার দৃষ্টি-শক্তি কখনও বিলুপ্ত হয় না, কারণ উহা অবিনাশী, কিন্তু যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি দর্শন করিবেন কিরূপে?

ঐ অবস্থায় তিনি আঘ্রাণ করেন না, আস্বাদন করেন না, বচন করেন না, শ্রবণ করেন না, মনন করেন না, স্পর্শন করেন না, বিজ্ঞান করেন না—ঘ্রাণ-শক্তির স্বাদ-শক্তির, বচন-শক্তির, শ্রবণ-শক্তির, মনন-শক্তির, স্পর্শন-শক্তির, বিজ্ঞান-শক্তির যে বিলোপ হয় তাহা নহে—ঐ সকল শক্তিই অবিনাশী, কিন্তু সে অবস্থায় যখন দ্বিতীয় থাকে না, তখন তিনি কিরূপে আঘ্রাণ বা আস্বাদন বা বচন বা শ্রবণ বা মনন বা স্পর্শন বা বিজ্ঞান করিবেন?' অর্থাৎ আত্মার কোন শক্তিরই বিলোপ ঘটে না—কারণ তিনিই—

এষ হি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ
—প্রশ্ন, ৪।৯

মুক্ত স্বধাম-গত

আর এক ভাবে দেখিলে, মুক্তিকে স্ব-রূপে অবস্থান না বলিয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের ঋষি জীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

হিত্বা অবদ্যং পুনরস্তম্ এহি—ঋগ্‌বেদ, ১০।১৪।৮

হে জীব! 'অবদ্য (অঞ্জন, stain) পরিহার করিয়া আবার 'অস্তে' ফিরিয়া আইস!'

আমরা এখন যেমন বলি সূর্য্য অস্ত গেলেন—'গতোঽস্তম্ অর্কঃ'—অথবা কালিদাস যেমন বলিয়াছেন:—

যাত্যেকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাম্—ওষধিপতি চন্দ্র অস্তশিখরে চলিলেন,

—বৈদিক যুগে 'অস্ত'-শব্দ সে অর্থে প্রযুক্ত হইত না। বেদের ভাষ্যকার সায়ন বলেন 'অস্তে'র অর্থ গৃহ, ধাম। নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

ঋণাবা বিভ্যদ্ ধনমিচ্ছমানো
অন্যেষাম্ অস্তম্ উপনক্তম্ এতি—ঋগ্‌বেদ ১০।৩৪।১০

'ঋণের ভয়ে ভীত ব্যক্তি ধন ইচ্ছা করিয়া রাত্রে অপরের 'অস্তে' (গৃহে) প্রবেশ করে।'

উপনিষদের স্থানে স্থানেও ঐ অর্থে 'অস্ত'-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বাণি বা ইমানি ভূতানি আকাশাদ্ এব
সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রতি অস্তং গচ্ছন্তি—ছান্দোগ্য, ১।৯।১
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।—মুণ্ডক, ৩।২।৮

বৈদিক ঋষি বলিলেন—'হিত্বা অবদ্যং'—'সমস্ত অবদ্য, সমস্ত অঞ্জন, মলা-মলিনতা পরিহার করিয়া 'অস্তে' ফিরিয়া আইস'। আমরা দেখিয়াছি, জীব প্রকৃতপক্ষে নিরঞ্জন—'শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপ'—কিন্তু দেহরূপ 'পুরে'র সহিত সংযুক্ত হইয়া সে 'পুরঞ্জন' হয়—

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষ আবিশৎ॥—বৃহ, ২।৫।১৮

সেইজন্য জীবের নাম 'পুরুষ'—পুরে যাহার বসতি। ঐ পুরের 'অঞ্জন' (stain) যেন তাহাকে উপরক্ত করে;

স বা অয়ং পুরুষঃ জায়মানঃ শরীরম্ অভিসম্পদ্যমানঃ পাপ্‌মভিঃ সংসৃজ্যতে
—বৃহ, ৪।৩।৮

তাই ঋষি বলিলেন, ঐ উপরাগ ধৌত করিয়া, শুভ্র স্বচ্ছ হইয়া, 'নিরবদ্য নিরঞ্জন' হইয়া স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন কর। এইরূপ স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত পুরুষই মুক্ত পুরুষ—তিনি অস্তং গতঃ।* বুদ্ধদেবও মুক্ত পুরুষকে 'অস্তং গত' বলিয়াছেন। তাঁহার নিজের মুখের বাণী এই—

—অথং গতস্‌স ন পমাণং (measure) অত্থি, যেন নং বজ্জু (বদেয়ুঃ) তং তস্‌স নত্থি (সুত্তনিপাত, ৫)

অধ্যাপক গ্রিম্ ঐ বাক্যের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন:—

—For him, who has gone home, there is no standard of measure এবং আমাদের স্মরণ করাইয়াছেন যে, 'Those acquainted with the older sans-

---

* গেটের Faust মহা নাটকেও আমরা এই ধরণের একটা কথা শুনিতে পাই। ফাউষ্ট বলিতেছেন—

Two souls alas! reside within my breast.
কে কে?—একজন মর্ত্তবিহারী, অন্যজন বিমানচারী—
One with tenacious organs holds, in love
And clinging lust, the world in its embraces.
The other strongly sweeps, (this dust above),
Into the high *ancestral* spaces,
ঐ Ancestral Spaces ই জীবের নিজ ধাম—তাঁহার 'অস্ত'।

krit literature will see at once that in the Pali word 'Attam gatam' is hidden the ancient well-known compound word, already found in the Vedas, 'Astamgata,' the root meaning of which is "gone home."

বুদ্ধদেব আরও বলিয়াছেন যে, পরিনির্ব্বাণী (মুক্ত পুরুষ = the Delivered One) 'is submerged in the Deathless'—

—তে পতিপত্তা অমতং (অমৃতং) বিগয্য লদ্ধা মুধা নিব্বাণং ভুঞ্জমানা— (সুত্তনিপাত)। গ্রিম্ বলেন—

'Neither this deathless Nirvana is thus my I; it is rather home in which I am submerged (The Doctrine of the Buddha, p. 51). কেননা, মুক্তিতে কি হয় ? (We) reach that realm (ধাম) our own proper realm (প্রকৃত স্ব-ধাম), "where there is neither birth nor sickness nor becoming old nor dying, nor woe, sorrow, suffering, grief and despair." (The Doctrine of the Buddha, p. 197).

নির্ব্বাণের এই বর্ণনার সহিত যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণনার তুলনা করুন— দেখিবেন, দুইটি একই সুরে বাঁধা।

যঃ অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুম্ অত্যেতি—বৃহ, ৩।৫।১
'যিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা, শোকমোহ, জরামৃত্যুর অতীত।'

আমাদের গন্তব্য স্ব-ধাম কি ? আমাদের 'মুলুক' (Real Home) কোথায় ?

কোন্ মুলুকসে আয়সি হংসা ? (কবীর)—হে হংস (জীব)! তুমি কুতঃ আয়াতঃ—তোমার আয়তি কোথা হইতে ? কুতঃ কোথা হইতে ? ব্রহ্ম হইতে—

From God who is our Home.—WORDSWORTH.

অতএব ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম—

ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সত আগম্য ন বিদুঃ সত আগচ্ছামহে ইতি—ছান্দোগ্য, ৬।১০।২

'এই সমস্ত প্রজা (creatures) সেই ব্রহ্ম হইতেই (যিনি 'তৎসৎ') বিচ্ছুরিত হইয়াছে'

For, man who is from God sent forth.—WORDSWORTH.

যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়—সেইরূপ।

যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেব অস্মাৎ আত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহ, ২।১।২০

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ—মুণ্ডক, ২।১।১
(ভাবাঃ=জীবাঃ—শঙ্কর)
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তি, ৩।১

ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়াই জীব সংসারচক্রে বিবর্ত্তন করে—
তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে- শ্বেত, ১।৬

এই ব্রহ্মচক্রের প্রথমার্দ্ধের নাম প্রবৃত্তিমার্গ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাম নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে জীব খনিজ (Mineral), স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ (Vegetable), অণ্ডজ (Fish, Reptiles, Birds) ও জরায়ুজ (Beasts) প্রভৃতি বহুলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানবযোনিতে প্রবেশ করে।

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নব লক্ষং চ দশ লক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ,

অর্থাৎ, 'স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পরে জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে।'

ইহাকেই বলে Evolution (বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ)। এইরূপে বিবর্ত্তনের সরণী (ladder of evolution) ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া জীব বহু দিনে মনুষ্যতা প্রাপ্ত হয়।

That spark through æons of the time became a human being * * At first that human being was in the shape of a savage. (J. Krishnamurti).

সেই অসভ্য ক্রমশঃ অর্দ্ধ সভ্য হইয়া ধীরে ধীরে সভ্য হয়। এখনও কিন্তু সে প্রবৃত্তিমার্গের পথিক। বিবর্ত্তনচক্রের বিবর্ত্তনে একদিন সে 'মোড়' ফিরিয়া (turning point pass করিয়া) নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করে। এতদিন জীব বহির্মুখ ছিল, এইবার অন্তর্মুখ হইতে আরম্ভ করে—এতদিন সে ব্রহ্ম-বিমুখ ছিল (His face was turned away from God)— এখন সে ব্রহ্ম-সম্মুখ হয় (His face is turned Godward)— ব্রহ্মবৈমুখ্য ঘুচিয়া এইবার তাহার ব্রহ্ম-সাংমুখ্য হয়। এতদিন তাহার পক্ষে নিয়ম ছিল—আদান (He grew by grasping)—এখন হইতে তাহার নিয়ম হয় প্রদান (ত্যাগ বা বিসর্গ) (He now grows by giving)। এতদিন তাহার লক্ষ্য ছিল অভ্যুদয়—এখন হইতে তাহার লক্ষ্য হয় নিঃশ্রেয়স। আমরা দেখিয়াছি এই নিঃশ্রেয়স বা Summum Bonum-ই মুক্তি। এতদিন সে ছিল প্রেয়ের পথে—এখন সে প্রেয়ঃ ছাড়িয়া শ্রেয়ের পথে প্রবেশ করে। এই প্রেয়ের পথই মোক্ষ-মার্গ।*

* অঞ্ঞা হি লাভূপনিসা, অঞ্ঞা নির্ব্বাণগামিনী।
(অন্যা হি লাভোপনিষৎ অন্যা নির্ব্বাণগামিনী)
'লাভের পথ এক, নির্ব্বাণের পথ আর।'

ইহারই চরমে নিঃশ্রেয়স। মানব প্রকৃতপক্ষে 'সুসভ্য' না হইলে এ পথে বিচরণ করিতে পারে না।

এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোহভ্যগাৎ॥—বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ, 'পূর্ব্বোক্ত যোনি সকল ভ্রমণ করিয়া জীব ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।'

এইবার মানব অতি-মানব হইতে আরম্ভ করে—normal evolution-এর সমতল ক্ষেত্র ছাড়িয়া super-normal evolution-এর দুর্গম ভূমিতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে। এ পথ অতি দুর্গম পথ—ক্ষুরধারের ন্যায় নিশিত—

ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি—

যিশুখৃষ্টও বলিয়াছেন—Straight is the gate and narrow is the way and few there be that find it.

এতদিন সে আত্মবিস্মৃত ছিল * —সে যে রাজপুত্র সে কথা ভুলিয়া ভিখারীর বেশে পরদেশে প্রবাসী ছিল 'Gods in exile'—সিংহশিশু মেষভাবে আত্ম হারাইয়া, অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। এখন তাহার নষ্টা স্মৃতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আইসে—নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্—এবং তাহার মোহবন্ধ ছিন্ন হইয়া যথাকালে স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে।

স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ—ছান্দোগ্য, ৭।২৬।২

যিশুখৃষ্ট Prodigal Son-এর Parable-এ এই তত্ত্বই বিশদ করিয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থেরও উহাই লক্ষ্য—

For man, who is from God sent forth
Doth again to God return.

---

* যোগবাশিষ্ঠ এ বিষয় বেশ লক্ষ্য করিয়াছেন—

হেতুর্বিহরণে তস্য আত্মবিস্মরণাদ্ ঋতে।
ন কশ্চিৎ লক্ষ্যতে সাধো! জন্মান্তর ফলপ্রদঃ॥ —উৎপত্তি, ৯৫।৮

'জীবের জন্মান্তর বা সংসৃতির একমাত্র হেতু তাহার আত্মবিস্মৃতি।' ভাগবতের পুরঞ্জনের উপাখ্যানে এই তত্ত্ব অতি সুন্দর রূপকের রূপে বিবৃত হইয়াছে। পুরঞ্জন (জীব) আত্মবিস্মৃত হইয়া পুরের সহিত সারূপ্য স্থাপন করিয়া শোকমোহের অধীন ছিল। অন্তিমে তাহার সত্য সখা, নিত্য সখা নিরঞ্জন (দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া) উপনীত হইয়া তাহার স্তম্ভিত স্মৃতির উদ্বোধন করাইলে সে 'নষ্টামাপ পুনঃ স্মৃতিম্' এবং তখন স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সুস্থ ও সুস্থির হইল।

We resemble children, who though living in a comfortless region (এই 'দুঃখালয়' সংসার), look, full of fear and trembling, upon the immense dark forest that stretches out before them, and cannot be brought by any inducement to enter it,—while, all the time behind it, in the midst of green meadows, bathed in smiling sunshine stands their parents' house, from which they set out at first. —The Doctrine of the Buddha, p. 195.

প্রবাসী দীর্ঘ জীবন-পথ-যাত্রার পর এতদিনে 'অস্তং গত' হয়—স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই 'Getting back to God'-ই মোক্ষ—কারণ, ব্রহ্মই আমাদের স্বধাম। এইদিনে The wheel has come full circle and I am here. (Shakespeare)

From the flame you came forth, to the flame you will return and thus unite the beginning and the end. The purpose of life is to lose the separate self which started as an individual spark.—J. Krishnamurti's 'By What Authority,' p. 29.

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

যস্তু বিদ্বান্, তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম—মুণ্ডক, ৩।২।৪
'ব্রহ্মবিজ্ঞানীর আত্মা ব্রহ্ম-ধামে প্রবেশ করে।'
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে—মুণ্ডক, ১।৩
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম—গীতা, ১৫।৬
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ—গীতা, ১৫।৪
মাম্ উপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে—গীতা, ৮।১৬
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্—মুণ্ডক, ১।৩

সেই বিষ্ণুর পরম পদ—যাহা সংসার পথের পার—সূরিগণ যে পদ ঈক্ষণ করেন, 'অস্তং গত' সেই পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্—ঋগ্বেদ

সেই জন্যই ব্রহ্ম 'প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' (মাণ্ডূক্য, ৬)—তিনি জীবের 'প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানম্' (গীতা, ৯।১৮)—তাঁহা হইতেই জীবের প্রভব, এবং তাঁহাতেই জীবের প্রলয়।

প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি—মুণ্ডক, ২।১।১
যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম—তৈত্তি, ৩।১।১
'ব্রহ্ম হইতেই এই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা স্থিতি এবং অন্তে ব্রহ্মতেই লয়।'

সেই বেদের প্রাচীন বাণী—

তস্মিন্ ইদং সং চ বি চৈতি সর্ব্বম্—শুক্ল যজুর্বেদ, ৩২।৮

মোক্ষ = শূন্যতা-সিদ্ধি

এই যে ব্রহ্মধামে প্রবেশ বুদ্ধদেব ইহাকেই শূন্যতাসিদ্ধি বা নিরোধ-সমাপত্তি বলিয়াছেন—

নত্থি কিঞ্চিতি অকিঞ্চনায়তনং উপসম্পজ্জ বিহরতি

(He has won to the sphere of Nothingness (শূন্যং
এই শূন্য কি ? এই শূন্য উপনিষদের নেতি নেতি ব্রহ্ম—অথাত
আদেশঃ নেতি নেতি—(বৃহ, ২।৩।৬)। ইহ সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্য—ন স
নচাসৎ (শ্বেত, ৪।১৮)—অতএব 'সঃ' নহে, 'তৎ' (That)। ব্রহ্ম যখন
লক্ষণের অতীত, মননের অতীত, বচনের অতীত—

অন্যত্র ধর্ম্মাৎ অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ—কঠ, ২।১৪

'ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে অন্য ; কৃত হইতে ব্যতিরিক্ত, অকৃত হইতে
বিভিন্ন'

—এক কথায় 'সর্ব্বকার্য্যধর্ম্ম-বিলক্ষণ' (শঙ্কর)*—তখন তিনি
'শূন্য'বইআর কি ?

স এষ নেতি নেতি আত্মা—বৃহ, ৪।২।৪

সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পরিচয়ে বলিয়াছেন—

অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমঃ অবা
অনাকাশম্ অসঙ্গম্ অরসম্ অগন্ধম্ অচক্ষুষ্কম্ অশ্রোত্রম্ অবাক্ অমনঃ অতেজস্ক
অপ্রাণম্ অমুখম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্—বৃহ, ৩।৮।৮

'তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ; তিনি লোহিত নহেন,
স্নেহ নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন ; তিনি রস নহেন,
শব্দ নহেন, গন্ধ নহেন, চক্ষু নহেন, শ্রোত্র নহেন, সঙ্গ নহেন, বাক্য নহেন, মনঃ নহেন,
তেজঃ নহেন, প্রাণ নহেন, মুখ নহেন, মাত্রা নহেন, অন্তর নহেন, বাহির নহেন।'

সত্য বটে, সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখিলে তিনি পূর্ণ (Plenum)—
পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্—কিন্তু নির্ব্বিশেষ দৃষ্টিতে তিনি শূন্য, মহাশূন্য (Vacuum)—নেতি নেতি। সেইজন্য শঙ্করাচার্য্যের নামে প্রচলিত 'সর্ব্ব
বেদান্ত-সিদ্ধান্ত' গ্রন্থে বলা হইয়াছে—

যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাংচ যৎ—যিনি শূন্যবাদীর শূন্য, তিনিই
ব্রহ্মবাদীর ব্রহ্ম।

উপনিষদে এই শূন্যভাব-সাধনের উপদেশ আছে—

শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ—অমৃত, ১১
শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তঃ—মৈত্রী, ২।৪

*The Absolute, the Infinite, is without condition and so cannot be thought. × × The Absolute can be nothing else that we know and therefore cannot be recognised or known.—Herbert Spencer's First Principles, pp. 73-4.

বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহার 'শূন্য' Nihilum নহে—নাস্তি নহে।* তিনি বলিতেন 'Beyond this seeming 'Nothing'—the true and real is hidden' (Grimm p. 457) তাঁহার নিজের মুখের উদাত্ত বাণী একবার মানস-কর্ণে ধ্বনিত করুন—

অত্থি ভিক্খবে ! অজাতং অভ্‌ভূতং অকতং অসংখতং। নো চে তং ভিক্খবে ! অভবিস্‌স অজাতং অভ্‌ভূতং অকতং অসংখতং, ন ইদ জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্ঞায়েথ। যস্মা চ খো ভিক্খবে ! অত্থি অজাতং অবভূতং অকতং অসংখতং তস্মা জাতস্‌স ভূতস্‌স কতস্‌স সংখতস্‌স নিস্‌সরণং পঞ্ঞায়েতি তি।

অত্থি ভিক্খবে ! তদ্ আয়তনং যত্থ ন য়েব পঠবী ন আপো ন তেজো ন বায়ো ন আকাসানং চায়তনং ন বিঞ্ঞানানং চায়তনং ন অকিঞ্চন্নায়তনং ন নেব সঞ্ঞা নাসঞ্ঞায়তনং, নায়ং লোকো ন পরলোকো উভো চন্দিমা সুরিয়ো। তদ্ অহং ভিক্খবে ! ন এব আগতিং বেদামি ন গতিং ন থিতিং ন চুতিং ন উপপাতিং। অপ্পতি টঠং অপ্পবত্তং অনারম্ভনং এব তং। এস এব অন্তো দুক্খস্‌সেতি—উদান, ৮।১, ৩

ইহার অনুবাদ এই :—

There is, O Bhikkhus, That which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved. Unless, O Bhikkhus, there were That, which is unborn, which has not become, is uncreate and unevolved—there could not be cognised here the springing-out of what is born, has become, is created and evolved. And surely, because, O Bhikkhus, there is That, which is unborn, has not become is uncreate and unevolved—therefore is cognisable the out-springing of what is born, has become, is created and evolved.' (Translation in 'Light from the East,' p. 51).

ঐ Unborn Uncreate Unevolved—ঐ 'অজাতং অভ্‌ভূতং অকতং অসংখতং'-ই উপনিষদের নির্গুণ নিরুপাধি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, অস্তং গত (স্বধামে প্রত্যাবৃত্ত) হইলে—সেই ব্রহ্মের সহিত, সেই শূন্যের সহিত সুনিশ্চল সাযুজ্য হয়। ঐ সাযুজ্যই মুক্তি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

*The *nothing* (শূন্য), that we regarded so long as the measureless black pall spread over the abyss of absolute annihilation, into which every living being must one day fall—now becomes the mysterious veil that lies over our own *innermost essence*.—The Doctrine of the Buddha, p. 195.

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই এলিয়ট সাহেব গৌণভাবে আমার অদৃষ্টচক্র ফিরিয়েছিলেন, তাই তাঁকে আমার এত ভাল ক'রে মনে আছে। গল্পটা উল্লেখযোগ্য শুধু এই দেখাবার জন্য যে, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। ছেলেবেলা থেকে আমার একটা আতঙ্ক ছিল যে আমাকে একদিন ভারত শাসনের ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা হবে। উঠতে বসতে এই কথা আমায় শুনতে হত। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর পাঁচরকম কারণে আশা হচ্ছিল যে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাব। ইতিমধ্যে লাট-বাহাদুরের কুচবেহারে শুভাগমন হল, রাজ্যের কর্ত্তাদের কারদানির জন্য সাহেব তুষ্টও হলেন। পিতাঠাকুর পাকা রাজনীতিবিৎ ছিলেন। রাজ্য চালনার প্রধান নীতি হচ্ছে এই যে লেন-দেনের হিসাব ঠিক থাকবে, অর্থাৎ অপর পক্ষ ফাঁকি দিয়ে কিছু মেরে না নেয় সেইটে দেখতে হবে। কুচবেহার কর্ত্তৃপক্ষের সেবার চেষ্টা হল যে এত কষ্ট ও খরচ যখন করা গেছে তখন কিছু সুবিধা ক'রে নিতে হবে। ওই রাজ্যে একটা গোলমাল বহুদিন থেকে চলে আসছিল। অমাত্য দুজন ছিলেন। একজন আমার বাবা, অন্যজন এক সাহেব। এই diarchy-র দরুণ ষ্টেটের অনর্থক অনেক-গুলো টাকা খরচ হয়ে যেত। যখন এলিয়ট সাহেব বাবাকে পুরস্কৃত করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখন বাবা ষ্টেটের এই দুঃখের কথা তুললেন, "কাজ দুজনের মত যখন নেই, তখন আমাদের একজনকে সরিয়ে দেবার অনুমতি দিন।" খানিকক্ষণ আলোচনার পর সাহেব বললেন—"নেটীব রাজ্যে একজন নেটীব দেওয়ান চাই। কাজেই তোমার যাওয়া হতে পারেনা। তুমি যদি সিবিলিয়ান হতে, তাহলে না হয় সাহেবকে সরিয়ে নিয়ে তোমার একার উপর সব ভার দেওয়া যেত। কিন্তু তা যখন নয়, তখন হিন্দুস্থান সরকার কিছুতেই রাজী হবেন না।" তারপর খুব সৌজন্য ক'রে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলে সার্বিসে ঢুকছে, না?" বাবা কলকাতায় এসে আমায় আদেশ করলেন যে সিবিলিয়ান আমায় হতেই হবে। ফলে, ইস্পাতের ফ্রেমে একখণ্ড কর্কের ছিপি বসান হল। ফ্রেমের অদৃষ্ট!

ছিপিরও গ্রহের ফের। কোথায় ঘরের কোণে বোতলে আঁটা পড়ে থাকবে, তা না এক প্রকাণ্ড কারখানার ষ্টীল ফ্রেমের ওজন পড়ল তার ঘাড়ের উপর। কর্কের তৈরী বলেই পিষে গুঁড়ো হয়ে যায় নেই। বহুদিন থেকেই ফ্রেমের জন্য এদেশী পেরেক সংগ্রহ হচ্ছিল। ইস্পাত না

হলেও কাঁচা লোহার পেরেক অনেক মিলছিল। কাজ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে লাটের নিরর্থক সৌজন্যের ফলে একটা কর্কের ছিপিকে সেই কাজে লাগানো হল, তাঁকে আমি অভিনন্দন না ক'রে থাকি কি ক'রে? তাঁর বিদ্যার কথা জানি না, তবে তাঁর কীর্ত্তিকে অঘটনঘটনপটীয়সী বললে দোষ কি?

আমার ছেলেবেলার শিক্ষা-দীক্ষার কথা বলেছি। মন্ত্রীপুত্রের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নই স্বাভাবিক। সে স্বপ্ন অনেক দেখতাম। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হাকীম হওয়ার উচ্চাশা কখনও হয় নেই, যদিচ আমায় ক্রমাগত লোভ দেখানো হত যে নেটীব সিবিলিয়ান ত এইবার কমিশনার হয়েছে, আর দু-পাঁচ বছরে লাটও হবে। লাট হওয়ার লোভ কিছুতেই হত না। ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রাধান্য তখন সবে একশ বছরের। তাই তার সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দেওয়ার উৎসাহ ছিল না। বরং খুব ইচ্ছা হত যে একটা দেশী রাজ্য হাতে নিয়ে গ'ড়ে তুলি। কে জানে ভবিষ্যতে কি সুযোগ হবে। এদেশের পাঁচহাজার বছরের বিচিত্র ইতিহাসে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য উত্থান ও পতন ত কত শত হয়ে গেছে। চাকরী সম্বন্ধে আমার বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও বিশেষ উৎসাহ দেখি নেই। প্রথম বয়সে মাত্র একজন বড় চাকরী নিয়েছিলেন। অধিকাংশের নজর সেদিকে ছিল না। আজ যে তাঁরা অনেকেই বর্ত্তমান ভারতের টোডরমল মানসিংহের পদে অধিষ্ঠিত সে কেবল দেশের হাওয়া বদলেছে ব'লে, সরকার দেশের লোককে শাসনকার্য্যে সহায় হতে ডেকেছেন ব'লে।

আমাদের এক Bohemian Society, ভবঘুরে সমিতি, ছিল। তার বৈঠক বসত প্রধানত বন্ধুবর প—র গোয়াবাগানের বাসায়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের উপদ্রব ছিল না। এক পণ্ডিত মশায় ছিলেন। তিনি চমৎকার লোক। আমাদিকে সর্ব্বদা ভূরি ভোজনে তৃপ্ত রাখতেন। আমাদের সমিতির সাধারণ কার্য্যক্রম ছিল তাসখেলা ও জলযোগ। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে প্রোগ্রামও বিশিষ্ট রকমের হত। "গোড়ায় গলদ" পাঠ ও অভিনয় আমাদের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। দুয়েকবার Variety Programme-এর মত হয়েছিল। কমিটি ঠিক করলেন কে কি অভিনয় করবে। অভিনেতাদের পারদর্শিতার দিকে কমিটির ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আদেশ অনুসারে কেউবা বাংলা গান করতেন, কেউ ইংরেজী সঙ্গীত চর্চ্চা করতেন, কেউবা তিব্বতী ভাষায় অভিনয় করতেন। সব কথা এখন মনে নেই, তবে ভূ— এমন সরসভাবে "আজি যে রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে" আবৃত্তি করেছিলেন যে আমরা অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। সকলেই তখন নববিবাহিত। বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের

কবিতা আবৃত্তি অল্প বিস্তর সবাইকেই করতে হত। তবু এমনটি ক... শুনি নেই। আমাদের ডাক্তার বন্ধু এক ইংরেজী গান করলেন। এ... সেইদিন তাঁর হাতে-খড়ি হল। পরে বিলেতে কতবার শুনেছি, ... করতে করতে তিনি খুব জোর ইংরেজী গান গাইছেন। আমার ... পড়েছিল বাংলা প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধের প্রায় সবটাই কড়ি ও কোম... মানসী ও সোনার তরী হতে চুরী। কিন্তু বিষয়-মাহাত্ম্য এমনই ... যে মণ্ডলীর সকলেরই বেশ ভাল লেগেছিল, অর্থাৎ আমায় কেউ বই ... দোয়াত ছুঁড়ে মারেন নেই।

আমাদের কলেজের কবছর রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-মহলে খুব দেখা দিতেন... তিনি নানাস্থানে প্রবন্ধপাঠ করতেন। আমরা দল বেঁধে যেতাম, ... পাঠ হয়ে গেলেই 'গান, গান' ক'রে চীৎকার করতাম। এই সব সভায়... "আমায় বোলোনা গাহিতে বোলোনা", "আমায় সত্য মিথ্যা সকলই ভুলায়ে দাও" ইত্যাদি গান প্রথম বের হয়। কবিবর তখন আমাদের রবিবা... ছিলেন। কর্ত্তারা তাঁকে নেক নজরে দেখতেন না। অনেক বাড়ীতে তাঁরা বলতেন যে রবি ঠাকুর বড় মানুষের ছেলে, কাজ নেই কর্ম্ম নেই ব'সে ব'সে ছেলে বখাচ্ছে। যখন এ সব ব্যাপারের হিসেব নিকেশ হবে তখন হয়ত দেখা যাবে যে, প্রথম বঙ্কিম, তারপর কবি সত্যিই তিনপুরু... বখিয়েছেন। খুব ভালই করেছেন, কেননা সুবোধ বালকের দৌরাত্ম্য ব... বেশী হয়েছিল।

একটা বিষয়ে আমার কবিবরের বিরুদ্ধে নালিশ আছে। আ... বড় লোককে যখন কাঠগড়ায় খাড়া করছি তখন আমার কেসটা খুলে বলা দরকার। বালিকাবধূর সঙ্গে প্রেমচর্চ্চাকে তিনি ঠাট্টা করেছিলেন। সেজন্য আমাদের কারও মনে ব্যথা লেগেছিল, এ আমি শুনি নেই। বরং কেউ কেউ সেই কবিতা থেকেই লাইন তুলে প্রেমপত্রে নিজের ব'লে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু তখনকার দিনে ফিরিঙ্গীরা যে পথে ঘাটে দুর্ব্বল লোককে নির্য্যাতন করত সে বিষয়ে কবি কোন কথা লিখলেন না। কিন্তু কোথায় কোন্ জায়গায় একবার দুচারজন কাপুরুষ ছেলে মুক্তি ফৌজের সাহেবকে মেরেছিল তাই উপলক্ষ্য ক'রে লম্বা কবিতা বের হল। এ জিনিসটা তখনও একচোখোপনা মনে হত, এখনও হয়।

ফিরিঙ্গীরা কিংবা গোরা সেপাইরা সেকালে লোকের সঙ্গে যে কি ব্যবহার করত তা হয়ত একটু বয়স্থ লোক সকলেরই জানা আছে। আমাদের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ছিল সত্য, কিন্তু এতে যে রাজার গৌরব হানি হয়। তবু, কর্জ্জন সাহেবের আগে কোন লাট গোরাদের জুলুমের প্রতিবিধান করতে সাহস করেন নেই। আজ এ অত্যাচার

খুব কমে গেছে। হয়ত লোকেও আর বরদাস্ত করবে না, সরকারও করবেন না। কিন্তু আমি যখন চল্লিশ বছর আগের কথা লিখতে বসেছি, তখন আমার এ সব অপ্রিয় কথা না লিখেও উপায় নেই। অপ্রিয়, কেননা নিজেদেরই বদনাম। অপমান হজম করাতে ত কোন গৌরবই নেই! আমি বড় বড় ব্যাপারের, অর্থাৎ খুন খারাবীর, কথা প্রত্যক্ষ কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে কিছু বলছিওনা। তবে আমাদের যে কারণে দলবদ্ধ হয়ে ময়দানে চলতে ফিরতে হত, সেটা একালের ছেলেদের জানা ভাল। ছেলেবেলায় ইংরেজদের সম্বন্ধে শুনেছিলাম যে তারা ন্যায় যুদ্ধ ছাড়া অন্যায় যুদ্ধ জানে না। হয়ত ভদ্রবংশীয় ইংরেজ সম্বন্ধে এটা সত্যি, কিন্তু আমাদের আমলের গোরা সেপাই কি মেটে সাহেব যে ন্যায় যুদ্ধের উপাসক ছিল না তার প্রমাণ খুব সুলভ।

একদিন আমরা জনাতিনেক ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল স্কোয়ারের ভেতর হাল্লা। দূর থেকে দেখি, তিন-চারজন ইংরেজী কাপড়-পরা লোক একটি বাঙ্গালীর ছেলেকে মারছে, লোক জমে গেছে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। আমরা নির্ব্বিরোধী লোক। শুধু দেখবার জন্য বেড়া ডিঙ্গিয়ে সেই দিকে দৌড়ালাম। ততক্ষণে পেণ্টুলুন-পরা লোকগুলো গলিতে ঢুকে দৌড়ে পালাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখি একটি বছর চৌদ্দর ছেলে জখম হয়ে ভুঁইয়ে পড়ে, আর পাশে একটা হোঁৎকা গোছের লোক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে, বর্ণনা করছে কি হয়েছিল। তার মাথায় খুব ঢেউ খেলান তেড়ী, গায়ে জালের গেঞ্জী, পরণে মালকোঁচা মারা ধুতি। বক্তৃতা শেষ ক'রে সে খুব জোরে নিজের বুক চাপড়ে দুতিনবার বললে, "ধিক্! বাঙ্গালীর জীবনে ধিক্!" আগেই বলেছি আমরা ছিলাম নিরীহ লোক। মাথা হেঁট ক'রে চলে গেলাম। সে লোকটাকেও পিটিয়ে দিতে পারলাম না। শত ধিক্!

আর একদিন গড়ের মাঠে খেলা ভাঙ্গবার পর আমরা কয়েকজন ফিরছি এমন সময় দেখি যে এক বাঙ্গালী ছাত্রকে দুটো ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে খুব ঘুষো লাথি মারছে। পাশে আরও দুতিনজন ফিরিঙ্গী দাঁড়িয়ে স্বজাতিকে সাবাস দিচ্ছে। আমাদের দল নেহাৎ ছোট ছিল না। দুএক-জনের হাতে বংশদণ্ডও ছিল। তৎক্ষণাৎ আমরা চারিদিকে দাঁড়িয়ে গেলাম আর ফিরিঙ্গীদের বললাম, "এ চলবে না। একজন একজন লড়াই কর।" তাই করতে হল। বাঙ্গালীটি বাহাদুর ছেলে ছিল। খুব ঠুকলে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে। শেষ তার বুকে ব'সে মাপ চাইয়ে ছাড়লে। এ পর্য্যন্ত নালিশ করবার মত কিছু হয় নেই। কিন্তু ফেরবার পথে মনুমেণ্টের কাছে আবার ছেলেটিকে কজন ফিরিঙ্গী ঘিরে দাঁড়াল। বোধ হল সেই

প্রথম দলই। ভাগ্যিস আমরা পিছনেই ছিলাম। আমরা হুঙ্কার ছাড়… তারা বেগতিক দেখে রণে ভঙ্গ দিলে।

আমার নিজের কখনও রণে ভঙ্গ দিতে হয় নেই। ধাক্কা ধুক্কি… খেয়েছি এক-আধবার, সে অতি সামান্য ব্যাপার। তা সে ঋণও … রাখি নেই। তবে একবার passive resistance করতে হয়েছি… ঘটনাটা গল্প হিসেবে মন্দ নয়। আগেই বলেছি, মাঠে আমরা বড় এ… একা একা ঘুরতাম না। একদিন ডালহৌসির মাঠে খুব বড় খেলা ছি… কথা ছিল আমরা সকলে ক্লাব থেকে যাব। কিন্তু আমি যখন পৌছলা… তখন একটু দেরী হয়েছে। সকলে চ'লে গেছে। ইতস্ততঃ করছি এ… সময় রাস্তার ওপারের মাদ্রাসা ক্লাবের ছেলেরা বললে, "চল বাবু, ম্যা… দেখতে যাবে না?" গেলাম তাদের সঙ্গে। তখনকার দিনে পয়সা দি… ম্যাচ্ দেখার রেওয়াজ্ বড় একটা ছিল না। মাঠের তিনদিক খোলা থাকত… একটা জায়গা বেছে আমরা চারজন সামনে দাঁড়ালাম। খানিক প… পেছনে বিজাতীয় আওয়াজে চীৎকার শোনা গেল, "Make room, হ… যাও।" হঠাৎ আমার মাথার উপরে এক বেতের ঘা পড়ল। বেত… হেঁচকা মেরে টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। ফিরে দেখি, Buf… পলটনের জনা পঁচিশেক বীর যোদ্ধা বেগে লোক সরিয়ে দিচ্ছে। অবহেলে… সরিয়ে দিলে। যতক্ষণে তারা তুই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ততক্ষ… আমার মাদ্রাসার সঙ্গীরা অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। আমি একা পড়লা… সেই সেপাইদের লাইনের সামনে। অবস্থা সঙ্গীন। এক মুহূর্ত্ত ভাবলা… মার খাব, না স'রে পড়ব। তারপর মনে হল স'রে ত পড়ছিই আ… কত শ' বছর, না হয় মারই খাই। কে জানে হয়ত কুঁড়েমিই ধরল, … আবার সরে। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম যে আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলে… ঠেলে মাঠের গণ্ডীর মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তখন আমিও, "একা কুম্ভ," … পেছনে ঠেলতে আরম্ভ করলাম। গ্রাম্য ইংরেজীতে নানা রকম শ্লী… অশ্লীল ঠাট্টা তামাসা কানে আসতে লাগল। তুএকটা গাঁট্টাও মাথায় … খেলাম। আমার পেছনে ঠেলা কিন্তু বন্ধ হল না। ইতিমধ্যে একজন… linesman "পিছে, পিছে হট্ যাও" বলতে বলতে নিশান হাতে এসে… পড়ল। সেও Buff সেপাই। হয়ত তার সাঙ্গাতদের সঙ্গে চোখে… চোখে কিছু ইসারাও হয়ে থাকবে। যাই হোক, লোকটা যেই আমাকে… "পিছে, বাবু," ব'লে ঠেলা মারলে, অমনি পশ্চাতের তুজন সেপাই ফাঁক… হয়ে গেল। ফলে আমার দেহের উপরটা পেছনে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু আমি… আগে থেকেই গোড়ালি কাদায় গেড়ে পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম… তাই পড়ে গেলাম না। তখন সেই অবস্থায় আমাকে সেপাই তুটো টিপে…

ধরলে। আমি তুই কনুই দিয়ে তাদের পাঁজরার উপর passive resistance বার তুই চালাতেই তারা কোঁক ক'রে আবার ফাঁক হয়ে পড়ল। সুবিধা পেয়ে আমি পিছিয়ে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে গেলুম। ততক্ষণে খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। কিন্তু আমার খেলা দেখার মত অবস্থা ছিল না। পিছন থেকে লাথি, গাঁট্টা, ধাক্কা ক্রমাগত খাচ্ছিলাম। বিপদে পড়ে আমিও যে চাঁট তু-চারটে মারি নেই তা বলতে পারি না। কিন্তু আমি জবাব দিচ্ছিলাম মোটামুটি তুধারের পাঁজরার উপরে। একটা কথা পরিষ্কার হওয়া উচিত যে কোন পক্ষেই ক্রোধের উদ্রেক হয় নেই। তারা যা করছিল অভ্যাস দোষে, আমি যা করছিলাম ভয়ে। প্রায় পনেরো মিনিট এই রকম ধস্তাধস্তি চলল। আর বেশীক্ষণ চলে না। আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যথা করছে। এমন সময় পিছন থেকে কে বললে, "Let him be, Jim" (ছেড়ে দে, জিম)। এতক্ষণ আমার মুখ দিয়ে ভাল মন্দ একটি কথাও বের হয় নেই। এখন ফিরে বললাম, "Thank you"। আমার ডান পাশের সেপাইটি আমার সামনে সিগারেট কেস খুলে ধ'রে বললে, "You are a plucky lad"। আমি তাকে জানালাম যে আমার প্রায় হয়ে এসেছে। সে আমায় ভূঁইয়ে বসবার জায়গা ক'রে দিয়ে বললে, "আমার পাঁজরাগুলো তোমায় সহজে ভুলবে না।" আরাম ক'রে ম্যাচ্ দেখে টলতে টলতে বাড়ী ফিরলাম।

কোন রকম জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। জাতি-বিদ্বেষ সকল অবস্থাতেই ঘৃণ্য জিনিস। তাছাড়া, সেকালের যা সমস্যা ছিল আজকের সমস্যা তা নয়। সুতরাং আমার গল্প থেকে আজকের প্রযোজ্য কোন নীতি কেউ টেনে বের করলে আমার উপর অবিচার হবে। যে কালের কথা আমি বলছি তখন ব্যায়াম চর্চ্চার দরকার ছেলেদের মনে খুব জেগে উঠেছে। ইতিপূর্ব্বেই শোভাবাজার ক্লাব ফুটবলে আর টাউন ক্লাব ক্রিকেটে অনেকটা এগিয়ে গেছল। আমাদের সময়ে প্রথমে মোহনবাগান, পরে ন্যাশনাল ফুটবল খেলতে নামল। বুট প'রে খেলা চলে গেল প্রধানতঃ ন্যাশনালের উদাহরণে। নন্দলাল শুধু-পায়ে shinguard পরা তুচারটে পা ভাঙ্গার পর ভয় ভাঙ্গতে লাগল। ক্রমে বাঙ্গালীর একটা নিজস্ব খেলার ধারা তৈরী হয়ে উঠল। শোভাবাজারের right wing, বড়বাবু, অবশ্য চিরকালই শুধু-পায়ে খেলতেন। ক্রিকেটে বাঙ্গালী কখনও বিশেষ কিছু করতে পারলেন না। তবু ঢাকার সুধন্বা বাখড়ার খেলা যা ছিল, টাউন ক্লাবের কুলদারঞ্জন, শিবপুরের প্রমদারঞ্জন ও বিশপস্ কলেজের শ্রীশ দে তার চেয়ে অনেক উন্নতি ক'রে গেলেন। যতীনবাবুর (বাখড়ার) বিখ্যাত সেকেলে underhand (তিনি বলতেন,

ছেঁচড়া) bowling প্রমদারঞ্জনের scientific bowling-এর সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। ক্রিকেট খেলায় একটা নীরব সাধনার দরকার। হয়ত সেটা বাঙ্গালী প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। ফুটবলে কিন্তু যে গুণা বলীর প্রয়োজন সেগুলো বোধহয় বাঙ্গালীর অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য। উপরন্তু ফুটবল-প্রীতির আর একটা কারণও দেখা যেত। আমাদের অত্যন্ত লোভনীয় জিনিস ছিল কেল্লার গোরাদের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষ, বলপরীক্ষা। এই কেল্লার গোরা আমাদের চোখে ছিল মূর্ত্তিমান পশুবল। এদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি না হলে নিজেদের পশুবলের উৎকর্ষ সাধন কি ক'রে হবে! এমনও দেখেছি যে ম্যাচের পর খেলোয়াড়রা ব'সে ব'সে হিসেব করছে কে কটা গোরাকে আছাড় দিয়েছে। যেন সেটা গোল দেওয়ার চেয়েও দরকারী জিনিস! শোভাবাজারের ব্যাক কালী মুখুয্যে দর্শকের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন প্রধানতঃ মানুষ ঘায়েল করতে পারতেন ব'লে। বাঙ্গালীর ঘুষো খেলা তখন সবে সুরু হয়েছে। তবু ওটা যে কলকাতার নিত্য জীবনে বড় প্রয়োজনীয় জিনিস তা সকলেই বুঝত। শেখার সুযোগের অভাব ছিল। যারা খুব উৎসাহী তারা অনেক পয়সা গুজে কেল্লায় শিখে আসত। পাঠককে একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার যে বর্ত্তমান লেখক সব খেলা খেললেও নিতান্তই হাতুড়ে চিরদিন।

আমি যে বছর কলেজে ঢুকলাম তখন পর্য্যন্ত কলেজ ক্লাব ছিল না। ক্রমশঃ সেটা গ'ড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকের এত অভাব ছিল যে আমরা অনেক চেষ্টা করেও ক্লাবটাকে জমকাল করতে পারি নেই। খেলা সম্বন্ধে প্রেরণা সংগ্রহ ক'রে আনতে হত অন্য বড় বড় ক্লাব থেকে। যাই হোক, ক্রমশঃ আমাদের নিজস্ব খেলার দল খাড়া হল, দুচারটে ম্যাচও খেলা হতে লাগল। ফুটবলের রঙ্গীন জামা তৈরী হল। এখন দেখতে পাই আমাদের অত সাধের লাল নীল রঙ্গের বদলে কলেজ টীম নিতান্ত prosaic নীল রঙ্গের জামা পরেন। রঙ্গীন জামা প'রে প্রথম ম্যাচটা আমার বেশ মনে আছে। আমি ব্যাকে খেলছিলুম। হটাৎ এক ষাঁড় দূর থেকে জামার ঝকঝকে গোলাপী রঙ্গ দেখে আমাকে শিঙ্গে চড়াবার মৎলব ক'রে চড়াও হয়ে এল। আমার নজর ছিল বলের দিকে। গোল-কীপার তাড়াতাড়ি গোলের ডাণ্ডাটা খুলে নিয়ে ষাঁড়কে মেরে আমায় রক্ষা করলেন। কাজটা সহজে হল না। কথায় বলে, red rag to a bull। আমাদের বড় সাহেব পয়সার বেশ সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। প্রথম কড়া নিয়ম জারী হল যে বিকেলে সবাইকে কসরতের আখড়ায় হাজিরা দিতেই হবে। তারপর হুকুম হল যে যারা ক্লাবে খেলবে তাদের

কসরৎ না করলেও চলবে। শতকরা আশী জনের অঙ্গ সঞ্চালন করার কোন ইচ্ছাই ছিল না, কি ক্লাবে, কি আখড়ায়। কিন্তু তাদের ক্লাবে ঢোকার পথ আমরা বেশ সুগম ক'রে দিলাম। ফটকের কাছে খাতা হাতে ধরণা দেওয়া নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল। এই রকম ক'রে যত টাকা সংগ্রহ হত, বড় সাহেব সরকার থেকে আবার তত টাকা মঞ্জুর করতেন। এত সুবিধা না ক'রে দিলে ক্লাবটি আঁতুড়েই মারা যেত। গ্রিফিথস্ সাহেব আমাদের সুখ দুঃখ বুঝতেন ব'লেই তাঁকে আমরা ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। ছেলেপিলে ত একটু স্বার্থপর হয়েই থাকে।

এই ফুটবলের নেশা কিন্তু সবাই ভাল চোখে দেখতেন না। একদল কর্ত্তা-ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা বলতেন হাডুডু, কপাটি, গুলি-ডাণ্ডাই বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশস্ত। বিদেশী খেলায় তার কিসের দরকার। আর একদল আবার এঁদের চেয়েও গোঁড়া। তাঁদের মতে আড্ডা মাত্রই ছাত্রদের পক্ষে খারাপ, তা সে তাসের আড্ডাই হোক, আর ব্যায়ামের আড্ডাই হোক। ওসব স্থানে গেলে ছেলেরা সিগারেট খেতে এবং শা— ব'লে গালাগাল দিতে শেখে। এই মর্ম্মে একবার একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এসব কুসংস্কার যাঁরা ভেঙ্গে দিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান আমার বন্ধুরা। ভূ— মালকোঁচা মেরে ফুটবলেও যেতেন, পরীক্ষাতেও ফার্ষ্ট হতেন। পরের জীবনে চাকরে মানুষের কাম্যলোকে উঠেও তার মোহনবাগান-প্রীতি মন্দা হয় নেই। সুহৃদ ন—রও ঐ দশা। তাঁকে আদালত ছাড়া কোন ব্যাপারে পাওয়া কত কঠিন তা সবাই জানেন। অথচ ক্রিকেট, ফুটবল, কি সাঁতারের স্থানে দরকার হলে এটর্ণি ফিরিয়ে দিয়েও তিনি সেখানে হাজির হন। আবার আমার মত মানুষও ছিল যারা খেলার হুজুগে পরীক্ষা ভাসিয়ে দিলে, আর বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত খেলা খেলা করেই কাটিয়ে দিলে। মোটের উপর আমাদের মধ্যে দেহচর্চ্চার (দেহতত্ত্বের নয়) হাওয়াটা জোর বয়েছিল। তবে আমাদের হাত পা ছোঁড়াই সার হল, সাফল্য পেলে পরবর্ত্তী ছেলেরা।

কলেজে একটা Debating Society ছিল, যেখানে নানাবিষয়ে তর্ক বিতর্ক হত। আমাদের দলের কেউ সেখানে বিশেষ নাম করেছিলেন ব'লে মনে নেই। এটা আশ্চর্য্য, কেননা আমাদের অনেকেই পরের জীবনে হাইকোর্টে বক্তৃতা ক'রে যেমন জজকে তেমনি মক্কেলকে অক্লেশে ঘায়েল করেছেন। তবে স্বীকার করতে হয় যে এক প্র— ছাড়া রাজনৈতিক সভায় কেউ সুবিধা করতে পারেন নেই। আমাদের ঠিক আগের দলের সুরেন মল্লিক, নীরদ চাটুয্যে প্রভৃতি বেশ ভাল বক্তা ছিলেন। এই তর্ক-সভার কর্ত্তা ছিলেন উইলসন সাহেব। ভদ্রলোক প্রথম প্রথম আমাদের

সঙ্গে খুব মিশতেন। আমাদেরও তাঁকে খুব ভাল লাগত। কিন্তু কি হল কে জানে, আস্তে আস্তে ছেলেরা তাঁর ওপর নারাজ হয়ে গেল। কে একদিন হল কি, তিনি হোষ্টেলে যে ঘরে ঢুকতে লাগলেন, ছেলেরা জাত যাবে ব'লে তাদের জলের কুঁজো ফেলে দিতে লাগল। এই নিয়ে অনেক গোলযোগও হয়েছিল। একদিন আমাদের সভায় হিন্দুর বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে তর্ক হচ্ছিল। আমি হিন্দুর বিলেত গেলে জাত যায় এই মতে আমার সাধ্যমত একটা ছোট-খাটো বক্তৃতা করলাম। উইলসন সাহেব সভাপতি ছিলেন। সভার পরে তিনি বাইরে এসে মহা গরম হয়ে আমায় বললেন, "তোমরা সবাই hypocrite, মনে এক, মুখে এক। তুমি নিজে বছরখানেক বাদে বিলেতে যাবে, অথচ আজ সভায় বললে বিলেত যাওয়া উচিত নয়। সেদিন হোস্টেলের ছেলেরা হঠাৎ এমনি হিন্দু হয়ে উঠল যে আমি ঘরে ঢুকতেই তাদের জল নষ্ট হয়ে গেল।" আমি নিবেদন করলাম, "স্যার, হোষ্টেলের কথা আমি জানি না, আমি সেখানে থাকি না। কিন্তু তর্ক-সভায় তর্কের খাতিরে মানুষ যা বলে সেটা তার মত ব'লে কেউ ধরে না।" তাতেও সাহেব ঠাণ্ডা হলেন না। সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন আমাদের অঙ্কের অধ্যাপক লিটল্ সাহেব। তাঁর বদ মেজাজী ব'লে খ্যাতি ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকের অন্তর বড় ভাল ছিল। তিনি উইলসনকে একটু চেঁচিয়েই বললেন, "এ তুমি কি রকম কথা কইছ? আমাদের কেম্‌ব্রিজ, অক্‌সফোর্ডে কি হয়? ইউনিয়ানের সভায় যার যেদিক ইচ্ছা তর্কের সময় ত সেইদিক নেয়।" তখন আমিও সুবিধা পেয়ে উইলসন সাহেবকে বললাম, "মশায়, আর এক কথা, আপনি জাত তুলে গালাগাল দেন কেন? যা বলবেন আমাকে বলুন, তোমরা তোমরা তোমরা করেন কিসের জন্য?" লিটল সাহেব বল্‌লেন, "খুব ঠিক কথা। সেদিন আমি এই ছোকরাকে দুষ্টুমি করার জন্য ধরেছিলাম। ওর বাঁদরামীর জন্য সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে বাঁদর বল্‌লে অবশ্য দোষ হবে।" আমাদের সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ বা গবেষণার কোন বিশেষ সুবিধা ছিল না। আমরা এম এ ক্লাসে এক বৈজ্ঞানিক সমিতি স্থাপন করেছিলাম। সেখানে অনেক গণ্যমান্য অধ্যাপক বিজ্ঞান-বিষয়ে বক্তৃতা করতেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান, তাঁরাও নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়তেন।

আমি আগেই বলেছি যে ছেলেবেলায় আমি ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছিলাম। সেইজন্য বি এ পাশ হওয়া পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা থিয়েটার দেখার অনুমতি পাই নেই। বাই নাচ দেখা ত ইহজীবনে হল না। কিন্তু দুবার বিলেত থেকে ইংরেজী কোম্পানী এসেছিল শেক্স-

পীয়রের নাটক প্রয়োগ ক'রে দেখাতে। একবার Milne, আর এক-বার Potter-Bellew। সে অভিনয় আমরা অনেকবার দেখেছিলাম। বাড়ী ও কলেজ দু জায়গা থেকেই, শুধু অনুমতি নয়, আদেশ পেয়ে-ছিলাম। এই সব কোম্পানীর অভিনেত্রীরা সাধুচরিত্র, এদের দেখলে দোষ নেই, এই বোধহয় অভিভাবকদের সংস্কার ছিল। এ সংস্কারটা যে নেহাৎ কুসংস্কার তা অনেক পরে জানলাম। কিন্তু যেদিন আমরা হ্যামলেট দেখতে প্রথম যাচ্ছি, আমার মা জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে, তবে যে তোদের থিয়েটার দেখা বারণ?" আমি তখন উত্তর দিলাম, "সে বাঙ্গালা থিয়েটার।" মা বল্‌লেন, "কে জানে, বাবু? বাংঙ্গলা ইংরেজীতে কি এসে যায়?" মেয়েদের বুদ্ধি পুরুষদের চেয়ে অনেক logical, ন্যায়সঙ্গত, হয়ে থাকে। তখন, খুব বেশী দিন আগের কথা নয় এই ইংরেজী অভিনেত্রীদের বিলেতেই এত নীচ জাতি মনে করত যে গির্জ্জায় সাধারণ কবরস্থানে এদের মাটি দেবার হুকুম ছিল না। মোট কথা, আমাদের সময়ে কলকাতা সমাজে একটা শুচিবাই বেশ প্রবল ছিল।

রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা একটু বলি। কলকাতার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৮৯০ সালে। লর্ড রিপনের রাজত্বের ও ইলবার্ট বিলের জের তখনও চলছে। ছোট জাতের সাহেবদের যে নেটীব বিদ্বেষের কথা বলেছি সেটা এরই ফল। কারণ, সিপাহী-বিদ্রোহ তখন বহু পুরাতন ব্যাপার। বছর পাঁচ-ছয় আগে বড়লাটের শুভ আশীর্ব্বাদ নিয়ে কংগ্রেস মহাসভার বোধন হয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর মত দুয়েকজন নামকাটা সেপাইএর দৌলতে উক্ত মহাসভা সরকারের চক্ষুঃশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিনা কারণে, কেননা কংগ্রেসের কর্ত্তারা নিরীহ জীব ছিলেন, ইংরেজের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। Consent Bill-এর দরুন যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল সেটা কতকটা অন্য ধরণের। তার মূলে একটা দুর্দ্দম জাতিবিদ্বেষ ছিল। সরকারও সেটা বুঝতেন। তাই বঙ্গবাসীর দলকে ধ'রে রাজদ্রোহের জন্য সাজা দিলেন। আমার দুজন সহপাঠী কলকাতা কংগ্রেসে সেবক হয়েছিলেন, কিন্তু ধর্ম্মে ব্রাহ্ম ছিলেন। তাঁরা কলেজে বেশ প্রকাশ্যভাবে বঙ্গবাসীওয়ালাদের নিগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করতেন। কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ তখন বঙ্গবাসীর দল আর সঞ্জীবনীর দল এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আর এঁদের পরস্পরের বিদ্বেষের দরুন কলকাতায় প্রায় সকল কাজই পণ্ড হত। এই ঝগড়ার বিষ কলেজে মেসে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনেটোলার এক মেসে দোলের দিন মাথা ফাটাফাটি পর্য্যন্ত হয়ে গেল। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে সনাতনী আর হিউগেনোদের

অনেক কাটাকাটি হয়ে যাওয়ার পরে যেমন এক পলিতিক্ উঠে আস্তে আস্তে হুরকমেরই গোঁড়াদের হটিয়ে দিলে, আমা কলকাতাতেও তেমনি এক পলিতিকদল হিতবাদী কাগজ করলেন। তাঁরা অবতীর্ণ হলেন হুই গোঁড়া দলকেই "হিতং মনোহারি হুলর্ভং বচঃ" শোনাবার জন্যে। ক্রমে এই পলিতিক দলই বাঙ্গলার আস ছেয়ে ফেললে। তাঁদের সামনে গোঁড়া ব্রাহ্ম ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ হুই ভঙ্গ দিলেন। অবশ্য তাঁরা তখন আর হিতবাদীর দল রইলেন না, কার হিতবাদী প্রথম হুই একজন সম্পাদকের পরেই সনাতনীর ধ্বজা উড়ালেন যাকে বিপ্লবপন্থী বলা যায়, এরকম কেউ আমাদের সময় ছিল না। যা ইংরেজকে শত্রু ভাবত তারাও বিক্টোরিয়াকে মহারাণী ব'লে মানত। এ খুব স্পষ্ট বোঝা গেছল কয়েক বছর পরে। মহারাণীর মৃত্যু হলে গড়ে মাঠে যে অপরূপ দৃশ্য সে সময় একদিন দেখা গেছল, তার একমাত্র মা এই হতে পারে যে জনসাধারণ রাণী বিক্টোরিয়াকে ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত সেই দৃশ্য দেখেই ত লাট কার্জ্জন বলেছিলেন, "If it is real, what does it mean ?" ১৮৯৫ সালে ইংলিসম্যান কাগজে এক উড়ো চিঠি A Rampant Epistle, নামে ছাপা হয়। সে চিঠির লেখককে ধরে দণ্ডবিধি আইনের ১৫৩ এ ধারা অনুসারে সাজা দেওয়া চলত। কিন্ত একটা মস্ত ভাববার কথা হচ্ছে এই যে তাতে সম্পাদকের জাত ভাইদে বলা হয়েছিল, "তোমরা স'রে পড়। আমরা মহারাণীর নামে এদেশ শাসন করব।" অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর পাগলাদের মনেও তখন ইংলণ্ডেশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করার ভাব আসে নেই। চিঠিখানা নিতান্ত নগণ্য, তবে ইংলিশম্যান তার খুব সদ্ব্যবহার বছরখানেক ধ'রে করেছিলেন। আর দেশী কাগজওয়ালারা সেটাকে ইংলিশম্যান আফিসের জাল ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। কেননা ওরকম সংযত পাগলামীও তাঁদের কল্পনার বাহিরের জিনিস ছিল। চিঠিটা জাল নয়, কারণ তার খসড়া আমি দেখেছি। পাঠকের মনে একটা ধারণা ক'রে দিতে চেষ্টা করলাম যে আমাদের ছাত্র-জীবনে রাজনৈতিক হাওয়া মৃদুমন্দ গতিতেই বইত। বিক্টোরীয় যুগের ভব্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যায় নেই। কে জানে, হয়ত সে হাওয়াকে সময় থাকতে কল চালানোর কাজে জুড়ে দিলে, আজ ইউরোপের ঝঞ্ঝাবায়ু এদেশ বিধ্বস্ত করত না।

রাজনীতি চর্চ্চা আমার অধিকারের বহির্ভূত। মাঝে মাঝে লোভে প'ড়ে গণ্ডী পার হয়ে যাই, পরে পস্তাতে হয়। এই বেলা আর একটা গল্প জুড়ে দেওয়াই ভাল। আমরা কলেজে থাকতে বোডিসিয়া ব'লে এক রণতরী গঙ্গায় এসে লাগল। পেছনে পেছনে এল একটি ছবির মত

সুন্দর টরপিডো বোট, নাম মারাথন। এই হুই জাহাজের মাল্লারা শহরের সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াতে লাগল। ধবধবে সাদা কাপড়, হাসিহাসি মুখ, হেলেহুলে চলন, দেখে আমি ত মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হত এইসব লোক নিয়েই বোধহয় বোডিসিয়া একদিন রোমানদের হায়রান ক'রে তুলে-ছিলেন, এরাই হয়ত মারাথনে ইরানের হুর্দ্ধর্ষ বাদশাহকে হটিয়ে দিয়ে-ছিল। একদিন এদের মাত্র হুজন আমাদের চুনাগলির পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশ জন মেটে সাহেবকে মেরে ভূত ভাগিয়ে দিলে। আমাদের বাড়ীর পাশে এক চেলা কাঠের দোকান ছিল সেইখান থেকে ক্ষেপনীয় অস্ত্র সংগ্রহ ক'রে শত্রুদের উপর বর্ষণ করতে লাগল। সে কি সুন্দর দৃশ্য! যুদ্ধজয়ের পর কাঠের দোকানে গিয়ে, আবার একটা দশ টাকার নোট খেসারত দিয়ে গেল। আমি স্থির করলাম এরা সাহেবের সেরা, এদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে। পরদিন হুজন মারাথনের মাল্লাকে ধরলাম ইডেন গার্ডেনে। ব'সে ব'সে তারা আমাদের সঙ্গে কত গল্প করলে। তাদের মাল্লার জীবন যে কি সুন্দর আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলে। আমরা ধরলাম, "চল, তোমাদের জাহাজ দেখাও। আমরা টরপিডো বোট কখনও দেখি নেই।" একজন বললে, "আজ নয়, কাল এসো। জাহাজে উঠে আমাদের ডাক দিও। আমার নাম বার্বার, ওর নাম উড। মনে থাকবে ? Barber is one who shaves, and Wood is something you can't shave with !"

পরদিন গেলাম। বড় জাহাজটা ত বেশ দেখা হল। কিন্তু মারাথনের সামনে যে গোরা পাহারা দিচ্ছিল সে ঢুকতে দিলে না। অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা খোট ছাড়লে না, "No orders !" ইতিমধ্যে খুব জরিঝব্বা পরা এক বড় সাহেব বোডিসিয়া থেকে বেরিয়ে এলেন। খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি স্বয়ং নৌ-বহরের অধিনায়ক। তাঁর কাছে নালিশ করলাম। তিনি গোরাটার সঙ্গে কথা কয়ে এসে খুব ভদ্রভাবে বললেন, "তোমরা নেটীব কাপড় প'রে এসেছ তাই ঢুকতে দিচ্ছেনা। ও কেল্লার গোরা, ওর ওপর আমার কোন অধিকার নেই। I am sorry, boys !" তবু দাঁড়িয়ে রইলাম জাহাজের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে। সাহেবদের মজলিসে আমাদের কত হোমরা-চোমরা কর্ত্তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি তীর্থের কাকের মত, আমাদের কিসের লজ্জা! আমরা প'রে এসেছিলাম গরম ইজার আর সার্জের গলাবন্ধ কোট। অর্থাৎ আমাদের অফিসকা কাপড়া। তাকে বললে কিনা নেটীব ড্রেস! হঠাৎ দেখি হুই বন্ধু বেরিয়ে আসছেন মারাথন থেকে। তাঁদের আমাদেরই মত পোষাক, শুধু মাথার উপর, আমরা

যাকে monkey cap বলতাম, সেই জিনিস। তাড়াতাড়ি তাদের শির... চেয়ে নিয়ে আমরা মাথায় দিলাম। গোরাটা হেসে বললে, "এই... এইবার বেশ সাহেবী কাপড় হয়েছে, চলে যাও ভেতরে।" ভেতরে গি... আমাদের সেই দুই বন্ধুর সন্ধান করলাম। তারা এক গাল হেসে উঠে এ... ঘুরে ঘুরে আমাদের সব দেখালে। চা খাওয়ালে, সিগারেট দিলে পর্য্যন্ত। আসবার সময় আমার ভাই দুটো টাকা তাদের দিতে গেল তারা কিছুতেই নিলে না। বললে, We don't rob boys। পরের জীবনেও মানোয়ারী গোরাদের সঙ্গে যখনই আলাপ হয়েছে বড় আনন্দ পেয়েছি। একেবারে ছোট ছেলের মত প্রকৃতি। গল্পটা থেকে পোষাকের মাহাত্ম্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হল ত? আমার ত হয়েছিল। ঘটনাটা আমার স্মরণীয় কেননা জীবনে সেই প্রথম ইউরোপীয়ান ড্রেস পরা। একবার কাশী বেড়াতে গেছলাম সেখানেও পোষাক-বিভ্রাট ঘটেছিল। ব্যাস-কাশীতে রামনগরে কাশী-নরেশের কেল্লা। সে কেল্লার অনেক স্তুতিবাদ শুনে দেখতে গেলাম। কিন্তু ফটকের প্রহরী আটকে দিলে। বললে, "নাঙ্গা শির অন্দর যানে কা হুকুম নেহি।" তাড়াতাড়ি মলমলের টুপী জোগাড় ক'রে আনিয়ে প'রে কেল্লা দেখা হল। বাঙ্গালীর মাথাকে এত ভয় কেন সকলের?

১৮৯৫ সালে রাজদরবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হল। মহারাজের হুকুম এল যে আমি বড় হয়েছি, এবার আমাকে যথারীতি তাঁর দরবারী হতে হবে। কুচবেহারে গেলাম। আবার পোষাক-বিভ্রাট! আমার সে সার্জের গলাবন্ধ কোর্ত্তা ত চলবে না। চুড়িদার পায়জামা ও আঙ্গরাখা প'রে, মাথায় মুরেঠা বেঁধে গিয়ে দরবারে হাঁটু গেড়ে বসলাম। যখন ডাক পড়ল তিনবার কুর্ণিশ ক'রে রাজসিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আতর-মাখা রুমালের উপর এক আশরফি রেখে মহারাজের সামনে ধরলাম। তিনি ঈষৎ হেসে আমার নজর স্পর্শ করলেন। আবার কুর্ণিশ ক'রে পিছু হেঁটে নেমে এলাম। রোমান্টিক প্রকৃতি হওয়ার অনেক জ্বালা! নিজের আসনে ব'সে একটু ক্ষণ চোখ ঢেকে রইলাম। সব যেন বেঠিক হয়ে গেছে। কোথায় রয়েছি, এ কোন শতাব্দী, কে রাজা, কে আমি! চকিতের মত মনে হল যেন আমার জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ এসেছে। তবে স্বপন আর কতক্ষণ থাকে।

কলকাতার অনেক কথাই আমার বলা হল না। প্রথম যখন আসি তখন খুব কম লোকের সঙ্গেই পরিচয় ছিল। যে কজন চিনতাম তাঁরা আমাদের আত্মীয়, আমাদের জেলার লোক। তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধাস্পদ গিরীশবাবু ও ক্ষুদিরামবাবু। দুজনেই অধ্যাপক ছিলেন, আর দুজনেই জানতেন যে ছেলেপিলের শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসা, পুরোমাত্রায় কি

ক'রে আদায় করতে হয়। সকলের হেনস্তার জিনিস ধুতিকে যাঁরা আজ সম্মানের পদবীতে তুলেছেন গিরীশবাবু তাঁদের মধ্যে প্রধান। সেকালের বিলেত-ফেরং, কিন্তু ফিরে এসে অবধি একদিনও ইজার পরেন নাই। অথচ তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে কোনদিন নড়বড়ে ঢিলেঢালা মানুষ বলতে পারে না। ক্ষুদিরামবাবু নামে হিন্দু হলেও প্রকৃত ব্রাহ্ম ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম, যাঁরা কখনও খোসামোদ করতেন না, মিথ্যা কথা, মিথ্যাচার জানতেন না। এ দুজনের কাছে ছাত্রজীবনে অনেক আশীর্ব্বাদ, অনেক শিক্ষা পেয়েছি।

আমার বিবাহসূত্রে কলকাতার অনেক বনেদীঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতা হল। একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মানুষের সঙ্গে পরিচয় হল। সেকালের কলকাতার exquisites, সেকালের কাপ্তান, আজ আর নেই। একদিন তাঁদের কথা বলব। হয়ত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলব। তাতে পাঠক যদি আমায় ধামাধরা বলেন তাহলেও রাগ করব না।

আমার ছাত্রজীবনের যথার্থ গুরুর নাম এইবার করব। তাঁর কাছে অঙ্কশাস্ত্র শিখতে পেরেছিলাম বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু আরও অনেক জিনিস শিখেছিলাম যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যের বাইরে। তাঁর নাম বললে অনেকেই চিনবেন। অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। যখন বিলেতে পাশ করি তিনি লিখেছিলেন, "এত আমার গুরুদক্ষিণা হল না, বাবাজী। সেটা বাকী রইল, ভুলো না।"

আমার বিদ্যার্জ্জন-নামক প্রহসনের খুঁটি-নাটি চেপে যাওয়াই ভাল। কোনরকমে বিএ পরীক্ষার মোহানা পার হয়ে গেলাম, কিন্তু Post-Graduate নদী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই নৌকা বানচাল! বন্ধুরা সকলেই বিজয়পতাকা উড়িয়ে ডঙ্কা বাজিয়ে জীবন সংগ্রামে যাত্রা করলেন। আমাকে নিয়ে আমার কর্ত্তৃপক্ষ একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেকালে যদি কোন ছোট ছেলের কোথাও লেখাপড়ায় মনোযোগ হত না, তাকে কটন ইস্কুলে পাঠান হত, যদি না সে নিজের বুদ্ধির জোরে সরকারী reformatory-তে ঢুকে পড়ত। তেমনি একটু বয়স্থ ছেলেদের চালিয়ে দেওয়া হত বিলেতে, কেননা সেখানে তখনকার দিনে বিনা শ্রমে বিনা আয়াসে ব্যারিষ্টার হয়ে আসা যেত। আমার সার্বিস পরীক্ষা পার হওয়া সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হলেন। কিন্তু তাঁদের আশা, পাস হয়ে যায় ভালই, নইলে ব্যারিষ্টার ত হবে। এদিকে আমি প্রাণপণ টানাটানি করছিলাম যাতে বিলেত না যেতে হয়। শেষে একদিন শুনলাম যে বিলেত যদি না যাই ত ডেপুটী কলেক্টর হতে হবে। হাকীমী আমার অদৃষ্টে বাজছে। ভাবলাম, তাই যদি হয় ত তপ্ত বালির পূজা কেন করি, দীপ্ত সূর্য্যের উপাসনা করা যাক। বাবাকে জানালাম

যে আমি বিলেত যেতে রাজী আছি। এর ভেতর আর একটা কথা ছিল সেটা প্রকাশ করি। ব্রেজিলের সেনানী সুরেশবাবুর নাম সম্বন্ধে শুনেছেন। তাঁকে আমি খানদুই চিঠি লিখেছিলাম আমায় সেই দেশে একটা গতি ক'রে দিতে। মনে করলাম, বিলেত থেকে ব্রেজিল যাওয়া সোজা হবে। কিন্তু অদৃষ্ট কি এড়ান যায়? আমি ছমাস কাল bar-এ জন্য দেওয়ার টাকাটা ধ'রে রাখলাম। শেষে শুনলাম সুরেশবাবু মারা গেছেন। সেপাইগিরি অদৃষ্টে নেই, হবে কোথা থেকে? এত কথা ত আর কলকাতায় থাকতে জানতাম না। কাজেই শ্বেতদ্বীপে পাড়ি জমাবার জোগাড়যন্ত্র করতে লেগে গেলাম।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

রবীন্দ্রনাথ ও সম্পত্তির স্বরূপ

চারিদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার। তার মধ্যে কারা যেন সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলছে। আলো নেই, বাতাস নেই—পাতালপুরীর মূর্চ্ছাহত জীব অঙ্গারের মত নিঃশ্বাস ফেলছে। চক্ষে তাদের ধ্বংসের ইঙ্গিত, কশ বয়ে উত্তপ্ত শোণিত ঝরে পড়ছে, পাতালের ক্লেদ গায়ে মেখে দংশন করতে উদ্যত, গরলের ভার বহন করতে পারছে না, শুধু উন্মত্ত জিঘাংসায় পাষাণের গায় আছড়ে পড়ছে।

অন্ধকার গুহার মুখে প্রভাতের আলো দেখা যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হয়ে এল। দূরে ধানভরা মাঠে প্রকৃতির নবান্ন-উৎসব আরম্ভ হয়ে গেছে, প্রকৃতির বুক রসভারে ভরে উঠছে। বর্ষার জলভরা নদীর সে উদ্দামতা নেই—তীরের কারাশৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলবার তপস্যা তার শেষ হয়েছে। গুহামুখে প্রভাতী গান শোনা যাচ্ছে, "জীবন মরণ-জয়ী হে রহস্যময়ী দ্বার খোলো, খোলো দ্বার।"

জীবন-নাট্যের এই দুইটি দৃশ্যের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পাবার চেষ্টা যুগযুগান্তর ধরে চল্‌ছে। প্রকৃতির জীবনে যে মঙ্গল-রূপটি ফুটে উঠছে তা মানুষের জীবনে সহজ ও সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল না। মানুষ অনাদিকাল থেকে সেই রহস্যময়ীর দ্বারে করাঘাত করছে কিন্তু ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত বুকে হেঁটে পথ চলার অবসান বুঝি কখনও হবে না।

কিন্তু রহস্যময় জীবন-নাট্যের আর একটি দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়ে আছে যা আমাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে দেয়। পাতালপুরীর পাষাণ-ভিত্তির উপর একটা হাস্যমুখর সোনালী রাজ্য গড়ে উঠেছে। সেখানে কত রঙ, কত ঐশ্বর্য্য, কত সহস্র প্রকারের বিলাস-সজ্জা—সেখানে মানুষের কামনার অন্ত নেই, কর্ম্মপ্রেরণার শেষ নেই—এ যেন সর্ব্বগ্রাসী বর্ণবিলাসী দানবের স্বর্ণপুরী।

তিনটি দৃশ্যের এই যে অপূর্ব্ব নাট্য এর যবনিকা কেমন করে পড়বে তা এই নাট্যের নাট্যকারই জানেন। কিন্তু মানুষকে এই দৃশ্যাবলীর মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে বার করতে হবে এটাই হল চিন্তার দিক দিয়ে তার নবযুগের সাধনা।

একটা কথা কিন্তু খুব সহজেই মনে আসে; সেটা এই যে পাতালপুরী ও স্বর্ণপুরী এই দুটোই মানুষের সৃষ্টি। স্বর্ণপুরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে পাতালপুরীর অন্তঃস্থলে। স্বর্ণপুরীর মানুষ তার জীবনের রস ও সঞ্জীবনী শক্তি আহরণ করছে অস্বাভাবিক উপায়ে এবং ভোগও করছে অস্বাভাবিক উপায়ে। এ যেন খনির মধ্যে থেকে খনিজ পদার্থ আহরণ করা। যা

যায় তার ক্ষতিপূরণ নেই। বৃক্ষ যেমন করে পৃথিবীর গোপন স্তর থেকে রস আহরণ করে তেমন করে জীবনীশক্তি আহরণ করার কোনো ক্ষমতা নেই। তা যদি থাকত তা হলে মানুষের জীবনে সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা দেখতাম না, তার ভোগ ও কামনায় এতখানি শক্তিক্ষয় ও অপচয় দেখতাম না, মানুষের জীবনে পরদেহাশ্রিত পরান্নজীবী parasitic-এর ঘৃণ্যতাও দেখতাম না।

গ্রীক দার্শনিক Aristotle মানুষের জীবনের এই অস্বাভাবিক কার্য্যে পরিণতির একটা কারণ নির্দ্দেশ করেছিলেন। ভোগ জিনিষটা মানুষের ঐশ্বর্য্যময় প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশ। ভোগের মধ্যেই তার কল্পনা, সুকুমারবৃত্তি, শিল্পসাধনা ও সৃজনীশক্তি মূর্ত্তি পেয়ে থাকে। তাই মানুষ অর্থনৈতিক জীবনে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে অথবা ব্যবহার করে সে সকলের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বটাকেই খুঁজে পায়। কিন্তু সমাজ-জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-বিনিময়ের (exchange) সুবিধার জন্য যখন মুদ্রার প্রচলন হল তখন থেকে দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপথে চালিত হয়ে লাভ ও লোভনিবৃত্তির উপায় হয়ে দাঁড়াল। নিজের পরিশ্রমে ধন উৎপাদন করার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের স্ফূর্ত্তি দেখতে পাই তা ক্রমশঃ লোপ পেলে এবং সমাজের অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সাধারণের স্কন্ধে ধন উৎপাদন করবার ভার চাপিয়ে দিয়ে অবসর ভোগের চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাবে ক্রমশঃ অর্থনৈতিক অনৈক্যের সৃষ্টি হল এবং সমাজের স্তরবিভাগে এই অনৈক্যটা বদ্ধমূল হয়ে দেখা দিল।

কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরাজী প্রবন্ধে এই সমস্যার আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মত হচ্ছে এই যে সমাজ-জীবনের অপেক্ষাকৃত আদিম অবস্থায় property ছিল মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির বাহন-স্বরূপ, উহা সমাজের সংযত শক্তিকে জাগিয়ে রাখত এবং সমষ্টির মঙ্গলের জন্যে নিয়োজিত হতে পারত। এই অবস্থাটা Aristotle যাকে মুদ্রা-প্রচলনের পূর্ব্বের অবস্থা বলেছেন সে অবস্থা কখনই নয়; কারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের অপেক্ষাকৃত জটিল অবস্থায় property জিনিষটা সঞ্চিত ও সংহতরূপে দেখা দেয় এবং তখনই সেটা একটা institution বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য হতে পারে। সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটাকেই মানুষের সহজ জীবন যাপনের অবস্থা বলে ধরে নিয়েছেন। তারপর তিনি বল্‌ছেন যে magnanimity ও extravagance এই দুটো প্রবৃত্তি মানুষের প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে এবং প্রাচীন কালের রাজাদের অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ও অতিরিক্ত ব্যয় এই দুটো প্রবৃত্তিরই চরম প্রকাশ। কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তি বলে ভুল করলে চলবে না। এই অমিতব্যয়িতার মধ্যে নাকি বিংশ শতাব্দির ক্ষুদ্র মানুষের স্বার্থপর

প্রতিকূলতা নেই, কারণ সেকালে property জিনিষটা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত এবং সমষ্টির মঙ্গলসাধন করত।

তত্ত্বের দিক্ দিয়ে বা আদর্শবাদের দিক দিয়ে institution of property-র সমর্থন করা খুব শক্ত নয়। এ সম্বন্ধে দার্শনিক Green-এর মতবাদ পণ্ডিতগণ সর্ব্ববাদিসম্মত বলে গ্রহণ করেছেন। Green-এর মতে property-টা হচ্ছে "realised will" অর্থাৎ বহির্জ্জগতে আত্মোপলব্ধির বাহ্য প্রতীক। "Will" কথার অর্থ সাধারণ ইচ্ছা নয়—will বল্‌তে তিনি ধরে নিয়েছেন একটা "constant principle in virtue of which each seeks to give reality to the conception of a well-being which he necessarily regards as common to himself with others"। অর্থাৎ মানুষ অন্তরে যেটাকে সত্যি সত্যি শ্রেয় বলে মনে করে সেটা সাধারণভাবেও শ্রেয় বটে, কারণ ব্যষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের সহিত সমষ্টির সত্যিকার মঙ্গলের কোন বিরোধ নেই—এই শ্রেয়কে মানুষ বহির্জ্জগতে উপলব্ধি করে property-র মধ্য দিয়ে। মানুষ যে property-কে কামনা করে তা শুধু আধিভৌতিক জীবনের অভাব নিবৃত্তির জন্য নয়—"it is different from mere provision to supply a future want"। Property শুধু "instrument of satisfaction" নয়—উহা "instrument of expression"-ও বটে এবং সেই হিসাবে property হচ্ছে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতই মানুষের একটা অপরিহার্য্য অংশ।

পৃথিবীর সকল প্রতিষ্ঠানের মূলেই এমন একটা আদর্শ থাকে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে প্রবুদ্ধ করা। কিন্তু সমাজ-জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে যে কোন প্রতিষ্ঠান তার আদর্শসম্মত রূপ গ্রহণ করতে পারে না অথবা হারিয়ে ফেলে। মানুষ শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়েছে সভ্যতার ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত খুবই পাওয়া যায়, এবং যা এক সময়ে ছিল শিব তা কালক্রমে বানরে পরিণত হয়েছে তারও পরিচয় আমাদের সমাজে খুবই মেলে। আদর্শবাদী Green আদর্শবাদের ঝোঁকে এই মোটা কথাটা ভুলে যান্‌নি। তাই তিনি বলেছেন—"When one set of men are secured in the power of getting and keeping the means of realising their will in such a way that others are practically denied the power, in that case it may truly be said that property is theft"। বাস্তবিক ইতিহাসে institution of property-র বিকাশ ও বিবর্ত্তনের যে পরিচয় পাই তার থেকে একথা বলা চলে না যে property সমাজের

সমন্বয়শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে অথবা মানুষের "realised ... বা সমষ্টির মঙ্গলের প্রতীক হতে পেরেছে।" তাই সভ্যতার ই... Karl Marx-এর মত যাঁরা অর্থনীতির চোখ দিয়ে দেখছেন তাঁরা insti-tution of property-র সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না।

রবীন্দ্রনাথ Green-এর মত যে শুধু আদর্শ বা তত্ত্বচিন্তার দি... দিয়ে property-র স্বরূপনির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন তা নয়; তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রাচীনকালে বিশেষ করে আমাদের দেশে property জিনিষটা ব্যষ্টির ধন ও সমষ্টির মঙ্গলের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিল, তার কারণ এই যে ধনীর ধন সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। কথাটা নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না, কারণ এটা শুধু আদর্শবাদী দার্শনিকের উক্তি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সভ্যতার কথা তুলেছেন, ইতিহাসের নজীর দিয়ে নিজের মতের সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রাচীন কালের property-র ঐশ্বর্য্যময় রূপটা প্রকাশ পেয়েছে extravagance-এর মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ যাকে extravagance বলেছেন সেই স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীনকালের দেব-মন্দির নির্ম্মাণে। প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের বিরাট সমৃদ্ধির মূল প্রেরণা এসেছে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্র থেকে এ কথা তিনি বোধহয় অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যখন শুনি যে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য ও দরিদ্র ব্যক্তিও এই সমৃদ্ধির মধ্যে স্থান পেয়েছে তখন কথাটা মেনে নিতে দ্বিধা হয়। কবির রঙীন চশমা এঁটে যাঁরা প্রাচীন সভ্যতার ঐশ্বর্য্যরূপ নিরীক্ষণ করেন তাঁদের পক্ষে কথাটা মেনে নেওয়া অত্যন্ত সহজ। আধুনিক যুগের যন্ত্রমূলক সভ্যতা সাধারণ মানুষের সৃজনীশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে এইরূপ একটা অভিযোগ কবি ও দার্শনিকদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালের স্থাপত্যশিল্পের ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্থান কতটুকু ছিল তা ভেবে দেখবার বিষয়। প্রাচীন craftsmanship বা শিল্পকৌশল আমাদের কবিত্বকে মুগ্ধ করে। হিন্দুর মন্দিরের কারুকার্য্য, বৌদ্ধের চৈত্যের গৌরবময় ঐশ্বর্য্য, মিশরের পিরামিডের বিশালতা, মুসলমানের তাজের শিল্প-নৈপুণ্য প্রাচীনকালের শিল্পসাধনার নিদর্শনরূপে আজও এই কলকারখানার যুগের মানুষকে বিস্মিত করে দেয়। কিন্তু সাধারণ দরিদ্র মানুষ এই বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যের সমৃদ্ধি থেকে বহু দূরেই অবস্থান করত। জনসাধারণ বলতে আমরা যাদের বুঝি তারা চিরকালই সভ্যতার ভারবাহী পশু ছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের Gothic শিল্প সম্বন্ধে Webb দম্পতি বলেছেন—"What a multitude of labourers quarried the stones and the stones of the cathedral walls

...which half a dozen skilled and artistic masons carved ... gargoyles"।

আধুনিক যুগে পারস্য দেশের rug ও carpet শিল্পের অসাধারণ সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বের উৎস খুলে দেয়। কিন্তু যখন ভাবি যে পাঁচ কিংবা ছয় বৎসরের শিশুকে দিনের মধ্যে বার-চোদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়ে এই carpet তৈরী হয়, যখন ভাবি শিশুর রক্তে এই carpet রক্তরঞ্জিত হয়ে দেখা দেয় তখন মনে হয় যে এই Art-এর মধ্যে মানবজাতির মঙ্গল নেই। স্বর্ণপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবতে গিয়ে পাতালপুরীর দাসত্ব-জর্জ্জরিত দরিদ্র শ্রমজীবীর কথা কবিত্বের ঝোঁকে ভুলে যাওয়া খুবই সহজ। তাই মনে হয় যে তাজমহলের কবি কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল যে এক বিন্দু অশ্রুজল দেখেছিলেন সে অশ্রুজল শাজাহানের নয়—সে অশ্রুজল শত শত অত্যাচারিত মানুষের যারা সভ্যতার বা Art-এর ভারবাহী পশু বলে গণ্য হয়ে এয়েছে। প্রাচীনকালের যে extravagance বা স্বেচ্ছাচারিতা Art-এর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল তাতে করে সাধারণ মানুষের বা সমষ্টির মঙ্গল সাধিত হয়েছিল এ কথা বিশ্বাস করা যায় না: কারণ এর মূলে ছিল exploitation, পরান্নজীবী parasite-এর জঘন্যতা—এর মধ্যে welfare বা সমষ্টির মঙ্গল কিছুতেই থাকতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে প্রাচীন যুগের শিক্ষা, রোগীর সেবা, অন্নসত্র, রাস্তাঘাট এসবের জন্যে ধনীরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন; তাই তখনকার কালে property জিনিষটা ছিল সামাজিক কর্ত্তব্যবোধের প্রতীক ও বাহন। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এই প্রকার সদনুষ্ঠানের প্রেরণা এসেছে ধর্ম্মের দুর্দ্ধর্ষ শাসন থেকে। সাধারণ মানুষকে exploit করে অবসরভোগী অভিজাতশ্রেণীর যে সঞ্চয় সেই সঞ্চয়কে ধর্ম্ম সাধারণের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করেছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। ইউরোপেও মধ্যযুগে church-এর অক্ষুণ্ণ প্রভাব মানুষের অত্যাচারী প্রকৃতিকে কতক পরিমাণে প্রশমিত করেছিল এবং ধনীর social responsibility বা তার সামাজিক কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগ্রত করে রেখেছিল। কিন্তু ধনীর exploitation বা শোষণ সমাজের কাজে লেগেছে বলেই তার সকল দোষ নষ্ট হয়ে গেল তা আর যে কেউ স্বীকার করুক অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ কখনই করবেন না। বাস্তবিক কোন প্রতিষ্ঠানের utility বা কাজে লাগাটাই আসল কথা নয়। তা যদি হত তা হলে যে ব্যক্তি সারা জীবন জুয়াচুরী করে এবং পরকে শোষণ করে ধন সঞ্চয় করলে সে যদি মৃত্যুকালে তার সমস্ত সম্পত্তি ধর্ম্মার্থে দান করে যায় তা হলে তাকে দানবীর বলতাম। এই ধরণের দানটাই যে বড় জিনিষ নয় এইটাই

সকল দিক দিয়ে বোঝার সময় এসেছে। আধুনিক মানুষ এই দানকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলতে চায়; কারণ যে সমাজ এই প্রকার দানকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে সে সমাজকে কখনও সুস্থ ও সবল বলব না। ধর্ম্ম প্রাচীন যুগের ধনীর শোষণকে আপনার কাজে লাগিয়েছে; ঠিক তেমনি করেই তা মানুষের রক্তলোলুপ হিংস্র প্রকৃতিকেও কাজে লাগিয়ে শক্তিসক্ষম করবার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু এই শোষণ-ব্যবস্থাকে দূর করবার চেষ্টা ধর্ম্ম কোন দিনই করেনি। ধনীর উপর আপনার সম্মোহিনী শক্তি বিস্তার করে ধর্ম্ম তাকে পদানত করেছে, আবার দরিদ্রকে "Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven", এই প্রকার মাথা পেতে অত্যাচার সহ্য করবার বাণী শুনিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ নির্ব্বীর্য্য করে রেখেছে। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে সে প্রাচীন কালের বিরোধ, চাপা দিলেই তা নষ্ট হয় না এবং সেকালের শোষণজাত property কতকটা দরিদ্রের জন্য ব্যয়িত হত বলেই তা বড় হয়ে ওঠে না।

বাস্তবিক একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে প্রাচীন সভ্যতার অর্থনৈতিক বনিয়াদ এতটা কাঁচা ছিল যে তার উপর একটা ঐশ্বর্য্যময় ইন্দ্রপুরী গড়ে তোলা বিশ্বামিত্রের স্বর্গসৃষ্টির মতই একটা নিরর্থক প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধির রঙীন মায়ায় অন্ধ হয়ে property-র অন্তর্নিহিত স্বরূপটিকে ভুলে গেলে চল্‌বে না। অবসরভোগী অভিজাতসম্প্রদায় ও সাধারণ শ্রমজীবীর মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ সভ্যতার সকল স্তরেই দেখতে পাওয়া যায় সেই শ্রেণীবিভাগের উপরই প্রাচীন সমাজের সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এমেরিকার প্রসিদ্ধ অর্থনীতিজ্ঞ Veblen বলেছেন যে এই শ্রেণীবিভাগের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই মানুষের বর্ব্বর অবস্থায় যখন নারী ছিল দাসী এবং পুরুষ ছিল সেই সম্পত্তির ভোক্তা ও রক্ষক। ক্রমশঃ এই শ্রেণীবিভাগ সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। Property-র ভোগের মধ্যে যে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে খুঁজে পায় একথা সে ভুলে গেল। Property বা সম্পত্তি সম্মান বা প্রতিপত্তির প্রতীক হয়ে উঠল। ধনসঞ্চয়ের মধ্যে মানুষের কর্ম্মপ্রেরণার যে বিচিত্র প্রকাশ তা অন্তর্হিত হল এবং property জিনিষটা অপরের উপর প্রভুত্ব করবার উপায় হয়ে দাঁড়াল। তাই Veblen বলেছেন, "By a further refinement wealth acquired passively by transmission from ancestors or other antecedents presently becomes even more honorific than wealth acquired by the possessor's own effort"। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের এই পরিণতির একটা দিক্ আছে যা বিশেষ করে লক্ষ্য করার

জিনিষ। সেটা এই যে শ্রমবিমুখতাই ক্রমশঃ মানুষের কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়াল, কারণ বর্ব্বর মানুষ কায়িক পরিশ্রমকে দাসত্ব ও দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলে মনে করতে শিখলে। এই প্রকার সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তির উপর একটা বড় জিনিষ গড়ে উঠতে পারে না। প্রাচীনকালের এই শোষণজাত সভ্যতার ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধি ছিল এ কথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল বালির ভিত্তি। এ যেন একটা অভ্রস্পর্শী পিরামিড্—যার চারিদিকে শুধু মরুভূমির তৃষ্ণা ও নগ্নতা। এই জন্যই সেই বর্ণবিলাসী যুগের রক্তরাঙা রঙ্গালয় মহাকালের ফুৎকারে বুদ্‌বুদের মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। অতীতের উৎসবরাত্রির কত গান, কত নৃত্য, কত রঙ-বেরঙের বাতি, নূপুরের রিণিঝিণি, সারেঙের স্বপ্নভরা তান—মোহমদির কণ্ঠে রূপসীর কত হাসিগান, মর্ম্মর হর্ম্ম্যবুকে কামনার তৃপ্তিহীন তৃষ্ণা—এসকলই মসীলিপ্ত একাকার হয়ে স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে।

বাস্তবিক property জিনিষটাই এমন যে তাকে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখলে তা সমাজের সমন্বয়শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলে, তার সৃজনী-শক্তির উদ্বোধনের পথে বাধার সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই property-র ঐশ্বর্য্যরূপটা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে। তাই তিনি বলেছেন, "Property is the objective manifestation of our taste, our imagination, our constructive faculties, our desire for self-sacrifice"। কিন্তু ইতিহাসের মধ্যে property-র objective manifestation-টা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। Veblen যাকে "conspicuous waste" বলেছেন সেই সুস্পষ্ট অপচয়ই প্রাচীন যুগের Art-এর মধ্যে অতিকায় হয়ে ফুটে উঠেছে। ভাবী কালের Art জীবনের সৃজনীশক্তির বাহন হয়ে উঠবে তখনই যখন property-টা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সমাজের সমন্বয়শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগের লোলুপতাকে অবজ্ঞা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের দুর্ব্বল জাতিসমূহকে আপনার লোলুপতার যূপকাষ্ঠে বলি দেবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে আছে। তা ছাড়া আজকালকার সহরের সভ্যতাও পল্লীজীবনকে শোষণ করে বেঁচে আছে। কিন্তু এই শোষণ বা exploitation-এর সমস্যাটা আসলে সেই প্রাচীন কালেরই সমস্যা—এটাকে আধুনিক সমস্যা বললে ভুল করা হবে। পূর্ব্বে বলেছি যে প্রাচীনকালে ধর্ম্ম এই সমস্যাকে আপনার মন্ত্রবলে চাপা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মন্ত্রের আর সে শক্তি নেই, তাই exploitation-এর নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশ হয়ে পড়েছে এবং ধনিক ও শ্রমিকের সেই আদিমকালের বিরোধটা নৃশংস হয়ে জেগে উঠেছে। আধুনিক

সভ্যতার বিপুল ঐশ্বর্য্য মানুষের সঙ্ঘজীবনের কর্ম্মচেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। তাই সাধারণ মানুষ আর সভ্যতার ভারবাহী পশু হয়ে থাকতে চায় না। এই বিপুল ঐশ্বর্য্যে তার অংশ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "Where the temptation of high living, normally confined to a negligible section of the community, becomes widespread, its ever-growing burden is sure to prove fatal to civilisation"। রবীন্দ্রনাথ যাকে high living বল্ছেন তারই ভিত্তির উপর প্রাচীনকালের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আধুনিক যুগে যে রাজসিক ভোগ-প্রবৃত্তি একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করছে এইটাকেই রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসের লক্ষণ বলে মনে করেন। কিন্তু এই high living চিরকালই পরদেহাশ্রিত parasite-এর ঘৃণ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁরা ভাবী কালের নূতন সমাজ গড়ে তুল্তে চান তাঁরা মনে করেন যে এই পরজীবিতার ধ্বংস হবে সর্ব্বসাধারণের অপব্যয় প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধের আলোচনা করছি সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কিছুকাল পরেই তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। রাশিয়ার নূতন সমাজ-ব্যবস্থার উদ্যোগ-পর্ব্ব চাক্ষুষ দেখে তাঁর কবিচিত্ত যে বিশেষ-ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল—তার প্রমাণ "রাশিয়ার চিঠি"তে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার, অভিজাতশ্রেণীর মানুষ, তা ছাড়া তাঁর চুলও পেকেছে। এ অবস্থায় সাধারণ মানুষ রাশিয়ার প্রাচীন-সংস্কার-বিবর্জ্জিত সমাজ-ব্যবস্থা দেখে পুলকিত হয়ে উঠবে এরূপ আশা করা অন্যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত মানুষের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। তাঁকে লোকে আর যাই বলুক Die-hard বলতে সাহস করবে না, কারণ তিনি নবীনের পূজারী, সত্যের পূজারী, সমাজের অন্ধ সংস্কার থেকে চিরকাল নিজেকে আশ্চর্য্যভাবে মুক্ত রেখেছেন। এত বড় মন নিয়ে তিনি রাশিয়ার নব-বিধানের স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রাচীন মতামত বদ্‌লেছে কি না এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে আমার প্রসঙ্গ শেষ করব।

রবীন্দ্রনাথ তার সর্ব্বপ্রথম চিঠিতে লিখেছেন, "চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন, তাদের মানুষ হবার সময় নেই।" তারপর বলেছেন, "আমি অনেক দিন এদের কথা ভেবেচি, মনে হয়েচে এর কোন উপায় নেই। একদল তলায় না থাকলে আর একদল উপরে থাকতে পারে না, অথচ উপরে

থাকার দরকার আছে।" তাঁর উক্তিটা পড়ে হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি Aristotle-এর মতই Philosophy of Leisure-এর ব্যাখ্যা করে পাতাল-পুরীর ভিত্তির উপর যে অবকাশের স্বর্ণপুরী গড়ে উঠেছে তারই মহিমা কীর্ত্তন করছেন। তিনি বল্ছেন, "জীবিকানির্ব্বাহ করার জন্যে ত মনুষত্ব নয়, একান্ত জীবিকাকে অতিক্রম করে তবেই তার সভ্যতা। সভ্যতার সমস্ত শ্রেষ্ঠ ফসল অবকাশের ক্ষেত্রে ফলেছে।" আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে প্রায় এই প্রকার তর্কের সাহায্যেই Aristotle-এর মত অত বড় rational দার্শনিকও দাসত্বপ্রথার সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এত বড় culture-এর পূজারী কথাটাকে নিঃসংশয় চিত্তে মেনে নিতে পারেন নি। তাই তিনি বলছেন, "যাই হোক আমি ভালো করে কিছুই ভেবে পাইনি—অথচ অধিকাংশ মানুষকে তলিয়ে রেখে, অমানুষ করে রেখে তবেই সভ্যতা সমুচ্চ থাকবে এ কথা অনিবার্য্য বলে মেনে নিতে গেলে মনে ধিক্কার আসে!" কবির এই উক্তি থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট করেই মনে হয়। সেটা এই যে কবির মনে একটা দ্বিধা ও সংশয় জেগেছে। Institution of property-র যে রূপটা রবীন্দ্র-নাথের কবিচিত্তকে মুগ্ধ করেছিল সে রূপটা যে তার আসল রূপ নয় এরূপ একটা সন্দেহ তাঁর মনে জেগেছে। Private property বা ব্যষ্টির ধনসম্পত্তিই আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। এই বৈষম্যের সমস্যাটা প্রাচীন যুগে এতটা প্রবল হয়ে ওঠে নি, কারণ ধর্ম্ম ও অন্ধ সংস্কার মানুষকে এই বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল এবং wealth বা ধন যে সমাজের সংহতিশক্তির ফল এ ধারণাটাও সর্ব্বসাধারণের মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু মূল সমস্যাটা চিরকালই রয়ে গেছে। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ যাদেরকে "সভ্যতার পিলসুজ" বলেছেন তারা নীচের অন্ধকারকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে উপরের আলোর সন্ধানে। তাই "দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে।" অবশ্য এ জিনিষটা রাশিয়ায় সম্ভব হয়েছে একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের সাহায্যে। যে সকল প্রাচীন সংস্কার ও প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার বৈষম্যকে সমর্থন ও পালন করে এসেছে সেই সকল সনাতন জিনিষকে রাশিয়ার বিপ্লবীরা "একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে।" অর্থনৈতিক জীবনে private property-কেও তারা জটে ধরে টান মেরে নির্ম্মূল করার চেষ্টা করেছে। এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "সমস্ত মানব সাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ

করো—মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনং—কারো ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটাকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায়—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ।" Abolition of private property-র এই প্রকার সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা আর কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু এই কথাটাকে শুধু একটা ব্যাখ্যা বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। এই বিরাট আদর্শকে কবি খুব স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন, কারণ তিনি বলছেন যে "মা গৃধঃ" ও "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথাঃ"। উপনিষদের এই দুইটি কথার তাৎপর্য্য তিনি রাশিয়ায় গিয়ে স্পষ্ট করে বুঝেছেন। শুধু আদর্শের দিক দিয়ে নয় অর্থনৈতিক যৌক্তিকতার দিক দিয়েও কবি private property-র অস্তিত্বের কোন সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। কবি বলেছেন যে পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য অনেকের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ থাকায় ধনের সে "পুঞ্জীভূত রূপ" যেখানে সবচেয়ে বড় করে চোখে পড়ে তাকে কবি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন। তার কারণ এই যে "এই সমৃদ্ধি যদি সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতো তা হলে তখনই ধরা পড়তো, দেশের ধন এত কিছু বেশি নয় যাতে সকলেরই ভাতকাপড় যথেষ্ট পরিমাণে জোটে। এখানে (অর্থাৎ রাশিয়ায়) ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে, দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই—আছে অকিঞ্চনতা।"

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অমরু-শতক

অমরু-শতক—অমরু কবির প্রেমের কবিতা।

কিন্তু প্রথমেই এক বিপুল সমস্যা—অমরু নামে নাকি কোনো কবি ছিলেন না এবং কবিতাগুলির রচয়িতা নীরস অদ্বৈতবাদী দার্শনিক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

এ জাতীয় অনুমানের কারণ কি আগে তারই আলোচনা করি—অবশ্য সংক্ষেপে।

মাধবকবির 'শঙ্করদিগ্বিজয়' নামে একখানি কাব্য আছে। শঙ্করাচার্য্যের জীবনের একটি চমৎকার রসাল উপাখ্যান এর এক স্থানে দেখতে পাই। শঙ্কর মণ্ডন মিশ্রের বাড়ীতে উপস্থিত; উদ্দেশ্য মিশ্র-প্রবরকে তর্কে পরাজিত ক'রে স্বমতে অর্থাৎ অদ্বৈতমতে দীক্ষিত করা। মণ্ডনের পত্নী উভয়ভারতী (শারদা)—ইনি নাকি নারীরূপিণী সরস্বতী—ক'রলেন পূর্ব্বপক্ষের উপস্থাপন। পূর্ব্বপক্ষটি আদিরসঘটিত। আজন্ম ব্রহ্মচারী শঙ্কর আদিরসের ধার ধারেন না। কিন্তু পরাজয়, বিশেষতঃ নারীর কাছে পুরুষের পরাজয়, মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। শঙ্কর একমাসের সময় নিয়ে বেরুলেন আদিরস চর্চ্চা ক'রতে। সুযোগও মিলে গেল। আকাশপথে ঘুরতে ঘুরতে শঙ্কর দেখলেন মৃগয়া ক'রতে এসে হঠাৎ রাজা অমরক মারা গেছেন এবং তাঁর শবদেহ ঘিরে তন্বীতরুণী রাণীরা (সংখ্যায় একশ') আকুল হয়ে কাঁদছেন। শঙ্কর যোগবলে ঢুকলেন অমরকের দেহে; ফলে রাজা উঠলেন বেঁচে। আদিরস চর্চ্চা চলতে লাগল অবাধে, অবিশ্রান্তভাবে—সময় মোটে একমাস। কাজ উদ্ধার ক'রে শঙ্কর রাজদেহ হতে বেরিয়ে এলেন এবং বলাই বাহুল্য, রাজার আবার মৃত্যু হলো।

এই ঘটনা হতেই অনেকের অনুমান শঙ্কর রাজা অমরকের নামে 'অমরু-শতক' রচনা ক'রেছিলেন।

অমরু নামে স্বতন্ত্র কবির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এমন লোকেরও কিন্তু অভাব নেই। আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য তাঁর 'ধ্বন্যালোক' নামে রসগ্রন্থে ব'লেছেন,—'তথা হি অমরুকস্য কবেঃ মুক্তকাঃ শৃঙ্গাররসস্যন্দিনঃ প্রবন্ধায়মানাঃ প্রসিদ্ধাঃ এব'। আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন নবমশতাব্দীর লোক; কাজেই অমরু(ক) তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী।

এতেও কিন্তু সমস্যার মীমাংসা হয় না, যেহেতু, শঙ্করও জন্মেছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে।

আমার বিশ্বাস অমরু-শতক শঙ্করের রচনা নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে আদিরসের ব্যাপক বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল না। নিতান্তই একটি

ক্ষণিক প্রয়োজনে এ সাধনা তাঁকে ক'রতে হয়েছিল—এ তাঁর জীবনে এক অতি আকস্মিক অভাবনীয় ঘটনা, হয়তো বা দুর্ঘটনাই। নিষ্ঠা সন্ন্যাসী যে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের সঙ্গে একখানি সকাম শৃঙ্গারশাস্ত্রও জগৎকে উপহার দিয়ে যাবেন এমন মনে করাই অসঙ্গত।

অমরু-শতকের কবি হয়তো অমরুই। নাও যদি হয়, ক্ষতি কি; Shakespeare-ই লিখুন আর Bacon-ই লিখুন Hamlet Hamlet; আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অমরু-শতকের আলোচনা।

গোড়াতেই বলেছি অমরুশতক প্রেমের কাব্য—ধারাবাহিক কাব্য নয়, কালিদাসের শৃঙ্গারতিলক বা ওমরের রুবাইয়াতের মতন অসংবদ্ধ কবিতার মালা। কিন্তু সংখ্যা একশ' নয়, একশ' দুই এবং মতান্তরে একশ' তেষট্টি—নানান ছন্দে রচিত এবং সকলগুলিই চতুষ্পদী; কেবল একটি দ্বিপদী—অনুষ্টুভ্ ছন্দে লেখা।

মিলন, বিরহ, বাসকসজ্জা, অভিসার, খণ্ডিতা, মান প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে কবিতাগুলির রচনা; কিন্তু শৃঙ্খলা নেই অর্থাৎ বিষয়বস্তুর ঐক্য নিয়ে কবিতাগুলি পর্য্যায়ক্রমে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো নয়। স্বকীয়া এবং পরকীয়া দুরকমেরই নায়িকা আছে। রসশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার যে নানানতর ভেদ দেখতে পাই, অধিকাংশ কবিতাতেই কৌশলে তার উপবর্ণনা দেখা যায়। হিন্দীকবি বিহারীলালের 'সতসই'-ও এই জাতীয় শৃঙ্গাররসের কাব্য; তবে সতশই বড়ো বই—সতশই সপ্তশতীর অপভ্রংশ, যদিও বিহারীকাব্যে কবিতার সংখ্যা আটশর কম নয়। হয়তো বা বিহারীলালের ওপর অমরুর প্রভাব আছে। বাঙলায় অমরু প্রায় অপরিচিত; কিন্তু হিন্দুস্থানে তা' নয়। অমরু-শতকের একাধিক হিন্দী সংস্করণ আছে।

কোনো কবিতাতেই জয়দেবী মাধুর্য্য দেখলাম না এবং ছন্দও সব জায়গায় ভাবের অনুগত ব'লে মনে হলো না। প্রেমের কবিতার মার্জ্জিত মাধুরীর প্রয়োজনীয়তা যতখানি, রৌপিকেরও তার চেয়ে কম নয়। 'গীতগোবিন্দে' দ্বিতীয় লক্ষণই প্রবল। এদিকে গীতগোবিন্দ অতুলনীয়, অনুকরণের অতীত; এর 'কান্তকোমলপদাবলী' নাম সার্থক। কিন্তু ভাব ও রসের দিকে বড়ো অগভীর—ভক্ত নই বলেই হয়তো আমার এরকম ধারণা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুটি লক্ষণই বর্ত্তমান।

কিন্তু ভাষায় ছন্দে ললিতমধুর না হলেও অমরু-শতক চমৎকার। চমৎকার এই জন্যে যে এতে ব্যঞ্জনালক্ষণ বেশী। তাই ব'লে প্রত্যেকটি কবিতারই যে এই সম্পৎ আছে, তা' নয়। তবে নিকৃষ্টশ্রেণীর কবিতার সংখ্যা কম। প্রেমিক প্রেমিকার জীবনে যা নিত্য ঘটে এমন অতি সাধারণ অবস্থার বর্ণনা ক'রতে ক'রতে কবি একসময় তা'র ওপর এমন

একটি অপরূপ স্পর্শ দিয়ে দিয়েছেন, যা'তে অতি সাধারণ অসাধারণের পর্য্যায়ে উঠে গিয়েছে। এই dramatic touch অমরুর বৈশিষ্ট্য এবং এ প্রতিভা শ্রেষ্ঠ কবিদেরই থাকে। অনেক স্থলে কবি ইঙ্গিতে যে-রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, বাচাল ভাষার তা' স্বপ্নেরও অতীত। এই সব কারণে বহিরঙ্গ সৌষ্ঠবের আংশিক অভাবসত্ত্বেও, অমরু-শতককে চমৎকার না ব'লে উপায় নেই। ভাষা এবং ছন্দগত মাধুরী-সৃষ্টির শক্তি যে কবির ছিল না এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন।

সুতনু জহিহি মৌনং পশ্য পাদানতং মাং
ন খলু তব কদাচিৎ কোপ এবং বিধোঽভূৎ
ইতি নিগদতি নাথে তির্য্যগামীলিতাক্ষ্যা
নয়নজলমনল্পং মুক্তমুক্তং নকিঞ্চিৎ ॥'

এমন কবিতা অল্প হলেও আছে। কিন্তু মাত্র চারটি চরণের অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে একটি অখণ্ড ভাবকে পরিপূর্ণ মূর্ত্তি দেওয়া কঠিন নয় কি?

অমরু প্রেমের কবি এবং তাঁর প্রেম কামগন্ধহীন অতীন্দ্রিয় প্রেম নয়। নারীপুরুষের যৌনসম্পর্কই তাঁর কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু। অমরু-শতকের একমাত্র রস শৃঙ্গার এবং স্বকীয়া পয়কীয়া দু'রকমেরই নায়িকার কথা থাকলেও পরকীয়ারই ওপর কবির টান বেশী। টীকাকার অর্জ্জুনবর্ম্মদেব আবার বলেছেন—'পরস্ত্রীগতোঽপ্যয়ং রসঃ…ন পাতকায়' এবং প্রামাণ্য ধরেছেন বাৎস্যায়নের বাক্যকে 'অন্যথা বাৎস্যায়নো মহর্ষিঃ… পরস্ত্রীসাধনং কথং প্রণীতবান্?' অর্জ্জুনবর্ম্মদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক; তখন হয়তো ভারতের কোথাও পবিত্র সুনীতি সমিতির অস্তিত্ব ছিল না। শৃঙ্গাররস আদিরস—বৈষ্ণবমতে মধুর রস। প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের সকলেরই এই রসটির ওপর অল্পাধিক আসক্তি ছিল। তাঁরা জানতেন—'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।' কথাটা অতিশয় সত্য। শৃঙ্গাররসকে বাদ দিয়ে শ্রেষ্ঠকাব্য দুনিয়ার কোথাও রচিত হয় নাই, হতে পারেও না। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে সংস্কৃতকাব্যের বিচারভার এখনো আদালতের ওপর পড়ে নাই। এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা ভালো—রসোত্তীর্ণ শৃঙ্গারই আমার আলোচ্য। আমি সাহিত্যের কথা বল্‌ছি, sexology-র নয়। সত্যকার সাহিত্যিক ঐন্দ্রজালিক। তাঁর যাদুমন্ত্রে কদর্য্য সুন্দর হয়ে ওঠে। কুৎসিতকে তাঁরাও কুৎসিত বলেই জানেন এবং তার নগ্নতাকে মূর্ত্তি দিতে তাঁরাও ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু জীবনে সুন্দর এবং কুৎসিত দুইই আছে আর সাহিত্যের অর্থ 'criticism of life'; কাজেই সাহিত্যেও কুৎসিতের

স্থান আছেই। শিল্পী একে অস্বীকার করেন না; কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে এ থেকে যায় প্রচ্ছন্ন এবং মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে সুন্দর। কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা সাহিত্য; রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনী, মানসসুন্দরী, চিত্রাঙ্গদা সাহিত্য; রসরূপটি বাদ দিয়ে সাহিত্যের ভিতর থেকে যারা শুধু ক্লেদ উদ্ধার ক'রতে চায়, অর্থাৎ Oscar Wild এর ভাষায় 'those who find ugly meanings in beautiful things', তাদের নিজের মনেই ক্লেদের ওপর আসক্তি আছে বলতে হবে, তারা নিজেরাই 'corrupt'। এই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত মন নিয়ে যারা অমরু-শতক পড়তে যাবে, তাদের কাছে এ কাব্য নিশ্চয়ই অশ্লীল। কিন্তু সত্যকার সাহিত্যরসিক যাঁরা, তাঁরা অমরুকে প্রথম শ্রেণীর কবি ব'লে গ্রহণ ক'রবেন।

কয়েকটি কবিতার বাঙলা অনুবাদ দিলাম। অনুবাদ মূলের অনুগত করবারই চেষ্টা করেছি, তবু মর্ম্মানুবাদ (বরঞ্চ free translation) বলাই ভালো। মূল শ্লোকগুলি পাদটীকায় ক্রমানুসারে দেওয়া হলো—

১। ওদের রাতের প্রেম-আলাপন
উচ্চকণ্ঠে উষায় কহিছে শুক;
পাশে গুরুজন—নবীনা বধূর
লজ্জায় হলো অরুণিত সোনামুখ;
কান হ'তে বধূ পলকে খসায়ে
টুকটুকে রাঙা পদ্মরাগের দানা
সমুখে ধরিল—দাড়িমের বীজ?—
তুলে নিল পাখী, অমনি নিমেষে মূক!

২। কোথায় চলেছ, অয়ি করভোরু, এই নিশীথে?
প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর মোর বক্ষের ধন যেথায় আছে।
একা পথে ভয়, তন্বী, তোমার লাগে না চিতে?
পাঁচখানি শর ধনুকে জুড়িয়া সঙ্গী যে মোর মদন আছে।

১। দম্পত্যোর্নিশি জল্পতোর্গৃহশুকেনাকর্ণিতং যদ্বচ—
স্তৎপ্রাতর্গুরুসন্নিধৌ নিগদতঃ শ্রুত্বৈব তারং বধূঃ।
কর্ণালম্বিতপদ্মরাগশকলং বিন্যস্য চঞ্চোঃ পুরো
ব্রীড়ার্ত্তা প্রকরোতি দাড়িমফলব্যাজেন বাগ্বন্ধনম্ ॥১৬॥

২। ক্বপ্রস্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ো মে।
একাকিনী বত কথং ন বিভেষি বালে
নন্বস্তি পুঙ্খিতশরো মদনঃ সহায়ঃ ॥৭১॥

৩। সখীরা আমায় ব'লে চ'লে গেল—
'ঘুমায়ে পড়েছে, তুইও ঘুমা'।
আমি ধীরে ধীরে বঁধুর অধরে
আবেশে আঁকিনু গোপন চুমা;
সহসা নিরখি রোমাঞ্চ তা'র
ফুটিয়া উঠেছে দেহের তলে—
কপট বঁধুয়া নয়ন দুখানি
মুদে আছে তবে ঘুমের ছলে!
লাজে মরে যাই; কি আর বলিব?
বঁধুয়া আমার অতুলনীয়—
যখন-যেমন-তখন-তেমন—
বিধিমতে লাজ হরিল প্রিয়।

৪। বঁধুর অধরে দংশন-ক্ষত হেরি কা'র কৌতুকে
অভিমানে বধূ লীলাকমলের আঘাত হানিল মুখে;
কমলের রেণু নয়নে লেগেছে—জ্বালায় কাতর বঁধু
মুদিল নয়ন; অমনি পলকে অনুশোচনায় বধূ
রাঙা ঠোঁটদুটি মুকুলিত করি সোনামুখ আনমিয়া
প্রিয়ের নয়নে ফুৎকার দিল, ব্যথায় ব্যাকুল হিয়া।
অমনি চতুর প্রিয়
চুমায় চুমায় রাঙিল ও ঠোঁট—পুলক অসহনীয়।

৫। নীলপদ্মদলে নয়, দৃষ্টি দিয়ে নিরমিল মালা;
কুন্দ নয়, শুভ্র হাসি—সেই পুষ্পে সাজাইল ডালা;
কুম্ভে নয়, পয়োধরে করিল সে অর্ঘ্যবিরচন;—
প্রিয়তরে নিজ অঙ্গে অপরূপ মঙ্গলাচরণ!

৩। সুপ্তোঽয়ং সখি সুপ্যতামিতি গতাঃ সখ্যস্ততোঽনন্তরং
প্রেমাবেশিতয়া ময়া সরলয়া ন্যস্তং মুখং তন্মুখে।
জ্ঞাতেঽলীকনিমীলনে নয়নয়োর্ধূর্ত্তস্য রোমাঞ্চ তো
লজ্জাসীন্মম তেন সাপ্যপহৃতা তৎকালযোগ্যৈঃ ক্রমৈঃ ॥৩৭॥

৪। লীলাতামরসাহতোঽন্যবনিতানিঃশঙ্কদষ্টাধরঃ
কশ্চিৎকেসরদূষিতেক্ষণ ইব ব্যামীল্য নেত্রে স্থিতঃ।
মুগ্ধা কুড্মলিতাননেন্দু দদতী বায়ুং স্থিতা তত্র সা
ভ্রান্ত্যা ধূর্ত্ততয়াঽথবা নতিমৃতে তেনানিশং চুম্বিতা ॥৭২॥

৫। দীর্ঘা বন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যৈব নেন্দীবরৈঃ
পুষ্পানাং প্রকরঃ স্মিতেন রচিতো নো কুন্দজাত্যাদিভিঃ।
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণার্ঘ্যো ন কুম্ভাম্ভসা
স্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কৃতং মঙ্গলম্ ॥৪৫॥

বিদ্যাপতির রাধার মুখেও শুনি ঃ—

'পিয় যব আওব এমঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥
কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥……'

অন্যত্র—

'যব হরি আওব গোকুলপুর……
আলিপন দেওব মোতিমহার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥……'

৬। শয্যায় মোর এলো যবে প্রিয়তম,
নীবীবন্ধন আপনি খসিল মম ;
নিতম্বতটে লুটাল শিথিল শাড়ী ;—
এইটুকু শুধু স্মরণ করিতে পারি।
তার পরে হায় সে যে কে, আমি কি, লীলা সে কেমন ধারা,
কিছু মনে নাই, বিস্মরণীর অতলে হয়েছে হারা।

৭। স্তনপট হতে চন্দন-লেখা নিঃশেষ হয়ে মুছে গেছে ;
অধরতলের তাম্বুলরাগ ঘুচে গেছে ;
নীল অঞ্জন গ'লে গেছে আর পুলকের স্বেদ জাগে দেহে,
রোমাঞ্চময় শিহর এখনো লাগে দেহে ;—
মিথ্যাবাদিনী, স্নানে গিয়েছিলি ? নদীজলে সব ধুয়ে এলি ?
আমি কি জানি না প্রসাধন যতো কাহার অঙ্গে থুয়ে এলি ?

নায়িকা দূতীকে পাঠিয়েছিলেন আপন নায়কের কাছে, নিজের প্রয়োজনে সম্ভবতঃ। তারপর, এইসব।

৮। বিজনে মোরে ডাকিল বঁধু গোপনকথা আছে ;
কৌতূহলে কাননতলে বসিনু তা'র কাছে।

৬। কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিতা নীবী স্বয়ং বন্ধনা—
দ্বাসো বিশ্লথমেখলাগুণধৃতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্।
এতাবৎ সখি বেদ্মি সাম্প্রতমহং তস্যাঙ্গসঙ্গে পুনঃ
কোঽয়ং কাস্মি রতংনু বা কথমিতি স্বল্পাপিমেন স্মৃতিঃ ॥১০১।

৭। নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতট নির্মৃষ্টরাগোঽধরো
নেত্রে দূরমনঞ্জনে পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীড়াগমে
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্ ॥১০৫-পরিশিষ্ট।

৮। অহং তেনাহূতা কিমপি কথয়ামীতি বিজনে
সমীপে চাসীনা সরসহৃদয়ত্বাদবহিতা।

কানে কানে কি কহিল প্রিয়তম,…
সহসা দেখি ধরেছে বঁধু কবরীখানি মম !
আমি কি করিলাম ?
অধরে মোর অধর তা'র চাপিয়া ধরিলাম।

ফলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—অবশ্য একটু বদ্‌লে—

'অধরে অধর বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখিল রুধিয়া'।

৯। অলক্তকের রাঙাকলঙ্ক ললাটপটে,
কঙ্কণ-লেখা কণ্ঠতটে,
কাজলকালিমা আননে জেগে
তাম্বুলরাগ নয়নে লেগে ;—
রজনীলীলার লিপিকা অঙ্গে বহিয়া উষায় ফিরিল ঘরে ;
বঁধুরে নিরখি অভিমানিনীর হিয়া বেদনায় গুমরি মরে !
তুলিয়া করের লীলাকমলেরে নাসার তলে
ঘননিশ্বাস ফেলিল মানিনী ঘ্রাণের ছলে।

প্রথম অংশটি দেখে চণ্ডীদাসের রাধাকে মনে পড়ে যায়—

'ছুঁইওনা ছুঁইওনো বঁধু ওইখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদ মুখখানি দেখ ॥
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া ওমুখ দেখিলাম
দিন যাবে আজ ভালো ॥
অধরের তাম্বুল নয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি।……'

১০। ধরে নাই প্রিয়া অঞ্চল মোর ;
বাহুলতা দিয়া বন্ধ করেনি দ্বার,

ততঃ কর্ণোপান্তে কিমপি বদতাঘ্রায় বদনং
গৃহীতা ধম্মিল্লে সখি স চ ময়া গাঢ়মধরে ॥৯৮।

৯। লাক্ষালক্ষ্ম ললাটপট্টমভিতঃ কেয়ূরমুদ্রাগলে
বক্ত্রে কজ্জলকালিমা নয়নয়োস্তাম্বূলরাগোঽপরঃ।
দৃষ্ট্বা কোপবিধায়ি মণ্ডনমিদং প্রাতশ্চিরং প্রেয়সো
লীলাতামরসোদরে মৃগদৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিংগতাঃ ॥৬০।

১০। লগ্না নাংশুকপল্লবে ভুজলতা ন দ্বারদেশেঽর্পিতা
নো বা পাদযুগে স্বয়ং নিপতিতং তিষ্ঠেতি নোক্তং বচঃ।
কালে কেবলমম্বুদালিমলিনে গন্তুং প্রবৃত্তঃ শঠ—
স্তন্বা বাষ্পজলৌঘকল্পিতনদীপূরেণ রুদ্ধঃ প্রিয়ঃ ॥৬২।

চরণে আমার লুটায়ে পড়েনি,
'যেয়ো নাকো, বঁধু',—বলেনি একটিবার ;
তবু মোর যাওয়া হলো না,—তখন
সজল আষাঢ় নেমেছে ধরণীতলে ;
সমুখ পথের তটিনী ভরিল
কানায় কানায় প্রিয়ার বাষ্পজলে।

১১। সহসা অধরে দংশন লভি
পলকে চকিতা কাঁপাইয়া ছুটি কর
'না, না, ছাড়ো, শঠ,'—রোষভরে কয়,
ভুরুদুটি নাচে কামনায় থরথর,
সীৎকারে যার চপল নয়ন,—
রভসে তাহারে যে করিল চুম্বন,
সেই পে'লে সুধা, মূর্খ দেবতা
বৃথা ক'রে মরে সমুদ্রমন্থন।

১২। সমুখে আসি প্রেমের বাণী শোনায় যবে প্রিয়,
বুঝিতে নারি তখন মোর নিখিল ইন্দ্রিয়
নয়ান হ'য়ে বয়ানখানি নিরখে বঁধুয়ার
কিম্বা শোনে শ্রবণ হ'য়ে মধুর ঝঙ্কার !

এমনি একটি প্রকাশবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পাচ্ছি—

'অস্তশিখরে সূর্য্যের মতো সমস্তপ্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম।'

১৩। সে আজ বিরহী-মোর গৃহে, সে যে দিকে দিগন্তরে,
সে মোর সমুখে, মোর পিছনে সে, সে যে শয্যা'পরে,
সে আমার পথে পথে, সে আমার নিখিল ভুবনে,
আর মোর কেহ নাই, কিছু নাই আমার জীবনে,
শুধু সে, শুধু সে, সে সে, সে ছাড়া অস্তিত্ব আর নাই,—
এই কি অদ্বৈতবাদ ? কে বলিবে, কাহারে শুধাই ?

১১। সংদষ্টেঽধরপল্লবে সচকিতং হস্তাগ্রমাধুন্বতী
মা মা মুঞ্চ শঠেতি কোপবচনৈরানর্ত্তিতভ্রূলতা।
সীৎকারাঞ্চিতলোচনা সরভসং যৈশ্চুম্বিতা মানিনী
প্রাপ্তং তৈরমৃতং শ্রমায় মথিতো মূঢ়ৈঃ সুরৈঃ সাগরঃ ॥৩৬।

১২। ন জানে সংমুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে।
সর্ব্বাণ্যঙ্গানি কিং যান্তি নেত্রতাং কিমু কর্ণতাম্ ॥৬৪॥

১৩। প্রাসাদে সা দিশিদিশি চসা পৃষ্ঠতঃ সা পুরঃ সা
পর্য্যঙ্কে সা পথি পথি চ সা তদ্বিয়োগাতুরস্য।
হংহো চেতঃ প্রকৃতিরপরা নাস্তি মে কাপি সা স
সা সা সা সা জগতিসকলে কোঽয়মদ্বৈতবাদঃ ॥১ ২।

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

'মিলনে আছিলে বাঁধা
শুধু একঠাঁই, বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হ'য়ে গেছ, প্রিয়ে,
তোমারে দেখিতে পাই সর্ব্বত্র চাহিয়ে।
ধূপদগ্ধ হ'য়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তা'র
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার।'

সংস্কৃত কবিরও এমনি একটি শ্লোক রয়েছে—

'সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥'

কিন্তু
—'এই কি অদ্বৈতবাদ ?'

এর তুলনা আছে ? এই একটি মোহনস্পর্শে কবিতাটি অপরূপ হয়ে গিয়েছে।

বাহুল্যভয়ে বেশী অনুবাদ দিতে পারলাম না এবং প্রয়োজন আছে ব'লেও মনে করি না।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

ইতিহাস

(সূচনা)

সভ্যজগতে ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার একটা বিশেষ প্রয়োজন সর্ব্বদাই থাকে। ঘটনার পারম্পর্য্য কিংবা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সেই মতামতের সংস্পর্শে। নচেৎ, মানুষ ঘটনাস্রোতে খড়-কুটোর মতো ভেসেই চলে, জীবনের কোন অর্থ ও সার্থকতা থাকে না। যে বুদ্ধি জ্ঞানত অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত নয়, যা ক'রে হোক দিন গুজরান করাই যার সমস্যা কিংবা অভ্যাস, সেও জীবনের অসার্থকতা ও নিরর্থকতার বেদনা অনুভব করে। কেবলমাত্র গতানুগতিকতার মধ্যে যেটুকু সার্থকতা আছে, তারও পিছনে ইতিহাস-সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা কাজ করতে থাকে, বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের সঙ্গে যাঁদের দ্বন্দ্ব নেই, অর্থাৎ যাঁরা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনের বিরোধী, তাঁদের ধারণা এই যে তাঁদের মৃত্যুর পরই পৃথিবী উৎসন্ন যাবে, ইতিহাসের গতি মন্দা হবে। যাঁরা কল্পলোকে ফিরে যেতে চান, কিংবা এই লোকেই গোলোক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন তাঁদের ইতিহাস-সংক্রান্ত মতামত পূর্ব্বোক্ত মতামতের কাব্য-সংস্করণ। বিপ্লব-পন্থীদের ধারণা, ইতিহাসের গতি ক্রমশই দ্রুততর হয়ে স্বর্গরাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গতির ক্ষেপ দাদুরীর, কূর্ম্মের নয়। তাঁদের কাছে ইতিহাসের ধর্ম্ম হল উন্নতি। অতএব এই সমাজে সুখে বসবাস করতে হলে, এই সমাজ থেকে উদ্ধার পেতে হলে, একে ভেঙে নতুন সমাজ তৈরী করতে হলে ইতিহাসের ধর্ম্ম বুঝতে হয়। কারণ, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমাবেশ সাধন ক'রে ভালভাবে এবং আরো ভালভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা তার ওপর নির্ভর করছে।

শুধু তর্কের খাতিরে স্বীকার করা চলে যে অ-সামাজিক ব্যক্তির ইতিহাস-সংক্রান্ত সংস্কারের কোন প্রয়োজন নেই। বস্তুত, অ-সামাজিক ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই। দ্বীপে আটক হবার পূর্ব্বে রবিনসন ক্রুসোর সমাজ ছিল, দ্বীপে থাকবার সময় যে রকমে আহার সংগ্রহ করতেন বা অসভ্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন তার মধ্যে পূর্ব্বতন সামাজিক সংস্কার রীতিমতই প্রকট ছিল ; সেই সমাজে ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্রতাও তাঁর কমেনি। এক কথায়, রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা বর্ত্তমানকালের সংসারত্যাগী আশ্রম-বাসীদের অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সত্যকারের যোগী কালাতীত হবার জন্য সাধনা করেন শোনা যায়। তিনিও ইতিহাসের হাত থেকে, ইতিহাস-সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলার প্রয়োজন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ব'লে মনে হয় না। যোগী সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ-চিন্তায় নিযুক্ত থাকেন,

বিশ্বের অকল্যাণ হয়েছে, অকল্যাণের পথে অগ্রসর হচ্ছে, না ভাবলে কল্যাণ-চিন্তার প্রয়োজনই থাকে না। তা ছাড়া, যোগের ইতিহাস আছে, আবার যোগীরও ইতিহাস আছে, এবং সমাজ কি ভাবে যোগীকে দেখে এসেছে তারও ইতিহাস আছে।

বুদ্ধিজীবিদের কথা স্বতন্ত্র নয়। দার্শনিকদের সব প্রচেষ্টার মূলে একটি প্রশ্ন লুকিয়ে থাকেই থাকে—কাল-বস্তু মনের রচনা, না তার কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে, অর্থাৎ মহাকালের ইচ্ছায় পরিবর্ত্তন, না, পরিবর্ত্তনের একটি গুণের নাম কাল ? অর্থশাস্ত্রের মূলকথা মূল্যনিরূপণ, সেখানেও কালক্ষেপে মূল্যের গুরুত্ব ও লঘুত্ব নিরূপিত হয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কালের উৎপাত। বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে ইতিহাসের প্রবেশনিষেধ থাকলেও, পরীক্ষার পূর্ব্বতন ইতিহাস, মনসা-দেবীর মত, কোন না কোন ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ লাভ করে। আইনষ্টাইন কালকে বশ করতে চেষ্টা করেছেন্—অঙ্ক কযে। কিন্তু তাঁর পূর্ব্বে মাইকেলসন, মরলি, মিন্কাওস্কী, ম্যাক্সোয়েল না থাকলে তিনি অন্য কিছু হতে পারতেন, যা হয়েছেন তা হতে পারতেন না নিশ্চয়। আদৎ কথা এই, সব জ্ঞানই জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট, জীবন সামাজিক, অতএব জ্ঞান সমাজের সঙ্গে যোগসাধনের একটি প্রধান উপায়। আবার যখন নানা কারণে সমাজের সঙ্গে সহযোগ-সাধন অসম্ভব হয়, তখন নতুন জ্ঞানের অর্থাৎ বিজ্ঞানের সাহায্যে পুরাতন সমাজ ভাঙা হয়, নতুন সমাজ গড়ার চেষ্টা চলে। অতএব বুদ্ধিজীবি ও প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইতিহাস-সম্বন্ধে সত্য-সংস্কার-সৃষ্টির প্রতি কর্ত্তব্য রয়েছে। এ বিষয়ে যিনি উদাসীন তিনি জ্ঞানের উন্নতি করতে পারেন না।

বিশেষত ভারতের এই যুগে। শাসক-সম্প্রদায় (তাঁরা আবার ভিন্ন জাতি) বলছেন, "ধীরে ধীরে ইতিহাস চলে, আমাদের দেশে, ইংলণ্ডে, তাই চলেছে, প্রমাণ এডমণ্ড বার্কের উক্তি ; অতএব প্রথমে প্রাদেশিক বৈঠকে আংশিক স্বাবলম্বন, যোগ্যতাপ্রমাণের পর সম্পূর্ণ, তার পর দিল্লীতে দু-ইয়ারকী, সেখানে যোগ্যতাপ্রমাণের পর ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়ার মতন স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা। ভারতে ইতিহাসের ধারা এই হওয়া উচিত, অতএব এই হবে।" শাসিতের মধ্যে এক শ্রেণী অন্তত উত্তর দিচ্ছেন, "আমরা প্রস্তুত, তবে ইতিমধ্যে আপোষে যদি গোটাকয়েক সর্ত্ত খাড়া করতেই হয়, তবে সেগুলিকে আমাদের শুভের জন্যই প্রয়োগ করা চাই, এবং কিছুদিন পরে সেগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে।" ইতিহাসের অর্থ যে ক্রমোন্নতি দু'দলই স্বীকার করেছেন—হোর্ থেকে মহাত্মাজী পর্য্যন্ত। বছর বারো পূর্ব্বে ইতিহাস-সম্বন্ধে আমাদের অন্য ধারণা ছিল, মহাত্মাজীর বাক্যে আস্থা রাখলে, তাঁর আদেশ মান্য করলেই আমরা একটা বিশেষ তারিখে ইতিহাসের স্বরাজ-অধ্যায়ের

পাতা খুলে ফেলব। সে ধারণা আর নেই। এখন ক্রমোন্নতির সমাজ-সংস্কারেও এই নতুন ধারণা কাজ করছে। উচ্চশ্রেণীরা (মহাত্মাজী ও মালব্যজী) হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিতে প্রস্তুত, চতুর্বর্ণের ওপর হাত না দিয়ে। একে ইতিহাসের কমঠ-সংস্কার বলা

কূর্ম্ম অবতার এদেশেরই কল্পনা হলেও, এবং কমঠ-বৃত্তি একটি সুপরিচিত সাধনা হলেও, ইতিহাস-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ধারণা আমাদের নয়। আমাদের কার্য্যাবলী থেকে অন্য কোন ধারণা উদ্ভূত বলেই শাসক-সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সুবিধামত একটি ধারণা আমরা করেছি। আমাদের পণ্ডিতবর্গ নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ইতিহাসের ও প্রকৃতি-সম্বন্ধে কোন মত সৃষ্টি করতে পারেননি বলেই, উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে জীববিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদকে যেমন সামাজিক পরিবর্ত্তনের ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, তেমনি অন্ধভাবে তাকে আমরা এই দেশে প্রয়োগ করছি। এটা আমাদের অনুকরণ, সৃষ্টি নয়। সেই জন্য পার্থক্য শুধু তালে, শাসক ও ব্রাহ্মণ চাইছেন ঠায়ে চলতে, শাসিত এবং হরিজনেরা চাইছেন ধুনে। লয় সমান। জীবজগতের অভিব্যক্তি ও ক্রমবিকাশ কোন কালেই সমাজে প্রযোজ্য নয়, এমন কি ইংলণ্ডেও নয়, বিশেষত এখন। অনুকরণে শক্তির অপচয় হয়, সঞ্চয় হয় না। ভারতবর্ষের দায়িত্ব অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী, আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে। অপচয় শুধু পাপ নয়, বোকামী।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে ইতিহাসের নতুন ধারণা সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মনোভাব এই যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আবর্ত্তন কিংবা ব্রহ্মার মুহূর্ত্ত-পরিকল্পনার সাহায্যে এ যুগের ব্যাখ্যা ও কর্ত্তব্য নিরূপিত হতে পারে। মনোভাবটিকে অসম্ভবনীয়তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য সভ্য জগতের, বিশেষতঃ জার্ম্মাণ দার্শনিকদের মতামত উদ্ধৃত করা হয়। হিন্দু পৌরাণিক ও নীটশে, স্পেংগলারের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হল ইতিহাসের এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা। শুধু সত্যের খাতিরে এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে হিন্দু পৌরাণিকের উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক, এবং আজকালকার পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য আধিভৌতিক, জোর আধিদৈবিক। কিন্তু ফলে একই দাঁড়ায়। সেইজন্য এই দুটি ধারণাকে একত্র সমালোচনা করা চলে। এই সব বৃহৎ পরিধির আবর্ত্তনের তুলনায় আমাদের পরিচিত সভ্যযুগের আবর্ত্তন এতই ছোট যে তার মধ্যে মানুষের সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে ওঠে। অতিবৃহতের মধ্যে ছোট-খাট কর্ত্তব্যগুলি দিশা হারায়। যে অর্থের সন্ধানে ইতিহাসের ধর্ম্ম ব্যাখ্যার প্রয়োজন জন্মায়, সেই সন্ধানের প্রারম্ভেই ব্যর্থতা

স্মরণ করা কিংবা আত্মবিশ্বাস হারানো উচিত নয়। মানুষ বাদ দিয়ে ইতিহাসের অর্থ থাকেনা, অন্ততঃ মানুষের কাছে। আদৎ কথাই এই যে অতি পুরাতনকালে, যখন মানুষ নিজের মতে বাইরের সম্বন্ধকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারেনি, তখন কালের পরম্পরা ও প্রসার সম্বন্ধে কোন রীতি আবিষ্কার করা মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অল্পদিন হল আমরা অতীত-সম্বন্ধে সজ্ঞান হয়ে উঠেছি, তারই কৃপায় আমরা কালপ্রবাহের গতি ও রীতি এবং সেই গতি ও রীতির সাহায্যে বর্ত্তমানের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যতের প্রগতি বুঝতে শিখছি। এখনও আমাদের ধারণা নিশ্চিত ও দৃঢ় হয়ে ওঠেনি, সেটি ধ্যানে পরিণত হয়নি। বৈজ্ঞানিকের বিবেচনার বহির্ভূত হয়ে এই অস্পষ্ট ধারণা লজ্জায় আত্মগোপন করছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের যে রীতি ব্রহ্মার যোগনিদ্রা থেকে উদ্ভূত হয়ে সেই নিদ্রায় লীন হবেই হবে, যে গতির গুপ্ত অভিসন্ধি জানবার অধিকার কোন বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিংবা শ্রেণীর জন্মগত সংস্কারমাত্র, সে পরিবর্ত্তন শুধু স্বপ্নবিলাস, সত্যকারের পরিবর্ত্তনই নয়। তার সাহায্যে বর্ত্তমান জগতের জাগ্রত ও নিষ্ঠুর বাস্তবতার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়—তা সে ধারণাতে ইচ্ছাপূরণের যত সুযোগই থাক না কেন। তার সাহায্যে বৈচিত্র্যের মর্ম্মকথা প্রকাশ পায় না, কারণ 'এব চ' মন্ত্র উচ্চারণে শুধু একীকরণই সাধিত হতে পারে। আগে যা ছিল, পরেও তাই হবে, রূপ ও আত্মার কোন পরিবর্ত্তন হবে না—এ কথা নীট্‌শের কল্পিত জরাথুষ্ট্রার মুখেই শোভা পায়। নিয়তির চাপে সমীকরণ এবং কলকারখানা ও যন্ত্রের চাপে সমীকরণের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নেই। ব্রহ্মা কিংবা ব্রহ্মের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করলে ঐতিহাসিক ও ব্রাহ্মণ একই ব্যক্তি হয়ে ওঠেন। তা হলে সমূহ বিপদ, অব্রাহ্মণের পক্ষে, যাঁদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পুরাণের মতে কলিযুগে ব্রাহ্মণ নেই যখন, তখন ঐতিহাসিকের কাজও কমে গেল। এই প্রকার অতিপ্রাকৃতের হস্তে ইতিহাসের রীতি-উদ্‌ঘাটনের ভার ন্যস্ত করলে প্রুশিয়ান রাজ্যই হয়ে ওঠে ব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ, ব্রাহ্মণ ও প্রোফেসার হয়ে ওঠেন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানী, এবং দর্শন হয়ে ওঠে সোহহংবাদ।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যের এ অর্থ নয় যে আমাদের কোন ইতিহাস ছিল না। বক্তব্য এই, আমাদের যে ইতিহাস ছিল মাত্র এখনই আমরা বুঝতে পারি। এই অর্থেই সব ইতিহাস সমসাময়িক ইতিহাস। বক্তব্য এই যে অতিপ্রাকৃতের সাহায্যে ইতিহাসের অর্থ পাওয়া যাবে না। অর্থের পদ-গুলি প্রকৃতির মধ্যেই আছে, যদিও সে প্রকৃতির ক্রিয়ায় ও ব্যবহারে এমন 'অসম্ভব' ঘটনা ঘটে যার হদীস্ পাওয়া যায় না বলে তাদেরকে 'অ-প্রাকৃত' নাম দেওয়া হয়। মাত্র এইভাবে দেখলেই ইতিহাস স্বকপোল-

কল্পনার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারে। বাহ্যপ্রকৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের আচার-ব্যবহার কি ভাবে গড়ে উঠেছে, আমরা কতটুকু স্বাধীন, কতটুকু নিয়তির অধীন, কতটুকু নির্ব্বাচন করেছি, কতটুকু নির্ব্বাচিত হয়েছি জানবার পরই ইতিহাস বাহ্য হয়ে উঠতে পারে। নচেৎ, ইতিহাস কল্পনাবিলাসীর সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে ওঠে। বাস্তবিকপক্ষে ইতিহাসের নিকটতম সম্বন্ধ ভূগোল। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের অন্য কোন অর্থ নেই— ঘটনা কিছু বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক হতে পারে না। ঘটনার ব্যাখ্যাই বৈজ্ঞানিক হতে পারে, সে জন্য ব্যাখার বিষয়কে, অর্থাৎ ঘটনার সম্বন্ধ ও পারম্পর্য্যকে যতটা বাহ্য করা যায় ততই ভাল।

মানুষ সমাজ-বদ্ধ হয়েছে বাঁচবার জন্য। বাঁচবার প্রধান উপায়ের নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে আজকাল নিষ্কাম-ধর্ম্মের কোঠায় তোলবার চেষ্টা চলছে, কিন্তু তার আদি ছিল সকাম, ভুললে চলবে না। কি করে বহিঃপ্রকৃতির কাছ থেকে আত্মরক্ষার জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা যায়—এইটাই ছিল মানুষের একটি প্রধান সমস্যা। যতদিন থেকে খাদ্য-সমস্যা ততদিন থেকে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের মূলে ইকনমিক ফ্যাকটরটি সর্ব্বদাই ছিল, এবং সে ফ্যাকটরটি, অঙ্কের ভাষায়, প্রাইমারী; অর্থাৎ একে আর অন্য কোন ফ্যাকটর-দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে না। ধরা যাক, আদিম যুগের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোন একটি উপায় উদ্ভাবন করলে; সেই থেকে একটি জাতির খাদ্য-সংগ্রহের ভার, কিংবা অন্য কোন শত্রুর কবল থেকে বাঁচবার ভার তার লাঘব হল, খানিকটা শক্তি সঞ্চিত হল, যার জোরে সেই জাতি অন্যদিকে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল। আদিম যুগের আবিষ্কারের পিছনে ও পরে এই বাঁচবার তাগিদ ছিল, নচেৎ আবিষ্কারের প্রচার হতো না, একটি আবিষ্কারের সঙ্গে অন্য আবিষ্কারের প্রতিযোগিতায় কোনটাই টিঁকতে পারত না। যখন একটি কোন আবিষ্কারের সাহায্যে, পূর্ব্বের অপেক্ষা ও অন্যের অপেক্ষা ভাল ভাবে বাঁচবার উপায় প্রচারিত হলো, তখন সেই আবিষ্কারের সাহায্যে ও তাকে কেন্দ্র করে সেই সমাজ নতুন ভাবে গড়ে উঠতে লাগল। কেননা সমাজ ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এক, বাঁচা এবং আরো ভাল করে বাঁচা। যে সমাজে আবিষ্কারক জন্মাল না কিংবা যে সমাজ অনুকরণ করতে পারল না সে পিছিয়ে পড়ল, এই জীবনসংগ্রামে। এই চল্‌ল কিছুকাল —অর্থাৎ নতুন নতুন আবিষ্কার, সেই সঙ্গে নতুন উপায়ে সমাজ গঠন।

কিন্তু আবিষ্কারের গতি সমাজের পুনর্গঠনের গতির চেয়ে দ্রুততর হতে বাধ্য। আবিষ্কার করে জনকয়েক লোক, কিন্তু সমাজ সব লোককে নিয়ে। জনকয়েক লোক তাদের সমগ্র অবসর নিয়োজিত করতে পারে সৃষ্টির কাজে। এই দুই গতির ভিন্ন হারের

ফলে সমাজের অগ্রস্থতি সম্ভব হয়। যখন শিকার ছিল একমাত্র খাদ্যসংগ্রহের উপায়, তখন শিকারীসমাজের আচার-ব্যবহার, মানুষের সঙ্গে মানুষের, এবং পুরুষ ও স্ত্রীর সম্বন্ধ, সম্পত্তি-জ্ঞান ও ধর্ম্ম গঠিত হয়েছিল শিকার-বৃত্তির চারপাশে। পশুচারণ যুগে (কিংবা টাইপে) দেখা গেল যে পশুর সাহায্যে শক্তির কম খরচে খাদ্য সংগ্রহ করা চলে। পশুকে বশে আনবার জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন চাষ করা সম্ভব হল। নচেৎ মাটি আঁচড়ানো, ঝুম-চাষ, বাগান-চাষই ছিল। লোক সংখ্যা বেড়েই চলেছে, গ্রাম তৈরী হচ্ছে, মানুষ বসবাস করছে ঘর বাড়ীতে। তাদের জন্য একটা সুনিশ্চিত খাদ্যসরবরাহের প্রয়োজন। সেই থেকে পুরুষ কর্ত্তা হয়ে উঠল, সম্পত্তি বর্ত্তমান আকার ধারণ করলে, স্বর্গের আকার বদলে গেল, ভগবান পুরুষ সেজে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। প্রত্যেক যুগে পুরাতন অবস্থার চিহ্ন বর্ত্তমান থাকত, কোন টাইপই শুদ্ধ ছিল না। যে জাতি পূর্ণভাবে কল-কারখানাকে গ্রহণ করেছে, সে জাতিরও মধ্যে চাষবাস পরিত্যক্ত হয়নি, অন্যে পরে কা কথা! কৃষিপ্রধান জাতির মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ভূসম্পত্তির মালিকমাত্র হয়ে ধনশালী হয়ে উঠলেন। ছোট চাষীরা আর খেতে পায় না, অথচ বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। অন্য একটি শ্রেণী ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা বাড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে পুরাতন কলের সার্থকতা কমে এসেছে। বিজ্ঞানের সাহায্যে, অর্থাৎ সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে নতুন কল তৈরী হল। নতুন কারখানার টাকা আসতে লাগল পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। পূর্ব্বতন সমাজের অতিরিক্ত লোক-সংখ্যা আর অতিরিক্ত রইল না, অনেকে কলকারখানায় চাকরী নিলে, কেউ বা বিদেশে চলে গেল। আজ দেড়শ বৎসর মাত্র গোটাকয়েক দেশে এই ব্যাপার ঘটছে, এবং অন্য দেশ এখন সেই সব দেশের অনুকরণ করছে। কারণ এ ছাড়া অন্য উপায়ে প্রচুর লোকের যথেষ্ট অন্নসংস্থান হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানের আশীর্ব্বাদের প্রথম ফল উপভোগ করলেন ধনী-সম্প্রদায়। তাঁরা এখনও সেই ফলভোগ করছেন—মাত্র এইটুকু বল্‌লে ইতিহাসের রীতি বোঝা যাবে না। একটু তলিয়ে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের ফলে প্রথম উন্নতি হল যন্ত্রবিস্তার, তার দরুণ কল-কারখানার প্রসার হল। এক একটি কল যেমন অনেক লোককে খাওয়াতে পারে, তেমনি অনেক লোকের বদলেও সে কাজ করতে পারে। অতএব লোকদের তাড়িয়ে দিতে হয়, কিন্তু বেশী দূরে নয়। প্রথম প্রথম অনেকে অন্য দেশে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল যে মজুরদের কলকারখানার কাছে কাছে রাখলেই মালিকদের সুবিধা হয়। সুবিধা দুই প্রকারের—এক, যদি চাহিদা বাড়ে তখন সরবরাহ করবার জন্য বেশী লোকের প্রয়োজন

হবে ; আর এক প্রকার—শ্রমিকের একদল যদি মজুরী বেশী চেয়ে বসে তা হলে অন্য শ্রমিকদলের চাকরী পাবার আশঙ্কায় তারা জব্দ থাকবে। বাস্তবিক পক্ষে চাহিদা তখন বেড়েই চলেছে, নতুন আকার নিয়েছে। কল তৈরীর জন্য নতুন কারখানার প্রয়োজন হল। ইংলণ্ড এই কল তৈরীর ভার নিলে। জনকয়েক লোক আবার কাজ পেলে। তাদের মজুরী বাড়ল। সেই সঙ্গে তাদের সংখ্যা বেড়েই চল্‌ল। তারা যত বাড়ে তত পরিমাণে তাদের মজুরী জোটে না। কিন্তু বিজ্ঞান,—অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকে জয় ক'রে সামাজিক উৎপাদনের উপায়—ব'সে থাকবার ছেলে নয়। সে শুধু দিতেই জানে। কখন দিতে হয়, কি দিতে হয়, কাকে দিতে হয়, কিভাবে দিতে হয় সে জানেই না—বোকা ছেলের মতন। প্রথমে সে তা জানত। কিন্তু এখন বিজ্ঞান একটা শ্রেণীর বৃত্তি হয়ে উঠেছে, যে শ্রেণীর স্রষ্টা এই ধনীসম্প্রদায়, যে বৃত্তি পরবিত্তভোগী, যার উদ্দেশ্য অন্য শ্রেণীর উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় আবিষ্কার করা। এই সময় ধনী-সম্প্রদায় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য অনেক টাকা দিলেন, নতুনধরণের বিশ্ববিদ্যালয়, বড় বড় ল্যাবরেটারী তৈরী করলেন, নিজেদের কারখানায় বৈজ্ঞানিকদের মাইনে দিয়ে রাখলেন, তাঁদের জন্য পরীক্ষাগার তৈরী করলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের কেনা গেলেও বিজ্ঞানকে কেনা যায় না। এইখানেই আবার বিপদ ঘটল। কল যেমন থামে না, বিজ্ঞানও তেমনি থামে না। তাই কলের মালিক নতুন সুর গাইতে বাধ্য হলেন। আজ তাঁরা বলছেন, 'কিছুদিন বিজ্ঞানের উন্নতি রোধ করলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়।' আজ তাঁরা পেটেণ্ট কিনে লোহার সিন্ধুকে তুলে রাখছেন। অনিয়ন্ত্রিতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুনাফাতে টান পড়ে, তাকে ভাগবাটোয়ারা করতে হয়। সেইজন্য হয় বিজ্ঞান বন্ধ করা চাই, নচেৎ বিজ্ঞানেরই সাহায্যে ক্ষতি কমিয়ে লাভ বাড়ানো চাই। শেষ উপায়টির নাম সায়ান্টি-ফিক্ ম্যানেজমেণ্ট, র‍্যাশন্যালিজেশন। কিন্তু, উদ্দেশ্য একই, উচ্চ-হারের মুনাফা রক্ষা করা। উপায় একই, শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীতে থাকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা। ধনীসম্প্রদায়ের দাস বৈজ্ঞানিকের তথা বিজ্ঞানের দৌলতেই আজ সমাজের এই শ্রী।

কল-কারখানার মালিক ধনীসম্প্রদায় সহজে নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছাড়বার পাত্র নন। বিজ্ঞানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তাঁরা অন্য উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কুফল বুঝতে পেরে তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করতে প্রয়াসী হলেন। সেইজন্য গতকয়েক বৎসর ধরে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ট্রষ্ট, কার্টেলের প্রসার হচ্ছে। গোটাকয়েক সমবায় বিশেষ কোন দেশ ও সাম্রাজ্য অতিক্রম

করলেও বেশী সংখ্যক সমবায় দেশের মধ্যেই বিস্তৃত। কিন্তু দেশের বাজার বড়ই মন্দা। সেইজন্য ছোট গণ্ডী তৈরী করার প্রয়োজন হল। ভিন্ন দেশের একচেটিয়া ব্যবসার সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাধাবিপত্তিও অনেক। সেইজন্য এই বৃহৎ সমবায়গুলি উপনিবেশে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে মনোনিবেশ করলে। ভের্সাই সন্ধিতে পৃথিবীর বাকী অংশটুকু ধনীজাতির, ধনীশ্রেণীর মধ্যে বণ্টন হয়ে গেল। উপনিবেশের ব্যবসায় মুনাফা বেশী, বাজার ভাল, সস্তায় কাঁচামাল ও মজুর পাওয়া যায়, এবং ব্যবসায় রাজশক্তির সাহায্য পাওয়া যায়। উপনিবেশে ধনতন্ত্র না প্রবেশ করলে ধনতন্ত্র মারা যাবে, স্থানাভাবে। ধনতন্ত্রের সব চেয়ে উন্নত অবস্থা হল একচেটিয়া ব্যবসা, এবং তারই বাজার হল উপনিবেশ। এই অধিরাজক-শাসনের বেড়াজালে ভারতবর্ষ জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বৎসরে আরো বেশী করে, কারণ অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ-জিলাণ্ড এখন প্রায় স্বাধীন রাজ্যের সামিল, অর্থাৎ সে দেশেও ধনীসম্প্রদায় উঠেছেন, তাঁরাও মুনাফা বাড়াতে চাইছেন। জগতের ইতিহাসের যে ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে তারই সহযোগে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝতে হবে।

শুধু এইটুকু বল্‌লে যথেষ্ট হবেনা। বাহ্যত, এখন ধনতন্ত্রের বোল-বোলাও অবস্থা। কিন্তু ভেতরে ঘুণ ধরেছে। বাহ্যত, অন্তত ওয়েলস্ এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কাছে, জগৎ এক হয়ে আসছে। পৃথিবীর নানা স্থানে ছোট-বড় দল তৈরী হচ্ছে, পৃথিবীতে একটি মহারাজ্য-স্থাপনের পক্ষে এ চিহ্নগুলি শুভ মনে হওয়া স্বাভাবিক। একধারে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য, অন্য ধারে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ; বলকান দেশেও তিন-চারটি ছোট রাজ্য বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, ফরাসী-পোল-চেক মিলে একটা দল হয়েছে। তা ছাড়া আফ্রিকা ও এসিয়ার প্রায় সবটাই য়ুরোপের কোন না কোন রাজ্যের অধীনে। তবুও কোথায় যেন শনির দৃষ্টিপাত হয়েছে। পৃথিবীর একাংশে, মাত্র দু বৎসর আগে, ১৯৩১ সালে, লক্ষ লক্ষ মণ গম পুড়িয়ে ফেলা হল, কফি গুঁড়িয়ে ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হল, সৈনিক রেখে খনি থেকে পেট্রল এবং রবার গাছ থেকে রবার নেওয়া বন্ধ করা হল, তুলোর ক্ষেত গাছ ও ফুলশুদ্ধ চষে ফেলা হল, চিনি যারা তৈরী করে তারা পঞ্চবার্ষিক প্ল্যান ক'রে উৎপাদন কমিয়ে দিলে ; তামা, টিন, দস্তা, আলুমিনিয়ুম বেশী প্রস্তুত হচ্ছিল বলে খনিতে মজুরের সংখ্যা ও খাটবার সময় কমানো হল, চিলির সোরার ব্যবসা উৎসন্ন গেল, কলে তৈরী সোরার জন্য। কিন্তু পৃথিবীর অন্যধারে লোকে খেতে পাচ্ছে না, মজুরী কমে গেছে, লোকের সংসার খরচ জোটে না, দু কোটির ওপর শ্রমিকের হাতে কাজ নেই, প্রত্যেক

এই গেল আমার "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ৎ। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য্য হয়ে বসব না এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েচি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্য্যন্ত। সময় যে বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্য্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারী বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দ্দিনের পূর্ব্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েচি।

বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছিলে। বড়ো চিঠিই যে ভালো চিঠি এমন মোহ মনে স্থান দিয়ো না। ইতি দেওয়ালি, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

(১)

বিশ্বাসের জগতে স্বপ্ন যে মানুষের জীবনকে অনেকখানি সরস করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। সংসারের বহুবিধ ক্লেশে পীড়িত হয়ে মানুষ নানা সুখের কল্পনা ও কামনা করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে কামনা তার সহসা পূর্ণ হয় না, কল্পনাও ফলবতী হয় না। কিন্তু কখনো কখনো স্বপ্নে সেই কামনা মূর্ত্ত হয়ে তার চিত্তকে আনন্দ প্রদান করে, তাই তখন নির্ধন ধন সঞ্চয় করে, দরিদ্র দারিদ্র্যমুক্ত হয়, বিরহীর প্রিয় সন্দর্শন ঘটে, কেউ বা শত্রুকে নিপাত করবার আনন্দলাভ করে আর কখনো বা আরাধ্য দেবতা রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি বিতরণ করেন। অন্ধ-বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ সেই স্বপ্ন বিচার করে ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখের ছবিই না অঙ্কিত করে!

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ স্বপ্ন বিচার করতে সুরু করেছে। তাই প্রাচীন আসিরীয়ায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র আমরা পাই তা এই স্বপ্ন বিচারেই ভরা, হিব্রু সাহিত্যের Apocalypse ও ভারতীয় বেদও শাস্ত্রীয় মতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার বস্তু নয়, স্বপ্নের মতই তা ঋষিদের চিত্তাকাশে প্রতিভাত হয়েছিল। আর সেই সব শাস্ত্র অবলম্বন করেই প্রাচ্যদেশসমূহে কত বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুক্তির নির্ম্মম হিসাবে স্বপ্নের জগৎ যে মায়ার খেলা ব্যতীত আর কিছু নয় তা নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নেরই যে বাস্তব জীবনের ব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়—আর তাদের ভেতর যে কোন গূঢ় রহস্য নেই তা মনস্তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে স্বপ্নে আমাদের তিনটী শক্তি প্রবল থাকে—দেখবার, শুনবার ও কথা বল্‌বার। আর এ সব শক্তির ক্রিয়া চলে বেশীর ভাগ হয় মনের কোন লুপ্ত বাসনা না হয় জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট কোন বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করে। সুপ্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থানও কখনো কখনো স্বপ্নের সৃষ্টি করে থাকে। কখনো কখনো বা চোখের পাতার সঙ্গে তারকার সংস্পর্শে যে সব বর্ণের (ocular spectra) সৃষ্টি হয় সেই গুলিকে অবলম্বন করেও স্বপ্নের লীলা চলে। এই সব হিসাবে দেখা যায় আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে অলীক—কোন না কোন যোগসূত্র অবলম্বন করে মায়ার রচনা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা সব স্বপ্নেরই যে অর্থ নির্দ্দেশ

জাতি রপ্তানী করবার জন্য প্রস্তুত, আমদানী করতে অনিচ্ছুক। চারধারে শুল্কের বেড়া, বড় বড় কল-কারখানা বন্ধ, টাকার বাজার, শেয়ারের বাজার যায় যায়, সমগ্র য়ুরোপ আমেরিকার কাছে ঋণী, অথচ আমেরিকা সে ঋণ শোধ নেবে না জিনিষ নিয়ে, রীতিমত ও যথাযোগ্য টাকা ধার দিতে সাহায্যও করবে না, জার্ম্মানীর হাতে টাকা নেই, ফ্রান্সের হাতে বিস্তর সোনা এই সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেছে, অথচ সোনার কমতি নেই, পৃথিবী জুড়ে। এই প্রাচুর্য্যের মধ্যে দৈন্যকে শনির দৃষ্টি ছাড়া কি বলা চলে? যে শিশু বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রের দ্বারা লালিত-পালিত সেই শিশুই বড় হয়ে বিজ্ঞান ও ধনতন্ত্রকে মেরে ফেলতে চায়। ইতিহাসের নিয়মই এই।

এই প্রবন্ধে ইতিহাসের স্থূলধারা ও তার একটি মাত্র রীতির ইঙ্গিত করা হল। ধারাটি ধন-সমাগমের ও বিজ্ঞানের ইতিহাস-দ্বারা পুষ্ট। রীতি হল এই যে কোন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যেই তার ধ্বংসের কারণ লুকানো থাকে। ধ্বংসের কারণ ভগবানের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়। তার কারণ ধনতন্ত্র-মূলক সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর তদবস্থস্থিতিপ্রবণতা, এবং বিজ্ঞানের কৃপায় নব-নব উপায়ে উৎপাদনের প্রাচুর্য্য। এই সামাজিক জীবনের স্থিতি, প্রগতি ও অবনতির ব্যাখ্যা হওয়া উচিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে—অর্থাৎ মানুষ তার সমবেত চাহিদা ও চেষ্টার ফলে যে উপায়ে বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করেছে কিংবা চেষ্টা করছে জয় করতে তারই ইতিহাসের সাহায্যে। ভারতবর্ষের ইতিহাস জগতের ইতিহাসের অঙ্গ, বৈশিষ্ট্য তার পারিপার্শ্বিকের।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ *

খড়দহ

কল্যাণীয়েষু

গানের আলাপের সঙ্গে "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের গদ্যিকারীতির যে তুলনা করেচ সেটা মন্দ হয়নি। কেননা, আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধনছাড়া হয়েও আত্মবিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকেনা মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন।

কিন্তু সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সঙ্গীতের সমস্তটাই অনির্ব্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্ব্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্য্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্ব্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েচে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েচে, "যদেতৎ হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।" বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েচে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য। বিবাহিত জীবনে যেমন কাব্যেও তেমনি, মাঝে মাঝে বিরোধ বাধে, উভয়ের মাঝখানে ফাঁক পড়ে যায়, ছন্দও তখন জোড় মেলাতে পারে না। সেটাকেই বলি আক্ষেপের বিষয়। বাসরঘরে এক শয্যায় দুই পক্ষ দুই দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মতোই সেটা শোচনীয়। তার চেয়ে আরো শোচনীয়, যখন "এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান।" যথাপরিমিত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে একথা অজীর্ণরোগীকেও স্বীকার করতে হয়। কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হয়ে পড়েন। সেটাকে আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ বলে উল্লাস না করে আধিভৌতিকতার অভাব বলে বিমর্ষ হওয়াই উচিত।

"পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থে আধিভৌতিককে সমাদর করে ভোজে বসানো হয়েচে। যেন জামাইষষ্ঠী। এ মানুষটা পুরুষ। এঁকে সোনার ঘড়ির চেন পরালেও অলঙ্কৃত করা হয় না। তা হোক্, পাশেই আছেন কাঁকন পরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মাধুরী, তিনি তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ ব্যজনিকার আন্দোলনে এই ভোজের মধ্যে অমরাবতীর মৃদুমন্দ হাওয়ার আভাস এনে দিচ্চেন। নিজের রচনা নিয়ে অহঙ্কার করচি মনে করে আমাকে হঠাৎ সদুপদেশ দিতে বোসো না। আমি যে কীর্ত্তিটা করেচি তার মূল্য নিয়ে কথা হচ্চে না,

* পত্রখানি শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

তার যেটি আদর্শ, এই চিঠিতে তারি আলোচনা চল্‌চে। বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংসপেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারচে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বলব স্পর্দ্ধা। তবে কী বললে ঠিক হবে ব্যাখ্যা করি। ব্যাখ্যা করব কাব্যরস দিয়েই।

বিবাহ-সভায় চন্দনচর্চ্চিত বর কনে টোপর মাথায় আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসেচে। পুরুৎ পড়ে চলেচে মন্ত্র, ওদিকে আকাশ থেকে আসচে সাহানা রাগিণীতে সানাইয়ের সঙ্গীত। এমন অবস্থায় উভয়ের যে বিবাহ চলেচে সেটা নিঃসন্দিগ্ধ সুস্পষ্ট। নিশ্চিত ছন্দওয়ালা কাব্যে সেই সানাই বাজনা সেই মন্ত্র পড়া লেগেই আছে। তার সঙ্গে আছে লাল চেলি, বেনারসীর জোড়, ফুলের মালা, ঝাড়লণ্ঠনের রোশনাই। সাধারণত যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্চে বচন অনির্ব্বচনের সদ্য মিলনের পরিভূষিত উৎসব। অনুষ্ঠানে যা যা দরকার সযত্নে তা সংগ্রহ করা হয়েচে। কিন্তু তার পরে? অনুষ্ঠান তো বারোমাস চলবে না। তাই বলেই তো নীরবিত সাহানা সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গেই বর বধূর মহাশূন্যে অন্তর্দ্ধান কেউ প্রত্যাশা করে না। বিবাহ অনুষ্ঠানটা সমাপ্ত হোলো কিন্তু বিবাহটা তো রইল, যদি না কোনো মানসিক বা সামাজিক উপনিপাত ঘটে। এখন থেকে সাহানা রাগিণীটা অশ্রুত বাজবে। এমন কি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে বেসুরো নিখাদে অত্যন্ত শ্রুত কড়া সুরও না মেশা অস্বাভাবিক, সুতরাং একেবারে না-মেশা প্রার্থনীয় নয়। চেলি বেনারসীটা তোলা রইল, আবার কোনো অনুষ্ঠানের দিনে কাজে লাগবে। সপ্তপদীর বা চতুর্দ্দশপদীর পদক্ষেপটা প্রতিদিন মানায় না। তাই বলেই প্রাত্যহিক পদক্ষেপটা অস্থানে পড়ে বিপদজনক হবেই এমন আশঙ্কা করিনে। এমন কি বাম-দিক থেকে রুনুঝুনু মলের আওয়াজ গোলমালের মধ্যেও কানে আসে। তবু মোটের উপর বেশভূষাটা হোলো আটপৌরে। অনুষ্ঠানের বাঁধা রীতি থেকে ছাড়া পেয়ে একটা সুবিধে হোলো এই যে উভয়ের মিলনের মধ্যে দিয়ে সংসারযাত্রার বৈচিত্র্য সহজরূপ নিয়ে স্থূল সূক্ষ্ম নানাভাবে দেখা দিতে লাগল। যুগলমিলন নেই অথচ সংসারযাত্রা আছে এমনো ঘটে। কিন্তু সেটা লক্ষ্মীছাড়া। যেন খবুরে-কাগজি সাহিত্য। কিন্তু যে সংসারটা প্রতিদিনের, অথচ সেই প্রতিদিনকেই লক্ষ্মীশ্রী চিরদিনের করে তুলচে, যাকে চিরন্তনের পরিচয় দেবার জন্যে বিশেষ বৈঠকখানায় অলঙ্কৃত আয়োজন করতে হয় না তাকে কাব্যশ্রেণীতেই গণ্য করি। অথচ

চেহারায় সে গদ্যের মতো হতেও পারে। তার মধ্যে বেসুর আছে, প্রতিবাদ আছে, নানাপ্রকার বিমিশ্রতা আছে, সেই জন্যেই চারিত্রশক্তি আছে। যেমন কর্ণের চারিত্রশক্তি যুধিষ্ঠিরের চেয়ে অনেক বড়ো। অথচ একরকম শিশুমতি আছে যারা ধর্ম্মরাজের কাহিনী শুনে অশ্রুবিগলিত হয়। রামচন্দ্র নামটার উল্লেখ করলুম না, সে কেবল লোকভয়ে। কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস আদি কবি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে ভূমিকাপত্তন স্বরূপে খাড়া করেছিলেন তার অসবর্ণতায় লক্ষ্মণের চরিত্রকে উজ্জ্বল করে আঁকবার জন্যেই, এমন কি, হনুমানের চরিত্রকেও বাদ দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই একঘেয়ে ভূমিকাটা অত্যন্ত বেশি রং-ফলানো চওড়া বলেই লোকে ঐটের দিকে তাকিয়ে হায় হায় করে। ভবভূতি তা করেন নি। তিনি রামচন্দ্রের চরিত্রকে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যেই কবিজনোচিত কৌশলে উত্তর-রামচরিত রচনা করেছিলেন। তিনি সীতাকে দাঁড় করিয়েচেন রামভদ্রের প্রতি প্রবল গঞ্জনারূপে।

ঐ দেখ, কী কথা বলতে কী কথা এসে পড়ল। আমার বক্তব্য ছিল এই, কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তা হলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হাল্‌কা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিক তার চরিত্রের দিক অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চল্‌তে পারে। সেটা সযত্নে নেচে চলার চেয়ে সব সময়ে যে নিন্দনীয় তা নয়। নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনীচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনো ঘাসের উপর কখনো কাঁকরের উপর দিয়ে।

রোসো। নাচের কথাটা যখন উঠল ওটাকে সেরে নেওয়া যাক। নাচের জন্য বিশেষ সময়, বিশেষ কায়দা চাই। চারিদিক বেষ্টন করে আলোটা মালাটা দিয়ে তার চালচিত্র খাড়া না করলে মানানসই হয়- না। কিন্তু এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে। কবিরা সেই অনায়াসের চলন দেখেই নানা উপমা খুঁজে বেড়ায়। সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাইবা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে। তখন মৃদঙ্গকে দোষ দেব, না তার চলনকে? সেই চলন নদীর ঘাট থেকে আরম্ভ করে রান্নাঘর, বাসরঘর পর্য্যন্ত। তার জন্যে মালমসলা বাছাই করে বিশেষ ঠাট বানাতে হয় না। গদ্য কাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতি-ভঙ্গী আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁওয়া-বাঁচিয়ে পোষাকী সাড়ির প্রান্ত তুলে ধরা আধা ঘোমটা টানা সাবধান চাল তার নয়।

এই গেল আমার "পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের কৈফিয়ৎ। আরো একটা পুনশ্চ-নাচের আসরে নাট্যাচার্য্য হয়ে বসব না এমন পণ করিনি। কেবলমাত্র কাব্যের অধিকারকে বাড়াব মনে করেই একটা দিকের বেড়ায় গেট বসিয়েচি। এবারকার মতো আমার কাজ ঐ পর্য্যন্ত। সময় তো বেশি নেই। এর পরে আবার কোন্ খেয়াল আসবে বলতে পারিনে। যাঁরা দৈব দুর্য্যোগে মনে করবেন গদ্যে কাব্যরচনা সহজ তাঁরা এই খোলা দরজাটার কাছে ভিড় করবেন সন্দেহ নেই। তা নিয়ে ফৌজদারী বাধলে আমাকে স্বদলের লোক বলে স্বপক্ষে সাক্ষী মেনে বসবেন। সেই দুর্দ্দিনের পূর্ব্বেই নিরুদ্দেশ হওয়া ভালো। এর পরে মদ্রচিত আরো একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে, তার নাম 'বিচিত্রিতা'। সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই মনে করে আশ্বস্ত হবে যে আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েচি।

বড়ো চিঠি লিখতে অনুরোধ করেছিলে। বড়ো চিঠিই যে ভালো চিঠি এমন মোহ মনে স্থান দিয়ো না। ইতি দেওয়ালি, ১৩৩৯

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বপ্ন ও সুষুপ্তি

(১)

বিশ্বাসের জগতে স্বপ্ন যে মানুষের জীবনকে অনেকখানি সরস করেছে তা স্বীকার করতেই হবে। সংসারের বহুবিধ ক্লেশে পীড়িত হয়ে মানুষ নানা সুখের কল্পনা ও কামনা করে, কিন্তু বাস্তব জীবনে সে কামনা তার সহসা পূর্ণ হয় না, কল্পনাও ফলবতী হয় না। কিন্তু কখনো কখনো স্বপ্নে সেই কামনা মূর্ত্ত হয়ে তার চিত্তকে আনন্দ প্রদান করে, তাই তখন নির্ধন ধন সঞ্চয় করে, দরিদ্র দারিদ্র্যমুক্ত হয়, বিরহীর প্রিয় সন্দর্শন ঘটে, কেউ বা শত্রুকে নিপাত করবার আনন্দলাভ করে আর কখনো বা আরাধ্য দেবতা রূপ পরিগ্রহ করে ভক্তের ব্যাকুল হৃদয়ে শান্তি বিতরণ করেন। অন্ধ-বিশ্বাসে বিশ্বাসী মানুষ সেই স্বপ্ন বিচার করে ভবিষ্যৎ জীবনের কত সুখের ছবিই না অঙ্কিত করে!

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ স্বপ্ন বিচার করতে সুরু করেছে। তাই প্রাচীন আসিরীয়ায় যে ধর্ম্মশাস্ত্র আমরা পাই তা এই স্বপ্ন বিচারেই ভরা, হিব্রু সাহিত্যের Apocalypse ও ভারতীয় বেদও শাস্ত্রীয় মতে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝবার বস্তু নয়, স্বপ্নের মতই তা ঋষিদের চিত্তাকাশে প্রতিভাত হয়েছিল। আর সেই সব শাস্ত্র অবলম্বন করেই প্রাচ্যদেশসমূহে কত বড় বড় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যুক্তির নির্ম্মম হিসাবে স্বপ্নের জগৎ যে মায়ার খেলা ব্যতীত আর কিছু নয় তা নির্দ্ধারিত হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নেরই যে বাস্তব জীবনের ব্যবহার থেকেই সৃষ্টি হয়—আর তাদের ভেতর যে কোন গূঢ় রহস্য নেই তা মনস্তাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

বিশ্লেষণ করে তাঁরা দেখিয়েছেন যে স্বপ্নে আমাদের তিনটী শক্তি প্রবল থাকে—দেখবার, শুনবার ও কথা বল্‌বার। আর এ সব শক্তির ক্রিয়া চলে বেশীর ভাগ হয় মনের কোন লুপ্ত বাসনা না হয় জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট কোন বস্তু বা ঘটনাকে অবলম্বন করে। সুপ্তের পারিপার্শ্বিক ঘটনা এবং তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ অবস্থানও কখনো কখনো স্বপ্নের সৃষ্টি করে থাকে। কখনো কখনো বা চোখের পাতার সঙ্গে তারকার সংস্পর্শে যে সব বর্ণের (ocular spectra) সৃষ্টি হয় সেই গুলিকে অবলম্বন করেও স্বপ্নের লীলা চলে। এই সব হিসাবে দেখা যায় আমাদের অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে অলীক—কোন না কোন যোগসূত্র অবলম্বন করে মায়ার রচনা। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা সব স্বপ্নেরই যে অর্থ নির্দ্দেশ

করতে পেরেছেন তা নয়, রহস্যময় স্বপ্নও আছে—যেমন creative dream। কখনো কখনো গণিতজ্ঞ স্বপ্নে নূতন তথ্যের, কবি নূতন ছন্দের বা সুর-সাধক নূতন সুরের সন্ধান পান। সে সব স্বপ্নকে অলীক বলা চলে না। তাই বার্গসোঁর মতে এগুলি স্বপ্ন নয়—জাগ্রত অবস্থায় লুপ্ত-স্মৃতি মাত্র, সেগুলির সন্ধান জাগ্রত অবস্থাতেই মিলেছিল—শুধু অন্যান্য চিন্তার চাপে স্মৃতির অতল গহ্বরে বিলুপ্ত হয়েছিল—স্বপ্নাবস্থায় তাদের পুনরাবির্ভাব হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে সব স্বপ্নে ভবিষ্যৎদর্শন ঘটে সেগুলির সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক নীরব—সেখানে বার্গসোঁ বলেছেন "I stop on the threshold of mystery."

সম্প্রতি ডান সাহেব (J. W. Dunne) নামক এক পণ্ডিত তাঁর An Experiment with Time পুস্তকে সেই রহস্য উদঘাটনে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এডিংটন, রাসেল, ওয়েল্‌স প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা এই পুস্তকের উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসা করেছেন এবং এ পুস্তক যে বর্ত্তমান শতকের পুস্তকাবলীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করবে এ বিশ্বাসও তাঁরা লেখায় ব্যক্ত করেছেন (the most important book of our age)। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ডান সাহেব যে সব সিদ্ধান্ত করেছেন সেগুলি বর্ত্তমান মনস্তত্ত্বের জগতে একটা 'হুলুস্থুল' বাধাবে—কারণ সে সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের।

ডান সাহেব তাঁর পুস্তকে Time বা কালপ্রবাহ সম্বন্ধে বিচার করেছেন। এই বিচারের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নতত্ত্ব। তিনি নিজে নানা সময়ে যে সব স্বপ্ন দেখেছেন সেগুলিকে প্রথমে বিশ্লেষণ করে—যেগুলির সঙ্গে জীবনের অতীত অনুভূতির যোগ রয়েছে সেগুলিকে বর্জ্জন করেছেন আর যে সব স্বপ্নে তিনি নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতের আভাস পেয়েছেন সেইগুলির বিচার করে নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি বিচার করবার পূর্ব্বে তাঁর অদ্ভুত স্বপ্নগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম স্বপ্ন ঘটে ১৮৯৮ সনে। ডান তখন সাসেক্সের এক হোটেলে। তিনি রাত্রিতে স্বপ্নে দেখলেন যে ঘড়িতে ঠিক ক'টা বেজেছে এই নিয়ে তিনি হোটেলের এক চাকরের সঙ্গে তর্কবিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। ডান বল্‌ছেন যে বিকেলে সাড়ে চারটা বেজেছে। কিন্তু চাকর বলছে যে রাত্রির সাড়ে চারটা। তখন ডানের মনে হলো যে হয়ত তাঁর ঘড়ি সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়ে গেছে—তিনি জান্‌তে পারেন নি। তখন তিনি তাড়াতাড়ি ওয়েষ্ট কোটের পকেট থেকে নিজের ঘড়িটা বের করে দেখতে পেলেন যে তিনি যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছে—অর্থাৎ বিকেল

সাড়ে চারটায় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অবস্থায় ডানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নটা আশ্চর্য্য বোধ হওয়াতে তিনি তখনই আলো জ্বেলে দেখতে চাইলেন যে ঘড়ি সত্যই বন্ধ হয়েছে কিনা। ঘড়ি সাধারণতঃ তাঁর বিছানার পাশে থাক্‌তো, কিন্তু সে রাত্রে আর ঘড়ি সেস্থানে দেখতে পেলেন না—তখন বিছানা থেকে উঠে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে ঘড়িটা ড্রয়ারের ভেতর পেলেন। ঘড়ি বের করে দেখ্‌লেন যে সত্যই সাড়ে চারটেতে পৌঁছে ঘড়ির কাঁটা বন্ধ হয়েছে। তাঁর তখন সন্দেহ হলো যে ঘড়িটা বিকেল সাড়ে চারটায় বন্ধ হয়েছিল—তিনি দেখেও ভুলে গিয়েছিলেন, সেই জন্যই স্বপ্নে এ কাণ্ড। তিনি ঘড়িটায় পুনরায় চাবি দিলেন, কিন্তু ঠিক সময় জানতে না পারায় কাঁটা না নেড়ে ঘড়িটা রেখে দিলেন। সকালে উঠে যখন ঘড়িটা মেলাতে যাবেন তখন তিনি দেখ্‌তে পেলেন যে ঘড়ি ঠিকই চল্‌ছে—মাত্র ২।৩ মিনিটের তফাৎ। পূর্ব্বদিনের বিকেলে বন্ধ হলে তিন-চার ঘণ্টার প্রভেদ হত। তখন তাঁর মনে হলো যখন তিনি স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন তখনই ঘড়িটা বন্ধ হয়েছিল—ঘড়িটা খুঁজে বের করতে দু-তিন মিনিট লেগেছিল এই জন্যই ঘড়িটায় দু-তিন মিনিটের প্রভেদ হয়েছে। ঘড়িটার টিক্ টিক্ হঠাৎ বন্ধ হওয়াতেই হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু স্বপ্নে যে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে চারটায় রয়েছে দেখ্‌তে পেলেন তার কোন অর্থ তিনি তখন খুঁজে পাননি, সেটা রহস্যময়।

সাসেক্স থেকে ডান ইটালীতে যান। ইটালীতে সরেন্তার এক হোটেলে তাঁর দ্বিতীয় স্বপ্ন ঘটে। সকালে একদিন তাঁর ঘুম ভাঙ্‌তে বিছানায় শুয়ে ক'টা বেজেছে জান্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। ঘড়িটা ছিল মশারির বাইরে একটা ছোট টেবিলের ওপর। শুয়ে শুয়ে ঘড়িটা দেখবার কোন উপায় ছিল না—উঠতে তাঁর তখন খুব আলস্য। অলস-চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে তাঁর তন্দ্রার অবস্থা এলো। তাঁর দৃষ্টি উপরে নিবদ্ধ, চোখের ওপরে প্রায় এক ফুট উঁচুতে শূন্যে সেই স্থানটা সাধারণ দিনের আলোয় আলোকিত, আর তার চারিধারে সাদাটে আবছায়ায় ঘেরা। এই অবস্থায় তিনি ঘড়ি দেখতে পেলেন। দেখলেন যে ঘণ্টার কাঁটা আটটায়, মিনিটের কাঁটা বারো ও এক-এর মাঝখানে আর সেকেণ্ডের কাঁটা স্পষ্ট দেখা যায় না। আরও সঠিক সময় দেখবার জন্য চেষ্টা করতে তাঁর ভরসা হলো না—ভয় হলো স্বপ্নের ঘোর কেটে যাবে। তিনি মিনিটের কাঁটার অবস্থান থেকে অনুমান করলেন যে সেটা বারো থেকে এক-এর যে ব্যবধান তার ঠিক মাঝখানে রয়েছে—সুতরাং সময় হবে আটটা আড়াই মিনিট। এই সিদ্ধান্ত করেই তিনি উঠে পড়লেন ও মশারির বাইরে থেকে ঘড়িটা টেনে এনে দেখলেন যে তখন ঠিক আটটা বেজে

আড়াই মিনিট। ডান এই অদ্ভুত মিলে আশ্চর্য্যান্বিত হলেন ও মনে করলেন যে তাঁর দেখবার হয়ত একটা নূতন রকমের ক্ষমতা আছে।

ডানের তৃতীয় স্বপ্ন অন্য ধরণের। ১৯০১ সালে বুয়ার যুদ্ধে আহত সৈনিক হিসাবে তিনি ছুটি পেয়ে ইটালীর উপকূলে আলাস্সিওতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করছিলেন। এখানে তিনি এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে তিনি আফ্রিকায় নীলনদের ধারে খার্ত্তুমের নিকটে একটী শহরে অবস্থান করছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন তিনটী শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ থেকে আস্ছে। তারা অত্যন্ত শ্রান্ত, তাদের পোষাক বেরঙা হয়ে গেছে, মুখ রৌদ্রে পুড়ে কালো হয়েছে। তাদের চেহারা দেখে ডানের মনে হলো যে তারা সৈনিক—আর সেই রেজিমেণ্টের সৈনিক যাতে তিনি নিজে দক্ষিণ আফ্রিকাতে ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সুদান পর্য্যন্ত তিনটী লোক কেন পায়ে হেঁটে এসেছে—এই কথা ভেবে ডান বিস্মিত হলেন। তাদের এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তারা উত্তর দিল যে তারা Cape থেকে সত্যই বরাবর হেঁটে আস্ছে। তিনজনের একজন বল্লো যে পথে তার খুব কষ্ট হয়েছিল—Yellow fever-এ প্রায় মারা যেতে বসেছিল। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকালে ডান খবরের কাগজ খুলেই বড় হেড লাইনে দেখ্তে পেলেন—The Cape to Cairo—"Daily Telegraph"—Expedition at Khartoum। সংবাদে দেখ্তে পেলেন যে তিনজন শ্বেতাঙ্গ সত্যই Cape থেকে খার্ত্তুম পর্য্যন্ত অভিযান করেছিল—পথে তিনজনের একজন জ্বরে মারা গেছে। বাকী তুজন গন্তব্যস্থলে পৌছেছে। অবশ্য ডানের স্বপ্ন দেখবার অনেক পূর্ব্বেই খার্ত্তুমে অভিযান পৌছেছিল—কারণ যে সংবাদ-পত্রে ডান খবর পান তা লণ্ডনে ছাপা। অভিযান খার্ত্তুমে পৌছুবার পরদিন লণ্ডনে সংবাদ প্রকাশিত হয় আর সে সংবাদ আরও কয়েকদিন পর আলাস্সিওতে আসে।

পরের স্বপ্নটা ডানের ঘটে ১৯০২ সালে আফ্রিকাতে। তিনি তখন Orange Free State-এ নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। এখানে তিনি একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি একটী উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন—খুব সম্ভব একটী পাহাড়ের ধারে। জমিটা সাদাটে। আর জমির ফাটল দিয়ে জমাট বাষ্প বেরুচ্ছে। তাঁর মনে হলো যে তিনি একটী দ্বীপে রয়েছেন। আর সেই দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উৎপাত শীঘ্রই সুরু হবে বলে সন্দেহ হতে দ্বীপটা উড়ে যাবে বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠ্লেন আর সেই দ্বীপের "চার হাজার" অধিবাসীকে রক্ষা করবার জন্য উদগ্রীব হলেন। তাদের রক্ষা করবার এক উপায় ছিল তাদের জাহাজে তুলে দেওয়া। তিনি স্থানীয় ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষকে নানা ভাবে বিপদের

কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন ও জাহাজ পাঠিয়ে দিতে বল্লেন। নানা স্থানে ছুটোছুটি করে অবশেষে মেয়রকে চিৎকার করে বল্লেন যে চার হাজার লোক ধ্বংস হয়ে যাবে। পরদিন সকালে ডান সংবাদপত্র খুলেই বড় হেডলাইনে দেখতে পেলেন—Volcano Disaster in Martinique—Town Swept away—An Avalanche of Flame—Probable loss of over 40,000 lives।

আর একটি হেডলাইনে দেখলেন—A Mountain Expodes। অগ্ন্যুৎপাতের পাহাড় বিস্ফোরণের জন্য জাহাজ সেই পথে এগুতে পারেনি। পরে কতকগুলি জাহাজ যে সব অধিবাসী বেঁচে ছিল তাদের অন্য দ্বীপে সরিয়েছিল। এই স্বপ্নের সঙ্গে ঘটনার প্রায় সম্পূর্ণ মিল রয়েছে। গরমিল হচ্ছে জন সংখ্যায়। ডানের স্বপ্নে বারবার ৪০০০ হাজার অধিবাসীর কথা উঠেছে কিন্তু সংবাদপত্রে ৪০,০০০ হাজার অধিবাসীর কথা রয়েছে। ডান কিন্তু সংবাদপত্র পড়বার সময় ৪০০০ হাজারই পড়েন—১৫ বৎসর পরে সংবাদপত্রের ঐ অংশ নকল করবার সময় তাঁর এই ভুল ধরা পড়ে। অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে তিনি পরে যে খবর সংগ্রহ করেন তাতে জান্তে পারেন যে ঐ সংখ্যার কোনটীই সত্য নয়।

Cape থেকে কাইরো পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ-অভিযান ও Martinique Disaster সম্পর্কীয় তুটী স্বপ্ন সম্বন্ধে মনে হতে পারে যে এ তুটী হচ্ছে Identifying Paramnesia—যাতে প্রমাণ হয় যে ডান স্বপ্ন দেখেন নি—শুধু সংবাদপত্রে পড়ে তাঁর সেইরূপ অলীক স্বপ্নের কথা মনে হয়েছিল মাত্র।

কিন্তু এই ব্যাপারের তু'বৎসর পরে ডান পুনরায় যে সব স্বপ্ন দেখলেন তাতে আর তিনি মনে করতে পারলেন না যে তাঁর স্বপ্নগুলি অলীক। স্বপ্নে দেখলেন যে তিনি রেলিংএ ভর দিয়ে একখানি তক্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চারদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন, হঠাৎ সেই কুয়াসা ভেদ করে তক্তার উপর দিয়ে একটা বিশাল সর্পাকার বস্তু নীচে নেমে গিয়েছে দেখতে পেলেন। পরমুহূর্ত্তে বুঝতে পারলেন যে এটা হচ্ছে দমকল থেকে ছেড়ে দেওয়া জলধারা—ধূঁয়ার ভেতর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে ধূঁয়ার ভেতর রাশি রাশি লোক লাফিয়ে পড়ছে, কণ্ঠনালি রুদ্ধ হলে যেরূপ শব্দ করে সেইরূপ শব্দ করছে—আর ধূঁয়া গাঢ় ও অধিকতর কালো হয়ে চারিদিক ব্যাপ্ত করছে। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন সকাল বেলা ডান খোঁজ করেও কোন খবর পাননি, কিন্তু সন্ধ্যার সংবাদপত্রে জান্তে পারলেন যে পারিসে একটা বড় কারখানায় আগুন লেগেছিল, কারখানার মেয়েরা আগুনের জন্য সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্তে না পেরে

balcony-তে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে তাদের নামিয়ে নেবার যতক্ষণ সুব্যবস্থা না হয় ততক্ষণ দমকল থেকে জলধারা বর্ষণ করে bolcony-টা আগুন থেকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু ভেতর থেকে হঠাৎ গাঢ় ধূম আসায় তাদের শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০৪ সালে ডান একবার স্বপ্নে দেখেন যে তিনি দুখানি জমির মাঝে একটী সরু গলি দিয়ে চল্‌ছেন—দুধারে লোহার রেলিং—আট-নয় ফুট উঁচু। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন যে বাঁ ধারের জমিতে একটা পাগলা ঘোড়া ছুটোছুটি করছে। রেলিংএর ভেতর দিয়ে বেরোবার কোন পথ নেই দেখে তিনি নিশ্চিন্ত মনে হাঁটতে লাগলেন। একটু পরেই পেছন থেকে ঘোড়াটা ছুটে আস্‌ছে বুঝ্‌তে পারলেন ও প্রাণপণে পলায়ন করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। পরদিন তিনি নিজের ভাইয়ের সঙ্গে নদীতে মাছ ধরতে গেলেন। জল থেকে যখন তিনি মাছি তাড়াতে ব্যস্ত তখন তাঁর ভাই ডেকে বল্‌লো—একটা ঘোড়া ছুটে আস্‌ছে। ডান তখন নদীর ওপারে তাকিয়ে যা দেখলেন তা তাঁর গত রাত্রের স্বপ্নের সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। সরু পথ, দুধারে রেলিং, আর ঘোড়াটা পাশের জমির ভেতর ভীষণ বেগে ছুটোছুটি করছে—প্রভেদ এইটুকু যে রেলিংটা লোহার নয়—কাঠের। তখন তিনি তাঁর ভাইকে বল্‌লেন যে রেলিংএ কোথাও দরজা নেই, ঘোড়াটা বেরুতে পারবে না সুতরাং ভয় নেই। এই বলে তিনি যেই মাছ ধরতে সুরু করেছেন অমনি তাঁর ভাই চেঁচিয়ে উঠলোও তিনি সামনে তাকিয়েই দেখতে পেলেন যে ঘোড়াটা কি করে রেলিং ডিঙ্গিয়ে বেরিয়ে পড়ে সরু পথ বেয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। তাঁরা পাথরের টুকরো ছুঁড়ে মারতে মারতে পেছিয়ে গেলেন—ঘোড়াটা পাশ কাটিয়ে ছুটে চলে গেল।

১৯১৩ সনের শরৎকালে ডান আর একটী স্বপ্ন দেখতে পান। এ স্বপ্নে দেখেন স্কটলণ্ডের Firth of Forth Bridge-এর নিকটবর্ত্তী উঁচু রেলপথের বাঁধ, নীচে সমতল ঘাসের জমি। স্থানটী তিনি পূর্ব্বে চিন্‌তেন। স্বপ্নে এই স্থানটী দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়্‌লো যে উত্তরাভিমুখী একটী ট্রেণ বাঁধের ওপর দিয়ে এসে নীচে পড়েছে—কয়েকখানি গাড়ী নীচে শায়িত, আর বড় বড় পাথরের খণ্ড গড়িয়ে এসে নীচে পড়েছে। এই স্বপ্ন দেখবার পরদিন তিনি তাঁর বোনকে ঘটনাটী বিবৃত করলেন ও হাস্‌তে হাসতে বল্‌লেন যে তিনি বন্ধুবান্ধবদের স্কটলণ্ড যেতে বারণ করবেন। ১৪ই এপ্রিল সত্যই স্কটলণ্ডগামী একটী মেল ট্রেণ Firth of Forth-এর ১৫ মাইল দূরে লাইনচ্যুত হয় ও বাঁধের ওপর দিয়ে এসে নীচে পড়ে।

এ রকমের স্বপ্ন ডান আরও দেখেছেন—তবে অনেক ছাঁটকাট করে যেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ ছিল না সেইগুলিরই বিবরণ তিনি দিয়েছেন। এ স্বপ্নগুলির বিচারে তিনি মনে করেন না যে এগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার ছায়া হিসাবে তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে—বা ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ধরবার কোন বিশেষ ক্ষমতার জন্যই তিনি এই স্বপ্নগুলি দেখেছেন। জাগ্রত অবস্থায় যে সমস্ত সাধারণ ব্যাপার মানুষের ঘটে এগুলি তারই অসংলগ্ন আভাস মাত্র। শুধু নূতনত্ব হচ্ছে এগুলি ঘটনা ঘটবার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন হিসাবে আস্‌ছে—যদি ঘটনার পরবর্ত্তী রাত্রিতে এ স্বপ্নগুলি দেখা হতো তাহলে কোনই নূতনত্ব থাকতো না। ডান যে কোন medium হয়েছিলেন তাও বলা চলে না—তাঁর অদৃষ্টদর্শনের ক্ষমতাও ছিল না। স্বপ্নগুলির ভেতর কোন অসাধারণ ব্যাপারও নেই। কালপ্রবাহের গতিকে যদি একটী নূতন ধারা (dimension) হিসাবে ধরা যায় তাহলে বল্‌তে হবে যে ডানের অনুভূতিতে ঘটনাগুলি কখনো কখনো এই কালপ্রবাহে স্ব স্ব স্থানচ্যুত হয়ে ধরা পড়ছিল। কালপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন বল্‌লে এ সব অনুভূতির অর্থনির্দ্দেশ চলে না, কালপ্রবাহ বস্তুতঃ নানা বিভিন্ন খণ্ডে বিভাজ্য, ডানের ব্যাপারে এই খণ্ডগুলি ওলট-পালট হচ্ছিল—কালের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ ঘট্‌ছিল না।

এর কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে ডান সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে স্বপ্ন হচ্ছে অতীতকালের ও ভবিষ্যৎকালের অনুভূতির আভাস বা image দিয়ে গঠিত। যে কালপ্রবাহের ভেতর দিয়ে জগৎ চলেছে তা শুধু আমাদের নিজেদের মনের তৈরী বাধায় বিচ্ছিন্ন। বস্তুতঃ কালের যে অংশকে আমরা বর্ত্তমান বলি সেটার কোন স্থায়ীত্ব নেই—জাগ্রত অবস্থায় আমরা যে চৈতসিক বাধা mentally imposed barrier তৈরী করি তাতেই বর্ত্তমানের উৎপত্তি—সেই বাধা বিনষ্ট হলে কাল-প্রবাহে অতীত ও ভবিষ্যৎ অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—তখন আমরা অতীতের ছায়াও যেমনি ধরতে পারি ভবিষ্যতের ছায়াও তেমনি ধরতে পারি। এখানে ডান সাহেবের কথার মূল উদ্ধার করলে তাঁর কথা আরও স্পষ্ট বোঝা যাবে।

The dreams were composed of **images of past experience and images of future experience blended together in approximately equal proportions.**

That the universe was, after all, really stretched in time, and that the lop-sided view we had of it—a view with the "future" part unaccountably missing, cut off from the growing "past" part by a travelling "present moment"—was due to a purely mentally

imposed barrier which existed only when we were awake? So that in reality, the associational net-work stretched, not merely this way and that way in space, but also backwards and forwards in Time; and the dreamer's attention, following in natural, unhindered fashion the easiest pathway among the ramifications, would be continually crossing and recrossing that properly non-existent equator which we, waking, ruled quite arbitrarily athwart the whole.

একথা যদি সত্য হয় যে আমাদের চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে সম্বন্ধ অতীতের ছায়াও যতটা ধরা যায় ভবিষ্যতের ছায়াও ততটা ধরা যায়—তাহলে শুধু স্বপ্নেই তা' সম্ভব হয় কেন? চেষ্টা করলে সে সব ছায়া জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ পেতে পারে না কি? ডান সাহেবের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে জাগ্রত অবস্থায় যদি অতীতের ছায়া চিত্ত থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরা পড়তে পারে। এ সিদ্ধান্ত দৃঢ় করবার জন্য ডান সাহেব নানা বই নিয়ে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় তিনি যে উপায় অবলম্বন করেন সেটা একটু নূতন রকমের। যে বই তিনি পূর্ব্বে কখনো পড়েননি অথচ পরমুহূর্ত্তে পড়তে চাইছেন—সেই বইয়ের নামের ওপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ করা ও একাগ্রচিত্ত হওয়া। একাগ্রতা এনে যে সব ছায়া মনে ভেসে আসে তার থেকে অতীতের ছায়াগুলিকে সরিয়ে দিয়ে অপরিচিত ছায়াগুলিকে রাখতে হয়। তারপর বই খুললেই এই সব ছায়ার কিছু খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। এই উপায়ে ডান সাহেব নূতন নূতন বই নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেছেন সেগুলি প্রায়ই সফল হয়েছে ও তাঁর পূর্ব্ব সিদ্ধান্তকে আরও দৃঢ় করেছে।

Relativity অনুসারে ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস চলে—কিন্তু তা অন্যরূপে। 'ক'এর ভবিষ্যৎ 'খ'এর নিকট বর্ত্তমান হিসাবে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু 'ক'এর নিকট যা ভবিষ্যৎ তা ঘটবার দু-তিন দিন পূর্ব্বে যে 'ক'এর নিকটে তা ধরা পড়তে পারে সে কথা Relativity বিশ্বাস করে না। ডান সাহেব নানা ভাবে সেই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে কালপ্রবাহের যে বিশিষ্ট গতি আছে তা না জানার দরুনই আমরা অদূর ভবিষ্যৎ দর্শনে বিশ্বাস করি না। কিন্তু কালপ্রবাহের গতি এমনই ধরণের যে আমরা চেষ্টা করলেই কোন এক বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে যেমন অদূর অতীতের স্মৃতি ধরতে পারি তেমনি অদূর ভবিষ্যতের ছায়াও ধরতে পারি। তার ভেতর কোনই অলৌকিকতা নেই—বিজ্ঞানের হিসাবেই তা সম্ভব।

(২)

ডান সাহেবের কথা সংক্ষেপ করে বল্‌লে এই দাঁড়ায় যে জাগ্রত অবস্থায় আমাদের চিত্ত এত বিক্ষিপ্ত ও বাহ্যজগতের সঙ্গে ব্যবহারে এত জড়িত হয়ে পড়ে যে তখন আমরা ভবিষ্যতের ছায়া কিছুই ধরতে পারি না। স্বপ্নে যখন বাহ্যজগতের সঙ্গে চিত্তের ব্যবহার থাকে না, তখন ভবিষ্যতের ছায়া কখনো কখনো সেখানে ভেসে আসে। জাগ্রত অবস্থাতেও চিত্তের একাগ্রতা আনতে পারলে ভবিষ্যতের ছায়া ধরতে পারা যায়। কালপ্রবাহের গতিতে সত্যই অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলে কোন ব্যাপার নেই—জাগ্রত অবস্থায় বা চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থাতেই বর্ত্তমানের ধারণা জন্মে, আর সেটা না থাকলে শুধু থাকে কালপ্রবাহের গতির একটা মাত্র ধারা। ডান সাহেবের এই মতগুলিকে যখন বিজ্ঞানের জগৎ মেনে নিয়েছে তখন আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যেসব অনুরূপ মত আছে সেগুলিও প্রণিধানযোগ্য।

আমাদের দর্শনশাস্ত্রে নিদ্রার দুটী অবস্থাভেদ আছে—একটী স্বপ্ন, অন্যটী সুষুপ্তি। স্বপ্নের শব্দগত অর্থ হচ্ছে নিদ্রা, যোগরূঢ় অর্থ নিদ্রিতের 'বিজ্ঞান' বা 'দর্শন' (প্রসুপ্তস্য বিজ্ঞানম্)। এ অবস্থায় নিদ্রিতের নিদ্রা গাঢ় নয়, মন সক্রিয় থাকে ও মনের নানারূপ সৃষ্টি ও কল্পনা চলে। আর সুষুপ্তি হচ্ছে গাঢ় নিদ্রার অবস্থা, তখন মনের কোন কামনাই থাকে না—কোন স্বপ্নদর্শনও হয় না। তাই মাণ্ডুক্য-উপনিষদে সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে—"যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।" স্বপ্নে সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধি বর্ত্তমান থাকে—বাসনা সূক্ষ্মাকারে প্রবল থাকে, তাই জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যে সব কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে স্বপ্নেও সেই সমস্ত ব্যাপারই তার সম্ভব হয়। কিন্তু সুষুপ্তিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসমূহের ক্ষণিক লয় প্রাপ্তি হয়, সেই জন্যই মনের সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধ হয়। থাকে শুধু অবিক্ষিপ্ত চৈতন্য—সে অবস্থা যোগের সমাধির অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মকে 'চতুষ্পাদ' বলা হয়েছে—আত্মার সেই চারটী পাদ বা স্থান হচ্ছে—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান, সুষুপ্তস্থান, ও "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। বস্তুতঃ এই চারটি, আত্মার বিভিন্ন অবস্থা ব্যতীত আর কিছু নয়। জাগরিত স্থান—"বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গঃ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুক্ বৈশ্বানরঃ"। এ অবস্থায় আত্মা 'বহিঃপ্রজ্ঞ' অর্থাৎ আত্মার তখন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ ও সেই জগতের বিষয়সমূহে সম্পূর্ণ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন 'সপ্তাঙ্গ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা নানাভাবে বিষয় গ্রহণ করবার শক্তি তার প্রবল। আত্মা তখন 'একোনবিংশতিমুখ'—অর্থাৎ তখন 'পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ ও চতুরন্তঃকরণ' সক্রিয়। এ অবস্থায় আত্মা স্থূল জগতের বিষয়সমূহ উপভোগ করে—আর তার বিশ্বব্যাপী ব্যবহার চলে।

আত্মার যখন এই বহির্মুখিতা বন্ধ হয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি যখন ভেতরে প্রবিষ্ট হয় তখনই স্বপ্নাবস্থার আরম্ভ। তাই বলা হয়েছে—“স্বপ্নস্থানোঽন্তঃপ্রজ্ঞঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ।” এ অবস্থায় আত্মার ক্রিয়া স্বপ্নদর্শন, জ্ঞান অন্তর্মুখী। আত্মা তখন সূক্ষ্ম বাসনাসমূহই ভোগ করে—স্থূলজগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ থাকে না—মনের বিভূতিসমূহেরই অনুভূতি বিদ্যমান থাকে। আত্মা তখন তৈজস বা তেজোময়। স্বপ্নের এই অর্থ ছান্দোগ্য-উপনিষদেও নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। ‘যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা তদা সম্পন্নো ভবতি। স্বমপীতো ভবতি তস্মাদেনম্ স্বপিতীতি আচক্ষতে। স্বম্ হ্যপীতো ভবতি’—অর্থাৎ যখন কোন লোকের নিদ্রা যাওয়ার কথা বলি তখন বুঝতে হবে যে সে তার সৎ বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েছে। সে তখন নিজের ভেতর প্রবিষ্ট হয়েছে (স্বম্-হ্যপীতো ভবতি) ও সেই অর্থেই ‘স্বপিতি’ কথা ব্যবহার করা হয়। বাসনাগুলি সূক্ষ্মভাবে থাকে বলেই মন সেগুলিকে অবলম্বন করে লৌকিক জগতের বিষয়ের অনুরূপ বিষয়সমূহ সৃষ্টি করে। তাই স্বপ্ন নানাপ্রকার বিৎশক্তিময়—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ভাবের লীলাও চলে।

সুষুপ্তির অবস্থায় এ সমস্ত লীলার অবসান হয়। তাই সুষুপ্তিকে বলা হয়েছে “একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ”। সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আত্মা ‘একীভাব’প্রাপ্ত হয় তখন নানা বিষয়ে আত্মা বিক্ষিপ্ত নয়। বাসনাসমূহ সাময়িকভাবে বিনষ্ট নয়। তার বাসনা বিনষ্ট হলেই বহুর বা দ্বৈতের জ্ঞানও থাকে না—তখন প্রজ্ঞান বা জ্ঞানশক্তি একীভূত ও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। আত্মা সে অবস্থায় আনন্দময় ও আনন্দভোজী অর্থাৎ আনন্দ অবলম্বন করেই আত্মার তখন স্থিতি হয়। আত্মা তখন চেতোমুখ—সমস্ত চেতনা তখন কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। আত্মার তখন আনন্দময় ও আনন্দভোজী হবার কারণ এই তখন বিষয়বিষয়ী আকারে ও গ্রাহ্যগ্রাহকভাবে কোন মানস ব্যাপার ও আয়াস থাকে না, কোন প্রকার ক্লেশও থাকে না—শুধু থাকে আনন্দ। আত্মা তখন চিন্ময় বলেই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে বিজ্ঞানের কর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী অর্থাৎ অন্তরে থেকেই সমস্ত শক্তিকে নিয়মত করে, এবং সেইজন্য আত্মা, এই অবস্থায় সমস্ত ভাবের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান ; আত্মা সমস্ত জগতের কারণ। সেইজন্যই সুষুপ্তির নামান্তর—কারণ শরীর।

কিন্তু আত্মার এ অবস্থাও শেষ অবস্থা নয়। কারণ সুষুপ্তির অবস্থা সাময়িক, নিদ্রার ঘনত্বের অবসান হলেই সুষুপ্তি অবস্থার সমাপ্তি হয়, সে অবস্থা নিরবচ্ছিন্ন নয়। অর্থাৎ সে অবস্থা আনন্দময় ও চিন্ময় বটে কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। চিরস্থায়ী হলেই আত্মার শেষ অবস্থা লাভ

হয়। আত্মার সে শেষাবস্থা হচ্ছে চতুর্থপাদ বা তুরীয় স্থান, যাকে বলা হয়েছে “শান্তং শিবমদ্বৈতম্”। মাণ্ডুক্যে এই তুরীয় অবস্থার যে বর্ণনা রয়েছে সেটা হচ্ছে—

“নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং। অদৃশ্যম্-অব্যবহার্য্যম্-অগ্রাহ্যম্-অলক্ষণম্-অচিন্ত্যম-অব্যপদেশ্যম্-একাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।

[তুরীয়পাদ অন্তঃপ্রজ্ঞও নয় বহিঃপ্রজ্ঞও নয়, কিম্বা উভয়ের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্নও নয়, ঘনীভূত প্রজ্ঞাও নয়, জ্ঞাতাও নয় অচেতনও নয়। এই চতুর্থপাদ অদৃশ্য নয়, এর সঙ্গে কোন ব্যবহার চলে না, সে অবস্থা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নয়, চিন্তার অতীত, ও শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশনীয় নয়। তার কোন লক্ষণ নেই—স্বকীয় অনুভূতির ব্যাপার। এ অবস্থা নানা প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, শান্ত বা নির্ব্বিকার, মঙ্গলময় ও অদ্বৈত। এই আত্মার প্রকৃত অবস্থা—একমাত্র জ্ঞাতব্য সত্য]।

এখানে আমাদের ‘তুরীয়’ অবস্থা আলোচনার কোন আবশ্যকতা নেই—শুধু সুষুপ্তির সঙ্গে প্রভেদ দেখাবার জন্যই তার উল্লেখ। সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার অনুরূপ হলেও প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র থাকে বলেই সুষুপ্তির পর পুনরায় স্বপ্ন ও জাগরণ আসে। কর্ম্মবীজ নষ্ট হলেই সুষুপ্তি ও তুরীয়ের অবস্থায় কোন প্রভেদ থাকতো না। তাই বলা হয়েছে—

সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি
পুনশ্চ জন্মান্তর-কর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধঃ ॥

[সুষুপ্তি সময়ে যখন দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্তই স্বকারণে বিলীন হয় তখন জীব তমোগুণে আবৃত হয়ে আনন্দময় রূপ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু জন্মান্তরার্জ্জিত প্রারব্ধ কর্ম্ম সংশ্লিষ্ট থাকায় সৎরূপ লাভ করেও সেই জীব আবার স্বপ্ন ও জাগ্রৎ দশা প্রাপ্ত হয়ে থাকে।]

সুষুপ্তির অবস্থায় প্রাণবায়ু কি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাও নানা উপনিষদে বিশদ করে বলা হয়েছে। জাগরণ ও স্বপ্নের অবস্থায় প্রাণবায়ু আমাদের দেহের নানা নাড়ী বেয়ে ইতস্ততঃ বিচরণ করতে থাকে। কিন্তু স্বপ্নহীন নিদ্রার অবস্থায় প্রাণবায়ু হৃদয় থেকে শিরোদেশ পর্য্যন্ত যে সব নাড়ী বিস্তৃত রয়েছে সেই সব নাড়ীতে প্রবেশ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

তদ্যত্রৈতৎ সুপ্তঃ সমস্তঃ সম্প্রসন্নঃ স্বপ্নম্ ন বিজানাত্যাসু তদা নাড়ীষু সৃপ্তো ভবতি তম্ ন কশ্চন পাপ্মা স্পৃশতি তেজসা হি তদা সম্পন্ন ভবতি।

[সুপ্তাবস্থায় যখন সমস্ত শান্ত হয় ও কোন স্বপ্নদর্শন ঘটে না তখন প্রাণবায়ু নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে—তখন কোন পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে না—আত্মা তেজসম্পন্ন হয়।]

এই নাড়ীকে হৃদয়ের নাড়ী (হৃদয়স্য নাড্যঃ) বলা হয়েছে। নাড়ী বহুসংখ্যক তন্মধ্যে একটী হচ্ছে প্রধান—সেটী হৃদয় থেকে শিরোদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপৃত। প্রাণ সেই নাড়ীগত হলেই মানুষ অমৃতত্ব বা অমরত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু অন্যান্য নাড়ীসমূহে প্রবিষ্ট হলে ইতস্ততঃ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হয়।*

এই কথাই আরও স্পষ্ট করে অন্যত্র বলা হয়েছে—যখন মানুষ সুপ্ত হয় ও যখন কোন স্বপ্ন দেখে না তখন প্রাণবায়ু একীভূত হয়। তখন বাক্ নামসমূহের সঙ্গে, চক্ষু সমস্ত রূপের সঙ্গে, শোত্র শব্দসমূহের সঙ্গে ও মন সমস্ত চিন্তার সঙ্গে সেই একীভূত প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়। আর জাগরণের অবস্থায়, জ্বলন্ত অগ্নি থেকে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় তেমনি প্রাণবায়ু ইন্দ্রিয়সমূহে প্রত্যাগত হয় ও নানা বাহ্য লোকের সঙ্গে তার যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।*

পূর্ব্বেই বলেছি যে সুষুপ্তির যোগের সমাধির অবস্থার অনুরূপ। সুষুপ্তিতে একাগ্রচিত্ততা সাধারণভাবে আসে, কিন্তু সে অবস্থা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় না বলেই বোধহয় প্রাচীন ঋষিরা যোগাবলম্বনে বহুক্ষণস্থায়ী একাগ্রচিত্ততা আনবার উপায় উদ্ভাবন করেন। যোগাবলম্বনে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হলে যোগীর চিত্তে সম্পূর্ণ স্থিরতা আসে, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অভ্যন্তরে লয় প্রাপ্ত হয়, বাক্ দর্শন, ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে দৃশ্যমান জগতের কোন যোগাযোগ থাকে না—মনে কোন বিকল্পাত্মক জ্ঞান থাকে না—সমস্ত চিৎশক্তির একত্র সমাবেশে তখন চিত্ত তেজোময় হয়, বাহ্য জগতের সঙ্গে ব্যবহার না থাকায় চিত্ত তখন আনন্দময় হয়। এ অবস্থায় কালজ্ঞান থাকে না—অতীত ও ভবিষ্যৎ তখন সমভাবে চিত্তে উদ্ভাসিত হয়। দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে যোগাযোগ থাকাতেই আমাদের কালজ্ঞানের উৎপত্তি। সুতরাং সেই জগতের সঙ্গে যখন কোন ব্যবহার

---

* শতম্ চৈকা হৃদয়স্য নাড্যঃ —
তাসাম্ মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষঙ্ঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি। (ছান্দোগ্য)।

* যদা সুপ্তঃ স্বপ্নং ন কঞ্চন পশ্যত্যথাস্মিন্ প্রাণ এবৈকধা ভবতি তথৈনং বাক্ সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈ রূপৈঃ সহাপ্যেতি শোত্রং সর্ব্বৈ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রতিবুধ্যতে যথাগ্নের্জ্বলতো সর্ব্বাদিশো বিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ। (কৌষিতকী উপনিষদ্)।

আর থাকে না তখন কালপ্রবাহ সম্বন্ধে আমাদের আর কোন ধারণাই থাকে না। এই কথা সিদ্ধপুরুষেরা সাঙ্কেতিক ভাষায় নানা প্রকারে ব্যক্ত করেছেন—

জহি মণ পবণ ণ সঞ্চরই রবি সসি ণাহ পবেস
তহি বঢ় চিত্ত বিসাম করু সরহেঁ কহিঅ উএস॥

[সরহ উপদেশ করছেন—সেই সমাধিতে চিত্তের বিশ্রাম সাধন কর যেখানে রবি শশী প্রবেশ করে না, যেখানে মনপবন সঞ্চরণ করে না।]

রবি শশী হচ্ছে দিবারাত্রিরূপ কাল প্রবাহের প্রতীক। সমাধির অবস্থায় কালপ্রবাহের জ্ঞান থাকে না, সেইজন্য বলা হয়েছে যে সেখানে রবি শশীর প্রবেশ নাই ; প্রাণবায়ুর চলাচল বন্ধ হয় বলেই মন স্থিরীকৃত হয়—তখন আর সে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে না।

এই হিসাবেই বোধহয় আমাদের যোগ ও দর্শনশাস্ত্রে ধরা হয়েছে যে যোগীগণ ত্রিকালদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তাঁদের নখদর্পণে। সমাধির অবস্থায়, তাঁদের কালপ্রবাহের গতিসম্বন্ধে জ্ঞানের ভূতভবিষ্যৎ—বর্ত্তমান হিসাবে পৃথক সমাবেশ না হয়ে একত্র সমাবেশ হতো—সুতরাং লৌকিক হিসাবে যা অতীত ও ভবিষ্যৎ, তা তাঁদের নিকট সমাধির অবস্থায় স্পষ্ট প্রতিভাত হতো—এ বিশ্বাস শাস্ত্রকারদের ছিল। সুষুপ্তির অবস্থাতেও তা কিয়ৎপরিমাণে ঘটা সম্ভবপর কারণ সুষুপ্তি ও সমাধিতে চিত্তের অবস্থা শাস্ত্রকারদের হিসাবে অনুরূপ। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি যে হিন্দুদর্শনানুসারে স্বপ্নের অবস্থা সুষুপ্তির নিম্নস্তরের কিন্তু স্বপ্নাবস্থা থেকেই চিত্ত সুষুপ্তিতে প্রবেশ করতে পারে। তাই স্বপ্নাবস্থার সহসা লয় হয়েই সুষুপ্তি আসে না—সে লয় ক্রমশঃ সাধিত হয়, সুতরাং স্বপ্ন যখন সুষুপ্তির কিনারায় এসে পৌঁছায় তখন সুষুপ্তির অবস্থায় যে সমস্ত অনুভূতি হয় সেই সমস্ত অনুভূতিই যে কিয়ৎপরিমাণে চিত্তে প্রতিফলিত হবে না তা কে বলতে পারে ?

তাই একথা আমরা নির্ভয়েই বলতে পারি যে কালপ্রবাহের গতি ও স্বপ্ন সম্বন্ধে ডান সাহেব বিজ্ঞানসম্মত-প্রথানুসারে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন তার পরিচয় আমাদের দর্শনশাস্ত্র থেকে পূর্ব্বেই পেয়েছি। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের জগৎ থেকে আস্‌ছে বলেই যা নূতন ঠেকেছে।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মাঞ্চুকুয়ো

১

মাঞ্চুরিয়ার সমস্যা আজ দু'বছর ধরে সমস্ত জগৎকে চিন্তিত করে তুলেছে। এই প্রদেশের আধিপত্য নিয়ে চীন ও জাপানের সঙ্ঘর্ষ আজকের দিনের নৈরাশ্য বৃদ্ধি করছে দু'টি কারণে। এশিয়ার জাতিসমূহের মধ্যে সখ্য ও এশিয়ার ঐক্য বর্ত্তমান যুগে যে স্বপ্নমাত্র, এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। অন্যদিকে জগদ্ব্যাপী মহাসংগ্রামের পর যুদ্ধনিরোধের যে বিপুল উদ্যম ও নবযুগ প্রবর্ত্তনার যে বিশাল আশা থেকে জেনীভার জাতিসঙ্ঘ জন্ম নিয়েছিল তার নিষ্ফল পরিণতি এই ব্যাপারে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।

চীন ও জাপানের সঙ্ঘাত অবশ্য নূতন নয়—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদেশের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের পর থেকে এই ষাট বছর বারম্বার তার পরিচয় পাওয়া গেছে। ইউরোপের সংস্পর্শের ফল দুই দেশে ভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। বিদেশীর কার্য্যকলাপে চীনবাসীদের মনে বহুদিন পর্য্যন্ত নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিদেশের প্রতি অবজ্ঞার ভাব অবিচলিত থেকে গেল। সেইজন্য বিংশ শতাব্দীর আগে ইউরোপের কাছে শাসনপদ্ধতি, সমরকৌশল ও নানা বিদ্যা শিক্ষার ইচ্ছা চীনে প্রবল হয়নি। পক্ষান্তরে বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার পর থেকেই জাপানীদের সাধনা হলো এই যে ইউরোপের অস্ত্র-শস্ত্র, রণচাতুর্য্য ও কর্ম্মক্ষমতা আয়ত্ত করে এমন শক্তিপ্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে জাপান পৃথিবীর প্রধান জাতিগুলির সমকক্ষ বলে গণ্য হতে পারে। অতি অল্পদিনের মধ্যে আশাতীত সাফল্য লাভ করে জাপান যখন প্রাচ্যে তার আধিপত্যের সূচনা করলে তখনও চীনের উদাসীন অলস তন্দ্রাজড়িত ভাব কেটে যাবার লক্ষণ দেখা যায়নি।

চীনের বিরুদ্ধে জাপানের নবার্জ্জিত শক্তির প্রয়োগ প্রতীচ্যেরই পদানুসরণের চিহ্ন। জাপানী সৈন্য ১৮৭৪ সালে সামান্য কারণে ফর্মোজা আক্রমণ ও পর বৎসর লুচু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের প্ররোচনায় চীনের বশ্যতা অস্বীকার করলে পরে, ১৮৯৪ সালে চীনের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে কোরিয়াতে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় ঠিক এই সময়ে জাপানের আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর সম্মিলিত প্রভাবে ব্যর্থ হলেও রুষ-জাপানের যুদ্ধের পর (১৯০৫) এ অঞ্চলেও জাপানের গতিরোধ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলি চীনে বাণিজ্য ও বসবাস

সম্বন্ধে যে সকল বিশেষ অধিকার অর্জ্জন করেছিল তার প্রত্যেকটিতে জাপানেরও অংশ থেকে গেল। ১৯১৪ সালে জার্ম্মানী কর্ত্তৃক বেল্‌জিয়মের নিরপেক্ষতা অগ্রাহ্য হওয়ার প্রতিবাদে সমস্ত জগৎ যখন প্রতিবাদ-মুখরিত, ঠিক সেই সময় চীনের আপত্তি সত্ত্বেও জাপান চীনের ভিতর দিয়ে সৈন্য চালনা করে জার্ম্মানদের হাত থেকে শান্‌-টুং প্রদেশ অধিকার করে। অন্য সকল দেশ যখন যুদ্ধে ব্যস্ত সেই অবসরে (১৯১৫) জাপান দুর্ব্বল চীনের কাছে একুশটি দাবী জানায়—তার মধ্যে যেগুলি চীনকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল তার ফলে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের অধিকার বিশেষ করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ১৯২২ সালে এমেরিকার অনুরোধে শান্‌-টুং প্রদেশ চীনকে প্রত্যর্পণ করা হয় বটে, কিন্তু ওয়াশিংটন্ চুক্তির ফলে চীন-অঞ্চলে জাপানের শক্তি অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত থেকে গেল বলা যেতে পারে। পাঁচ ছ' বছর আগে জাপান শান্‌-টুং প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য দু'বার সৈন্য প্রেরণ করেছিল এ কথাও মনে রাখা ভাল। অর্দ্ধশতাব্দীর ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে চীনের সীমার মধ্যে জাপানী সেনার আবির্ভাব এবং চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে জাপানের হস্তক্ষেপ একেবারেই বিরল নয়।

এই সঙ্ঘর্ষে এখন পর্য্যন্ত বারবার চীনেরই পরাজয় হয়ে এসেছে। জাপানের শাসকেরা সুদক্ষ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও ব্যবস্থা জাপানে সুনিয়ন্ত্রিত, শিক্ষিত যোদ্ধা হিসাবেও জাপানীদের সহিত চীনবাসীদের তুলনা হয় না। ভৌগোলিক সংস্থাপনের গুণে জাপানের পক্ষে চীন আক্রমণ সহজ এবং জাপানী নৌবাহিনীর সামনে চীনের উপকূলস্থ জনপদগুলি অসহায়। বহুদিন পর্য্যন্ত চীনের উপর জাপানের প্রভুত্বস্থাপনের পথে দু'টি মাত্র বাধা ছিল—পূর্ব্বদেশে রাশিয়া, এমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতির স্বার্থ এবং চীনের বিরাট বিস্তার। কিন্তু ১৯১৯ সালের পর থেকে চীনের পুনর্জন্মের প্রতীক-স্বরূপ জাতীয় মনোভাবের দ্রুত প্রসার তৃতীয় একটি বাধার সৃষ্টি করেছে একথা বলতেই হবে।

২

চীন-অঞ্চলে জাপানীদের উদ্দেশ্য ঠিক সাম্রাজ্য-বিস্তার বলা চলে না—উপকূলস্থিত দ্বীপগুলি ব্যতীত শুধু কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণপ্রান্তস্থ লিয়া-টুং উপদ্বীপ মাত্র জাপানরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপীয়দের অনুকরণে প্রাচ্যে আপন ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা চীনের সম্বন্ধে জাপানের প্রতিকূলতার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমান জগতের প্রধান রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আজ জাপানের যে পদমর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে চীনে প্রভুত্বস্থাপনের উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু চীনের সঙ্গে জাপানের

ব্যবহারের মূলে রয়েছে জাপানের আর্থিক অবস্থা নিরাপদ ও উন্নত করবার প্রচেষ্টা।

জাপানের লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে অথচ ক্ষুদ্রায়তন দেশটির এমন সামর্থ্য নেই যে স্বকীয় সম্পদে দেশবাসী সকলের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতে পারে। মুসোলিনীর ভাষায় জাপানকে বর্ত্তমান জগতের proletarian nation-দের অন্যতম বলে অভিহিত করা যায়। এ অবস্থায় জাপানীদের মতে দু'টি মাত্র উপায় অবলম্বন সম্ভবপর—কেননা আধুনিক ইটালীয়দের মতন জাপানীদেরও বিশ্বাস যে জনসংখ্যানিরোধের চেষ্টা জাতির পক্ষে অকল্যাণকর ও দেশের পতনের সূত্রপাত। প্রথম উপায় দলে দলে বিদেশে বসতি স্থাপন। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, এমেরিকা প্রভৃতিতে জাপানীদের অবাধ প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাছাড়া বিদেশে বসবাসের ফলে স্বদেশের লোক ও শক্তি ক্ষয় অনিবার্য্য,—পররাষ্ট্রে বাস করে স্বদেশের সঙ্গে যোগ রক্ষাও প্রায় অসম্ভব। তাই জাপানীরা তাদের ব্যবসাবাণিজ্যকে এমনভাবে উন্নত করতে চায় যাতে করে বর্দ্ধিষ্ণু লোকসমষ্টির আর্থিক কল্যাণ আপনা হতেই সম্পন্ন হবে।

বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতকগুলি অঞ্চলে প্রতিপত্তি ও একাধিপত্য প্রয়োজন এ বিশ্বাস সকলেরই মনে বদ্ধমূল। নানা দেশের সঙ্গে জাপানের ব্যবসা আছে বটে কিন্তু একমাত্র চীনেই তার প্রভুত্বস্থাপন সম্ভবপর। দেশবাসীদের আর্থিক উন্নতিসাধনের সঙ্কল্প ও চীনের বাহিরে অন্যত্র সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বিস্তর বাধা—চীনে জাপান কর্ত্তৃক কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের সবিশেষ চেষ্টার মূল কারণ এই দু'টি।

চীনের মধ্যে আবার উত্তর সীমান্তে মাঞ্চুরিয়া নামে পরিচিত তিনটি প্রদেশের মূল্য জাপানের নিকট অত্যন্ত অধিক। মাঞ্চুরিয়া, জাপান ও কোরিয়ার প্রতিবেশী, মাঞ্চুরিয়ার ধনসম্পদ সুপ্রচুর, ভবিষ্যতে তার উন্নতির সম্ভাবনাও অসীম। উনবিংশ শতকের শেষে বিদেশী শক্তিবৃন্দের মনে যখন চীনকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সঙ্কল্প উদিত হয় তখন থেকেই জাপানের দৃষ্টি মাঞ্চুরিয়ার উপর ন্যস্ত। ১৯০৫ ও ১৯১৫ সালের সন্ধিগুলির ফলে মাঞ্চুরিয়ার দক্ষিণ অংশে জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াও অন্য তিনটি কারণে জাপানীদের কাছে এই প্রভুত্ব ন্যায়সঙ্গত মনে হয়। জাপান সরে দাঁড়ালে চীন রাশিয়ার হাত থেকে মাঞ্চুরিয়া রক্ষা করতে পারবে না। তাই রাশিয়ানদের বিতাড়িত করতে সহস্র সহস্র জাপানী মাঞ্চুরিয়ায় দেহরক্ষা করেছে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্যুদ্ধের প্রকোপে চীন যখন বিধ্বস্তপ্রায় তখন জাপানের ইঙ্গিতেই মাঞ্চুরিয়ায় শান্তিভঙ্গ করতে কেউ সাহস পায়নি। গত পঁচিশ বছরে মাঞ্চুরিয়ার

অভাবনীয় শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে জাপানের অর্থ, পরিশ্রম ও নেতৃত্ব,—জাপানীদের এ বিশ্বাসও দৃঢ়মূল।

মাঞ্চুরিয়া জাপানের উপনিবেশ একথা অবশ্য সত্য নয়—সে দেশে জাপানী অধিবাসীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি জাপানের শস্যভাণ্ডার হয়ে উঠেছে। এই প্রদেশের তূলা, লোহা, কয়লা ও কাঠ জাপানের বহু ফ্যাক্টরীকে আজ কর্ম্মরত রেখেছে। মাঞ্চুরিয়াতে জাপানী পণ্যদ্রব্য বহুলপরিমাণে বিক্রয় হয়। জাপানী ধনিকেরা মাঞ্চুরিয়ার সম্পদবৃদ্ধির চেষ্টায় অর্থনিয়োগ করে প্রভূত লাভ করছে। এই অঞ্চলে আর্থিক কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত রয়েছে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর হাতে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে এই কোম্পানী জাপানের তত্ত্বাবধানে আসে। সেই অবধি এর অসাধারণ প্রসার ও প্রতিপত্তি বিস্ময়জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই রেললাইনের দুই পাশের ভূমিখণ্ড জাপানের সম্পত্তি—লাইন রক্ষার জন্য কোম্পানীকে সৈন্য রাখার ক্ষমতা চীন বাধ্য হয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে এই কোম্পানীর পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি—ফ্যাক্টরী, খনি, জাহাজের ডক্, টুরিষ্টদের জন্যে হোটেল, কর্ম্মচারিদের জন্য স্কুল ইত্যাদি; কোন কিছুরই অভাব নেই। জাপানীদের স্বার্থে উদ্বুদ্ধ এই বিশাল বিদেশী শক্তি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার সকল ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করছে।

অথচ এতদিন পর্য্যন্ত মাঞ্চুরিয়া চীনেরই অংশ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সম্রাটদের পতনের পর নূতন রিপাব্লিক্‌কে প্রদেশ-তিনটির শাসক বলে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিল। যে সন্ধি কয়েকটির উপর মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত সে সবগুলি চীনেরই সঙ্গে সন্ধি। চীনদেশে ঘোর অরাজকতার দিনেও মাঞ্চুরিয়ার স্বাতন্ত্র্য দাবী করা হয়নি, মনে রাখা আবশ্যক। মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অধিকার যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এ বিষয়ে চীনবাসীদের মনে অন্ততঃ বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তারা কখনও ভোলে না যে মাঞ্চুরিয়ার আধুনিক উন্নতির হেতু শুধু জাপানের অর্থ ও নেতৃত্ব নয়—গত কয়েক বৎসরে যে লক্ষ লক্ষ চীনবাসী মাঞ্চুরিয়ায় বসতি করেছে তাদের শারীরিক শ্রম ও কর্ম্মকুশলতা ভিন্ন এ উন্নতি অসম্ভব হতো। দুর্ব্বল চীনের কাছ থেকে জাপান যে অধিকার কেড়ে নিয়েছে সেগুলি অন্যায়, চীনের সকলেরই এই এক মত। সে অধিকার ফিরিয়ে নেওয়া উচিত নূতন জাতীয়দলের এই বিশ্বাস জাপানের পক্ষে সন্দেহ ও ত্রাসের কারণ।

প্রতিবেশী জাতি দুইটির স্বার্থবুদ্ধিতে এবং ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার সঙ্ঘাতে মাঞ্চুরিয়ার জটিল সমস্যা গঠিত।

৩

দু'বছর আগে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ে নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে বাদপ্রতিবাদ হয়। জাপানী-পরিচালিত রেল-লাইনগুলির প্রতিযোগিতা করে চীন নূতন লাইন নির্ম্মাণ করাতে এ গোলযোগের সূত্রপাত। জাপানের মতে পূর্ব্বতন সন্ধিগুলির গুপ্তসর্ত্ত অনুসারে চীনের এ স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে; চীন বলে এ সম্বন্ধে কোন অঙ্গীকার কোন কালে দেওয়া হয়নি। এই মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেলে অন্য কারণে—এই সময় মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের কোরীয় প্রজা ও চীনা অধিবাসীদের মধ্যে সহসা একটা খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায় এবং মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে নাকামুরা নামে এক জাপানী সেনাধ্যক্ষ নিহত হন। ১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দস্যুরা জাপানী রেল-লাইন আক্রমণ করামাত্র জাপানী সৈন্যেরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার প্রধান নগরগুলি অধিকার করে। যেরূপ ক্ষিপ্রভাবে এ কাজ সম্পন্ন হয় তার থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে সমস্ত দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া অধিকার জাপানীরা পূর্ব্ব থেকে স্থির করে রেখেছিল। জাপানে সৈন্য-বিভাগ মন্ত্রীসভার অধীন নয়—সুতরাং মাঞ্চুরিয়া অধিকার হয়ত সেনাপতিদের সঙ্কল্পমাত্র ছিল; কিন্তু তাঁদের কাজ জাপানী জনসাধারণের যে সানন্দ সমর্থন পেলে তার ফলে মন্ত্রীদেরও অন্য পন্থা অবলম্বনের কোন উপায় রইল না। এদিকে চীনের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত জাপানের আচরণের তীব্র প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌ল। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ জাপানী পণ্যবর্জ্জনের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হলো, কেননা বয়কট্ ব্যাপারে বহুদিনের শিক্ষানবিশীর ফলে চীনেরা সিদ্ধহস্ত। অল্পদিনের মধ্যে এইরূপে চীনের প্রধান বন্দর শাঙ্ঘাই-নগরীতে জাপানী-বাণিজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। বর্জ্জন-আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য ও জাপানী প্রজার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ-স্বরূপ তখন জাপান শাঙ্ঘাই আক্রমণ করে। কিছুদিন যুদ্ধবিগ্রহের পর জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় এবং ইংল্যাণ্ড ও এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করবার অভিপ্রায়ে শাঙ্ঘাই-অঞ্চল থেকে জাপানী সৈন্য অপসৃত হলো। মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের মুষ্টি শিথিল হবার কোন লক্ষণ কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেখা যায়নি। মাঞ্চুরিয়ার অবস্থা সম্যক পর্য্যালোচনার জন্য জাপানেরই অনুরোধে জাতিসঙ্ঘ লীটন্ সমিতির নিয়োগ করেন। এই সমিতির সিদ্ধান্ত জাপানের অনুকূল হবে না এ আশঙ্কায় কিছুদিন হলো জাপান মাঞ্চুরিয়াকে এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে ঘোষণা করেছে। জাপানের ছায়াশ্রিত, পৃথিবীর এই নবীনতম রাষ্ট্রটির নাম হয়েছে মাঞ্চুকুয়ো। চীনের অন্তর্গত প্রদেশে যে ক্ষমতা ব্যবহার করা চলে না, তথাকথিত স্বাধীন রাজ্যে অবশ্য তার পথে কোন বাধা থাকবে না—এই প্রত্যাশাই মাঞ্চুকুয়ো-সৃষ্টির ভিত্তি।

লীটন্ সমিতির সিদ্ধান্ত এখন জাপান নির্ব্বিবাদে পদদলিত করছে। মাঞ্চুকুয়োকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে দলে দলে জাপানী সৈন্য ও কর্ম্মচারী সে দেশে প্রেরিত হচ্ছে; চীন যাতে তার নষ্ট অধিকার পুনরুদ্ধার না করতে পারে সেজন্য সীমান্তে অভিযানের ব্যবস্থা হয়েছে। মাঞ্চুরিয়ায় স্বাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চীনের পক্ষে স্বাভাবিক একথা বোধহয় কেউ অস্বীকার করবে না। সম্প্রতি জেহোল প্রদেশে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে গেল তার কারণ চীনের এই চেষ্টা ও জাপানের তাতে বাধাদান। এখন পর্য্যন্ত এই ঘাত-প্রতিঘাতে জাপানই বিজয়ী হয়েছে এ কথা বলা বাহুল্য।

৪

বিগত মহাযুদ্ধের পর জেনীভায় যখন জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যুদ্ধবিগ্রহ থামানোই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্যবস্থা তখন বিধিবদ্ধ হয় যে জাতিসঙ্ঘের সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগে বিবাদের অবসানের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। জাতিসঙ্ঘের কোন সভ্যের, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘর্ষ নিবারণের তিনটি পন্থার মধ্যে অন্ততঃ একটি অনুসরণ করার দায়িত্ব এড়াবার ন্যায্যতঃ কোন অধিকার নেই। তৃতীয় কোন দেশের মধ্যস্থতা, হেগ্ নগরীর বিচারালয়ের শরণাপন্ন হওয়া কিম্বা জাতিসঙ্ঘের কাউন্সিল্ বা সংসদের উপর বিবাদ-নিষ্পত্তির ভার অর্পণ—এই তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতি শান্তিরক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ায় সংঘর্ষ হওয়া মাত্র চীন তৃতীয় প্রণালীর অনুসরণ করে, কিন্তু জাপান প্রথম থেকে জাতিসঙ্ঘকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করার ফলে আজ সর্ব্বত্র লীগ্ অব্ নেশন্সের প্রতিপত্তিহ্রাস ও সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে।

গত দুই বৎসর জাপান জাতিসঙ্ঘকে পদে পদে অপমান করছে অস্বীকার করা চলে না। ১৯৩১ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর লীগের সংসদ স্থির করলেন যে মাঞ্চুরিয়ায় দস্যুর প্রকোপ কমামাত্র জাপানের সৈন্য অপসৃত করতে হবে। জাপান এ প্রস্তাবে সম্মত হবার পর দেড় বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী সেনাবল বর্দ্ধিতই হয়েছে। এতদিনেও দস্যুদমন না হয়ে থাকলে জাপানের পক্ষে কথাটা গৌরবজনক নয়। কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সৈন্য অপসারণের প্রস্তাবে জাপান অবশ্য কিছুতেই সম্মতি দেয়নি যদিও লীগ্ কাউন্সিলের অপর সকল সভ্যেরই মতে ১৯৩১ সালের ১৬ই নভেম্বর জাপানের মাঞ্চুরিয়া শাসনের শেষ দিন ব'লে সাব্যস্ত করা সমীচীন বোধ হয়েছিল। লীটন্ সমিতির নির্দ্ধারণ অনুসারে (১৯৩২) মাঞ্চুরিয়া চীনের অন্তর্গত থাকাই ন্যায়সঙ্গত; তবে জাপানের স্বার্থরক্ষার

জন্য উভয়পক্ষের সম্মতি অনুসারে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থার উদ্ভাবন প্রয়োজনীয়। চীন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এর বেশী কোন দাবী জাপানের পক্ষেও শোভন নয়। কিন্তু জাপান এখন মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাজ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ও তার সীমাবিস্তারের চেষ্টায় ব্যস্ত। লীটন্ রিপোর্ট সেজন্য সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। এর পর জাতিসঙ্ঘ আর কিছু করবেন কিনা সন্দেহ কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এ অপমান কাটিয়ে ওঠা দুঃসাধ্য।

লীগ্ অব্ নেশন্সের দুর্ব্বলতার কারণ সুস্পষ্ট। সঙ্ঘের বিধানে পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়মবিগর্হিত করা হয়নি; যুদ্ধঘোষণা না ক'রে অপর দেশ আক্রমণ করার যে প্রথা জাপান অনুসরণ করছে সে সম্বন্ধেও লীগের নিয়মাবলীতে পরিষ্কার কোন নিষেধ নেই। সর্ব্বজাতির সমতা বজায় রাখার জন্য, জাতিসঙ্ঘের কোন নির্দ্ধারণ সকলের সম্মতি ছাড়া গৃহীত হতে পারে না—এই নিয়মের ফলে জাতিসঙ্ঘ স্বভাবতঃই শক্তিহীন। অবশ্য ব্যবস্থা আছে যে বিবাদী ভিন্ন অপর সকলে একমত হলে তারা লীগের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করতে পারবে। কিন্তু দেশ বিশেষের প্রতি বলপ্রয়োগ অনেকেরই চোখে জাতিসঙ্ঘের আদর্শচ্যুতির নিদর্শন ব'লে গণ্য হওয়া সম্ভব। রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র এখনও লীগ্ থেকে স্বতন্ত্র রয়েছে। জাপান যদি এখন লীগের সভ্যপদ ত্যাগ করে তবে তার অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হবে এ আশঙ্কাও আছে। পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলির সহায়তা ভিন্ন জাতিসঙ্ঘের কিছু করার উপায় নেই অথচ তাদের মধ্যে অনেকেরই জাপানের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে এ সন্দেহও অমূলক নয়।

জাতিসঙ্ঘের শক্তি অবশ্য স্বল্পপরিসর কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে সেই সামান্য ক্ষমতা পর্য্যন্ত যথাযোগ্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলা চলে না। জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব না থাকলে সম্ভবতঃ জাপান চীনের উপর আরও বেশী অত্যাচার করতে পারত। কিন্তু একথাও সত্য যে প্রথম থেকে লীগ্ সংসদ যদি দৃঢ়ভাবে জাপানের কাজের প্রতিবাদ করতেন—জাপানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধচ্ছেদ, বিদেশ থেকে জাপানের অর্থসাহায্য বন্ধ বা জাপানের পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন এই সব প্রস্তাব যদি প্রথমেই আলোচিত হত—তাহলে জাপান কখনও এতদূর অগ্রসর হবার সাহস পেত না। গত দু'বছরের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় স্পষ্টই দেখা যায় যে লীগের দৌর্ব্বল্যের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের ঔদ্ধত্য বেড়ে চলেছে। লীগ্ অব্ নেশন্সের সাবধানতা এ ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়েছে বলা চলে, কেননা এতে শুধু প্রাচ্যে নয় সর্ব্বত্রই জাতিসঙ্ঘের প্রতিপত্তি লুপ্তপ্রায় হয়েছে। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের শত অভিযোগ থাকলেও সে-বিবাদের সমাধান জাতিসঙ্ঘের হাতে

দেওয়াই উচিত ছিল। জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ও আন্তর্জাতিক কলহে কোন দেশের যথেচ্ছ আচরণের স্বাধীনতা দাবী, এ দুটি পরস্পর বিরোধী।

লীগ্ অব্ নেশন্সের অকৃতকার্য্যতার একটি প্রধান কারণ এ সম্বন্ধে জনমতের অভাব, তাই এর শোচনীয় পরিণতির জন্যে শুধু লীগ্‌কে দায়ী করা চলে না, দোষ সকলকেই ভাগ ক'রে নিতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনসাধারণ সজাগ ও দৃঢ়চিত্ত হলে গভর্ণমেণ্ট্‌গুলিকে বাধ্য হয়ে লীগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করতে হত। জাতিসঙ্ঘ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমষ্টি মাত্র। অন্ততঃ প্রধান দেশসমূহে জনমত কোন বিষয়ে প্রবল হলে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার শক্তি জাতিসঙ্ঘ আপনা হতেই অর্জ্জন করে। মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারে এশিয়ার নানা দেশের ঔদাসীন্য মনকে পীড়া দেয়।

স্বার্থবুদ্ধি বা অন্য যে কারণেই হোক এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই জাপানের ব্যবহারে সব চেয়ে বেশী আপত্তি জানিয়েছে। চীনদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বরাবরই সদ্ভাব ছিল। নবীন চীন নানাভাবে এমেরিকার কাছে ঋণী। জাপানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন শত্রুতাও সর্ব্বজনবিদিত। ১৯৩২ সালের প্রথমে পররাষ্ট্র সচিব মিষ্টার ষ্টিম্‌সন্ ঘোষণা করেন যে মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে পূর্ব্বতন সন্ধি ভঙ্গ ক'রে যদি কোন নূতন ব্যবস্থা হয় তবে সে বিধানকে যুক্তরাষ্ট্র মেনে চলবে না। সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের পরিষদ (এসেম্‌ব্লি) মিষ্টার ষ্টিম্‌সনের এই non-recognition প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে মাঞ্চুকুয়োকে স্বাধীন রাজ্য ব'লে স্বীকার করা হবে না। পৃথিবীর সকল জাতি যদি এই একটি সামান্য ব্যাপারেও একমত হয়ে চলে তবে জাপানকে শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে হবে, কেননা জাপানের আর্থিক ও আভ্যন্তরিক অবস্থা এমন নয় যে জাপান অন্য দেশের উপর নির্ভর না ক'রে বরাবর তাদের উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে।

৫

জাপান যে শুধু জাতিসঙ্ঘের কভেনাণ্ট্ বা বিধান লঙ্ঘন করেছে তা নয়—দুইটি অন্য সন্ধি ভঙ্গের অপরাধ স্খালনও তার পক্ষে অসম্ভব। ১৯২২ সালে নয়টি রাজ্য সম্মিলিত হয়ে সন্ধি করে যে চীনের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, অধিকারহ্রাস বা রাজ্যক্ষয় করবার চেষ্টা কেউ করবে না; জাপান সেই ন'টি রাজ্যের অন্যতম। ১৯২৮ সালে জাপান কেলগ্ প্যাক্ট্ স্বাক্ষর করে—তাতে যুদ্ধের দ্বারা নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির প্রয়াস সকল দেশের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়েছে। জর্ম্মানী একটি মাত্র সন্ধিলঙ্ঘনের অপরাধে ১৯১৪ সালে সভ্যসমাজ থেকে বহিষ্কৃতপ্রায়

হয়েছিল। চীনের সীমানার মধ্যে মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন জাপানের তিন-তিনটি সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করার নিদর্শন।

জাপানের সমর্থনে অনেকগুলি যুক্তি ব্যবহার করা হয়। সে সম্বন্ধে কিছু ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

প্রথমতঃ এ কথা বলা হয়েছে যে বস্তুতঃ জাপান লীগ্ কভেনান্ট বা কেলগ্ প্যাক্ট্ লঙ্ঘন করেনি। উক্ত সন্ধিপত্র দুটিতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হয়েছে কিন্তু জাপান চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে বলা চলে না। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ প্রতিশোধ বা reprisals নামে আজ পর্য্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ব'লে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। চীনের সঙ্গে বিদেশী শক্তিবৃন্দের ব্যবহারে এর প্রচুর দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। গত দশবৎসরের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও জাপান নানা কারণে চীনে সৈন্য প্রেরণ করেছে। কিন্তু এই যুক্তি জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার বা মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন সমর্থন করে না। সামান্য বলপ্রয়োগ ও বিশাল অভিযানের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে—প্রথমটির নামে একটি সমগ্র প্রদেশ অধিকার বা রাজ্য জয় কখনই চলে না। লীগ্ কভেনান্ট্ বা কেলগ্ প্যাক্টের কোন অর্থ থাকলে উভয় ক্ষেত্রেই জাপান সন্ধিভঙ্গের দোষে দোষী। আর ১৯২২ সালের সন্ধিটি যে লঙ্ঘিত হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

জাপানের পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি এই যে চীনকে একটি নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র রাজ্য বা জাতি ব'লে গণ্য করা অনুচিত। চীনদেশ অরাজক—অন্য রাজ্য সম্বন্ধে সভ্যসমাজ যে সব বিধিবিধান স্থির করেছে চীনে সেগুলি খাটে না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ১৯২২ সালে যখন চীনে অরাজকতা আরো ব্যাপক ছিল তখন জাপান চীনের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে দ্বিধাবোধ করেনি; মাঞ্চুরিয়ায় গোলযোগের প্রথম অবস্থায় জাপান জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক বিবাদ নিষ্পত্তির চেষ্টার পরিবর্ত্তে চীন গভর্ণমেণ্টের সহিত স্বতন্ত্র আলোচনার প্রস্তাব করেছিল; চীনের শাসকেরা বয়কট্ আন্দোলন নিরোধ করতে পারেন নি বারম্বার এই অভিযোগ আনবার সময় জাপানের স্মরণ ছিল না যে চীন অরাজক। তাছাড়া একথা কখনই বলা চলে না যে কোন একটি দেশ অরাজক কিনা এ সিদ্ধান্ত অপর একটি দেশের উপর নির্ভর করবে। একমাত্র জাতিসঙ্ঘই এ বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার অধিকারী। লীগের একটি সভ্যও যখন মুক্তকণ্ঠে জাপানের সমর্থন করতে সাহস পায়নি তখন এ যুক্তির অসারতা স্বতঃসিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ অনেকে বল্‌তে পারেন যে মাঞ্চুকুয়ো চীনের কবল থেকে মুক্তির চেষ্টা করছে—জাপান ক্ষুদ্র পরাধীন জাতির সাহায্য করছে মাত্র।

একথাও বলা হয় যে মাঞ্চুরিয়া চীনের প্রাচীন সীমার বাইরে তার স্বাতন্ত্র্য-লাভের প্রয়াস দোষের নয়। লীটন্ সমিতির মতামত এ সম্বন্ধে প্রণিধান-যোগ্য। সমিতির সভ্যেরা জাপানের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন কিন্তু তাঁরা পর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে দেশে কোন আন্দোলন নেই; জাপানের আশ্রিত হয়েও অধিবাসীরা চীনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করতে কিছুমাত্র ব্যগ্র নয়; সে অঞ্চলে তথা-কথিত জাতীয় দল জাপানেরই উৎসাহে উদ্ভূত ও এখন পর্য্যন্ত মুষ্টিমেয় মাত্র। বস্তুতঃ মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতার পিছনে জাতীয় কোন প্রেরণা নেই—জাপানের স্বার্থসিদ্ধিই এর ভিত্তি। তা না হলেও চীনের সীমানার মধ্যে অকস্মাৎ জাপানের এই পরোপকার সাধনের প্রবৃত্তির প্রশংসা করা শক্ত—কারণ সর্ব্বত্র এর অনুকরণ চল্‌লে মঙ্গলের চেয়ে বিপদের সম্ভাবনাই বেশী।

উপরের যুক্তি তিনটি after-thought মাত্র। জাপানের চীন আক্রমণের আসল কারণ মাঞ্চুরিয়া অঞ্চলে আপনার স্বার্থ সংরক্ষণ। মাঞ্চুরিয়া জাপানের আর্থিক উন্নতির পথে যে কত বড় সহায় সে কথা বোঝা সহজ। কিন্তু যে উপায়ে আজ জাপান সে উদ্দেশ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে তার ফল জাপান ও সমস্ত জগতের পক্ষে বিষময়। মাঞ্চুরিয়া অধিকার করতে গিয়ে সকল পৃথিবীর বিরাগভাজন হওয়া কি পরিণামে মঙ্গলজনক? নবীন চীনের সঙ্গে অন্তহীন দ্বন্দ্ব কি এতই বাঞ্ছনীয়? এমেরিকা, চীন বা অন্য দেশে জাপানী বাণিজ্যের সবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা কি নিতান্ত অল্প? জাতিসঙ্ঘের আদর্শ ধ্বংসের জন্য দায়ী হওয়া কি গৌরবের কথা? জাপানের প্রকৃত বন্ধু ও স্বয়ং জাপানীদের এসব কথা ভেবে দেখবার সময় এসেছে।

শ্রীসুশোভন সরকার

ঝড়

(এল্, এ, জি, ষ্ট্রং হইতে)

মুখে ভীষণ ভ্রূকুটী, বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে এবড়োখেবড়ো সরু পথ দিয়া সে চলিতে লাগিল। তারপর খোলা জমি, খানিক দূর গিয়াই সে রাস্তা ছাড়িয়া চড়াই ধরিল। আশেপাশে এখানে ওখানে ছোটখাটো কাঁটা-ঝোপ। মনের ভিতরকার রাগের চোটে উরুর উপর অমানুষিক চাপ দিয়া চলায় নরম ঘাসে তাহার পা বসিয়া যাইতে লাগিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া সে চড়াই উঠিতে লাগিল। থমথমে আকাশ—একবার সে-দিকে চাহিয়াও দেখিল না ; তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া স্বেদস্রাব—সে-দিকেও দৃক্‌পাত করিল না। রুদ্ধ আক্রোশে তাহার মন ভারাক্রান্ত।

খানিক পরে চড়াই শেষ হইলে কষ্টের অবসান হইল। নিরবলম্ব মেঘের মত তখন সে স্বচ্ছন্দ গতিতে ছুলিয়া চলিল। হঠাৎ একটা হালকা হাওয়া উঠিয়া তাহার কপাল ছুঁইল। প্রচণ্ড বিরাগ সত্ত্বেও তাহার স্নিগ্ধ আদর সে অর্দ্ধসচেতনভাবে স্বীকার না করিয়া পারিল না। অথচ তাহার মনের ভাব তখন উপশান্তি বা লাঘবতার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাই সে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। সামনের বড় রাস্তা তখনও কিছু দূরে। অধীর পদতাড়নায় এই দূরত্বকে সে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রাস করিতে চায়। পাকা রাস্তার উপর তাহার বুটের লোহা কয়েকবার খট্‌ খট্‌ করিয়া উঠিল। এক লাফে সে মাঠের ভিতর পড়িতেই সবুজ তৃণের আস্তরণের মধ্যে সে শব্দ বিলীন হইয়া গেল।

কিছু দূরে ছুটী কুলি রাস্তা মেরামত করিতেছিল—অবরুদ্ধ বাতাসে তাহাদের একজনের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট শোনা গেল।

"জো! ঝড় আসছে!"

জোর সঙ্গী বলিল, "হুঁ! বাজ পড়তেও পারে।"

উহার স্বর বেশী গম্ভীর, কিন্তু কম স্পষ্ট।

পথিক তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিল না—আকাশের দিকে চাহিয়াও দেখিল না। সূর্য্যের নিষ্প্রভ আলোকে যেন লজ্জার আভাস। উপত্যকার উপরে চারিদিক হইতে বিরসাকৃতি মেঘেরা আসিয়া জড় হইতেছে, তাহাদের প্রান্ত মেডেনহেয়ারের পক্ষ্মের মত সূক্ষ্ম। ত্রস্ত বিহঙ্গ-

কুল আতঙ্ক-বিহ্বল ;—তাহাদের কলনাদে নিরাশার কাতরতা। কিছুই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পথিক চলিতে লাগিল।

একটী নারী। কাছে থাকিলে সমস্ত দেহমন তাহাকে একান্তে চায় কেন? কাছে না থাকিলেই তাহাকে একবারও মনে পড়ে না, এই বা কি রকম? কেন, কেন এ ঝঞ্ঝাট! দূরে গেলে তাহাকে চেনাই যায় না, যেন তাহার অন্তরাত্মা সুদ্ধ বদলাইয়া যায়। যখন তাহার কাছে থাকে, কি শান্ত, তাহাকে খুসী করায় মেয়েটীর কি আগ্রহ! ভুলিয়াও একবার জোর করিয়া কোন কথা বলে না। খুব যেন সুখী, তাহার অসন্তুষ্টির যেন কোনও কারণই নাই। অথচ, একবার যদি চোখের আড়াল হইল, অমনি চিঠি, আর তাহাতে ছুনিয়ার যত খুঁতখুঁতি, যত আপত্তি। "কেন ও কথা বল্লে?" ('ভ্যালা, যা হোক, আমার মনে আছে নাকি?') "কেন ও কাজ করলে?" ('বেশ করেছি, আলবৎ করব') "কেন এ কাজ করলে না?" "আমায় অপমান করছ? বেশ না হয় মূখ্যু আছি, জানই ত বাপু আমি মূখ্যু, তা আমায় অপমান করার কি দরকার ছিল?" ('আঃ জ্বালা, আমার একমাত্র কাজই কি তোমার সমালোচনা করা?')······যখন কাছে থাকে হাসির ঝরণা, দূরে গেলেই তাহার প্রত্যেকটী কাজে আপত্তি!

আর এই যে অভিযোগ, মোটেই ঝাঁঝালো নয়—ভাবিতে ভাবিতে পাথরে হোঁছট খাইয়া সে বেশ গালভরা দিব্য দিল—কেবল অসহ্য ছিঁচ্‌কাঁদনে মেয়েলিপনা! "আমি জানি আমি তোমার নেহাৎ অযোগ্য—তোমার পায়ের ময়লা হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবু আমাকে অমন ঠাট্টা কোরো না, আমার প্রেমকে উপহাস কোরো না।" সব নিপাতে যাক।

আকণ্ঠ রাগে গরগর করিতে করিতে, দাঁতে দাঁত ঘসিতে ঘসিতে সে পথ চলিতে লাগিল। কি অসহ্য ন্যাকামি! এতটুকু আত্মসম্মানও কি নাই? সোজা হইয়া একবার দাঁড়াইতেও কি সে জানে না? কিন্তু সত্যই সে পারে না—না চোখের সামনে, না চিঠির কাগজে। শুধু অন্তহীন অভিযোগের বোঝা ; তাও সামনাসামনি কিছু বলার সাহস নাই। একবারও কি কিছু বলার মত বলিয়াছে? একবার সে একটু মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল—ঝোঁকের মাথায় টানিয়া বডিস একটু ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। তাতেই কি ছাই আপত্তি করিল! সেফ্‌টিপিন আঁটিয়া বসিয়া বোকার মত হাসিতে লাগিল। হাঁ, যদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিত, কি মুখে এক ঘা কসিয়াও দিত, তাহা হইলে না হয় বাহুবন্ধে নিষ্পেষিত করিয়া, উষ্ণ চুম্বনে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ছুর্বিনীতা প্রিয়াকে

বশ মানাইত। মাঝে মাঝে একটু আধটু কড়া কথা নইলে চলে কি? সে চায় এমন নারী যে তাহার সহিত সমানে যুদ্ধ করিবে, তাহার উদ্দাম আবেগের সহিত পাল্লা দিবে। এমন স্ত্রীর দ্বারা পরিচালিত হইতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ বেতসলতা লইয়া সে করিবে কি? এ না পারে মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইতে, না জানে বেশ চোখা চোখা কথা বলিতে। "আমি তোমার অনেক নিচে, তাই আমাকে অশ্রদ্ধা করো। তোমার কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি, তার এই প্রতিদান! কেন, আমি কি রাস্তার মেয়েমানুষ?" রাস্তার মেয়েমানুষের সম্বন্ধে কি জানে সে? কেমন হয় রাস্তায় দাঁড় করাইয়া দিলে—কেবল কথা, আর কথা, শুধু কথাই জানে।

ঠিক এই রকম একখানি চিঠি তাহার হাতে। চলিতে চলিতে সে দোমড়ানো চিঠিখানি সমান করিতে লাগিল। হাতের ঘামে জায়গায় জায়গায় লেখা মুছিয়া গিয়াছে—যাক্ এ রসপাত্র ছুবার চাখে কার বাবার সাধ্য! আগাগোড়া একই কথা কেবল ওজর আর আপত্তি—কেবল অসহ্য প্যানপ্যানানি। না, চাঁদ, আর তোমায় এমন চিঠি লিখতে দেওয়া হবেনা। আগে আগে এই রকম চিঠি পাওয়ার পর রাগে সে ছু এক দিন আর দেখা করে নাই; তাই দেখা হইলে তার রূপের আকর্ষণে রাগের কথা ভুলিয়াও গিয়াছে; ডেজীর সান্নিধ্যে তাহার সর্ব্বাঙ্গে কামনার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এ কামনায় তাহার অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। তাহার মা যে তাহাকে খোঁচা দিয়া অনুক্ষণ বলিবে ডেজী তাহার উপযুক্ত নয়—ডেজীকে বিবাহ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে না, এ কথা সে শুনিতে চায় না। অথচ এই ছুর্দ্ধর্ষ আকর্ষণের হাত হইতে সে কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছে না। ডেজী ভাল তাহাকে বাসে; সেও কি করিয়া বলিবে বাহুপাশে বন্দিনী ডেজীকে ভালবাসে না? ডেজীকে দেখিলেই তাহার সব সংশয় কোথায় মিলাইয়া যায়; আবার ডেজীদের বাড়ীর গলির মোড় ফিরিলেই কুণ্ডলীকৃত সাপের মত সব সংশয় ভিড় পাকাইয়া আসে।

এবার কিন্তু আর না। এই শেষবার। আবার ঐ চিঠি! ছুপুর বেলায় এক বোঝা কাঠ আসিবে। তাহার আগে কোনও কাজ নাই। ভালই হইল। রাগের প্রথম অবস্থায়ই সে ডেজীর সঙ্গে দেখা করিয়া একটা হেস্তনেস্ত করিবে। মাথার উপরে পুঞ্জীভূত মেঘ; মনের ভিতর ক্রোধের পুঞ্জীভূত বাষ্প। তাহার মানসিক অবস্থার সঙ্গে প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য। হন্ হন্ করিয়া চলিতে চলিতে সে অবাক হইয়া ভাবিল, খড়ের আগুনের মত তাহার রাগ দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াই নিভিয়া যায়; আজ ত এতক্ষণ ধরিয়া তুষের আগুনের মত তাহার

অন্তরে ক্রোধের বহ্নি জ্বলিতেছে। সে আগুনের হল্কায় তাহার মন যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

বড় রাস্তা মাইল ছুই পিছনে পড়িয়াছে। তাহারই উপর দিয়া একখানি মোটর চলিয়া গেল; তাহার হর্ণের বিকট শব্দ শোনা গেল—সামনে কোন বন্ধনমুক্ত ঘোড়া পড়িয়া থাকিবে। মেরিভেল পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময় তাহার গিয়ার বদলানোর শব্দ পর্য্যন্ত অতি স্পষ্ট শুনিতে পাইয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল। তাহার পরিবেষ্টনীর সম্বন্ধে সচেতন হইয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল। সূর্য্য প্রায় অদৃশ্য—আকাশ কাঁচা চামড়ার মত ঘোলাটে। উপত্যকার উপরে কালো মেঘের স্তূপ প্রাসাদচূড়া রচনা করিয়াছে। বৃষ্টি পড়িবে। বেশ ত।

আরেকটা চড়াই—তাহার পরেই ডেজীর বাড়ী দেখা যাইবে। সে জোরে পা চালাইল—এই ত আসিয়া পড়িয়াছে। ঐ যে! বুদ্ধি বটে, এই ঝড়ের মুখে কাপড় শুকাইতে দিতে বাহিরে আসিয়াছে। কই, এখনও দেখিতে পায় নাই বুঝি? নিঃশব্দ পদসঞ্চারে যুবতীটীর দিকে সে আগাইয়া চলিল। কি নীরেট আহাম্মক—এই সময়ে কাপড় শুকাইতে দেয়!

একখানা চাদরের ব্যবধানে। চাদরখানা লইয়া একটু অসুবিধায় পড়িয়াছে। দড়ির উপর কিছুতেই চাদরখানা থাকিতেছে না। ডেজী শান্তভাবে চাদরটাকে বাগাইয়া আটকাইয়া দিল। এইবার বাড়ীর ঠিক সামনে। যাঃ দেখিয়া ফেলিল বুঝি। এক মুহূর্ত্ত একটু অবাক হইয়া ডেজী তাকাইয়া রহিল—যেন নিজের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। পর মুহূর্ত্তেই ডেজী উৎফুল্ল হইয়া ছুটিয়া আসিল। "ডেভ্ না কি! আজ হঠাৎ এ রকম অসময়ে যে। এস না গো—ভেতরে এস। তোমায় দেখে বড্ড আনন্দ হচ্ছে।"

ডেজীকে দেখিয়া ক্ষণিকের জন্য ডেভ্-এর রাগ পড়িয়া আসিল। ডেজীকে আলিঙ্গন করিবার ছুর্জ্জয় কামনা তাহার সর্ব্ব অঙ্গ যেন শিথিল করিয়া দিল। কিন্তু না:—চিঠি ত ভোলা যায় না—ডেভের মনের মধ্যে রাগ আবার ঘনাইয়া আসিল। দাঁতমুখ খিঁচাইয়া সে ডেজীকে বলিল "এই হতভাগা চিঠির জন্মে এসেছি!" হাতে তখন ডেজীর সেই দোমড়ান চিঠি। আনন্দের উচ্ছ্বাসে ডেজী তাহা দেখিতে পাইল না। নিজের মনে অজস্র বকিয়া চলিল। "আঃ, চল না ঘরের ভেতরে। এদ্দূর থেকে তেতে পুড়ে এসেছ, একটু জিরোও—"

"দেখছ এই চিঠি?" বলিয়া ডেভ্ ডেজীর চোখের সামনে চিঠিখানা ধরিল। ডেজী একবার দেখিল, কিন্তু ডেভের রাগের কারণ বুঝিতে

না পারায় বলিল, "ওঃ, আমার চিঠি! ও ছাই আবার পড়ছ কেন? কিন্তু তুমি এলে আমার যা ফুর্ত্তি হয়!" মেয়েটা কি উন্মাদ নাকি? এতটুকু বুদ্ধিও কি ঘটে নাই?

"শোন, এই চিঠির জন্যে তোমার কাছে এসেছি।" কটমট করিয়া ডেজীর দিকে তাকাইয়া ডেভ্ বলিতে লাগিল, "তুমি আমার নামে অনেক নালিশ করেছ! তোমায় নাকি অসম্মান করেছি! আরও কত কি!" উত্তেজনায় ডেভী ফুঁসিতে লাগিল। "শোন, তুমি ক্রমাগত এই রকম চিঠি লিখবে, আর আমি মুখ বুজে সহ্য করে যাব—এ হবে না। আমি শেষবার বলে দিচ্ছি—এ চলবে না।" ডেভের কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শান্ত, সংযত।

এতক্ষণে ডেজী বুঝিতে পারিল। সে মাথা একটুখানি পিছনে হেলাইয়া করুণ দৃষ্টিতে একবার ডেভের দিকে চাহিল। অন্য সময় ডেজীর মাথা হেলাইবার এই ভঙ্গীটী ডেভের কাছে বড় মধুর ঠেকিত, আজ ইহাই তাহার কাছে অসহ্য ন্যাকামি বলিয়া বোধ হইল।

"ওঃ ওই চিঠি! ডেভী তোমায় মিনতি করি ও চিঠি তুমি ছিঁড়ে ফেলো—ও চিঠি আর পড়ো না। কি ছাই সব লিখেছি ওতে—ওর কি কোনও মানে আছে? একটু ঠাণ্ডা—"

"যদি মানেই না থাকে, ও চিঠি লিখতে তোমায় মাথার দিব্যি দিয়েছিল কে?"

"তোমার দুটী হাতে ধরি, ডেভী, চল না!"

"গোল্লায় যাও! ফি বার এই রকম চিঠি লেখ কেন, বলবে?" ডেভের নির্ম্মম আঘাতে ডেজীর চোখে ব্যথার ক্ষীণ আভাস ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না। "চল না লক্ষ্মীটী ভেতরে।" "এর পরের চিঠির জন্যে কথা জমা হচ্ছে বোধহয়।" বিকৃত স্বরভঙ্গী করিয়া ডেভ্ ডেজীর চিঠি হইতে পড়িতে লাগিল—"তুমি বাজারের মেয়েমানুষের মত আমার সঙ্গে খারাপ কথা বল।' কেন আমার মুখের সামনে বলতে কি হয়! নাঃ তা করবে কেন? চিঠির কাগজে না হলে কি কাঁদা যায়? অসহ্য!" ডেভের আয়ত নীলাভ চক্ষুতে অশ্রু ফুটিয়া উঠিল।

"ওগো, ওগো আমার খুব অন্যায় হয়েছে। তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে বলছি আর কখনও ও রকম চিঠি লিখব না। তুমি ত জান আমি কি একা! শুধু বাবা আর আমি। মা নেই যে বুদ্ধি দেবে। তুমি চলে গেলে খালি মনে হয় মা যা শেষ বলে দিয়েছিল!" ডেজীর কপোল বাহিয়া অঝোরে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

"কি বলেছিল তোমার মা? কখন?"

"মৃত্যুশয্যায়।"

ডেভ্ একটু অপ্রতিভ হইল। কিন্তু না—রাগকে সে আজ জীয়াইয়া রাখিবে। আবার কান্না! ন্যাকামি!

"দেখ, বেশ ভেবে চিন্তে বেছে নাও—হয় তোমার মা, নয় আমি। হয় তোমার মুখ বন্ধ হবে—কিন্তু মুখ ত তোমার বন্ধ হবে না—মুখ তোমার থামবে না—আমার প্রতি কাজে দোষ ধরবে, আর মরা মার নাম ক'রে চোখের জল বের ক'রে আমায় ভোলাবে ভেবেছ? কিন্তু আমি ভুলছি না আর। সব দোষ তোমার, তোমার, তোমার।" ডেভ্ চেঁচাইতে লাগিল—কথাগুলি কুৎসিত শোনাইল, তাহাতে সে মরীয়া হইয়া উঠিয়া আরও কদর্য্য ভাষায় ডেজীকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল।

টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িল। ডেজী এত দুঃখের মধ্যেও উদ্বিগ্ন হইয়া মেলা কাপড়গুলির দিকে একবার চাহিল। ও কি সাংঘাতিক কেজো মেয়ে! ডেভ্ ডেজীর দিকে আগাইয়া আসিল। তাহার ক্রোধবিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া ডেজী ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। "ডেভ্" বলিয়া ডেজী তাহাকে কণ্ঠলগ্ন করিবার জন্য তাহার দুই বাহু বাড়াইল। "ডেভ্! বটে!" বলিয়া ডেভ্ জোর করিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া লইল, "কাছে থাকলেই ডেভী, ডেভী, আর দূরে গেলেই—আমি বদমাইস! মা মরা কচি মেয়ের ওপর জুলুম করি। একদিন জুলুম কাকে বলে—"

ডেজীর কোমল মসৃণ স্কন্ধে ডেভের নখ বসিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্রিয়ের কামনা মানুষকে কত হিংস্র করিয়া তুলিতে পারে জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া ডেভ্ একটু আতঙ্কিত হইল—খুসীও যে হইল না তাহা নয়। ডেজী তাহার দেহযষ্টি ঋজু করিয়া তুলিয়া ডেভের সামনে এক অভিনব নারীত্বের গৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়া শান্ত, ধীরভাবে শুধু বলিল, "বেশ ব্যথা দিতে চাও, দাও, হ্যাঁ দাও।" দাঁত মুখ খিঁচাইয়া ডেভ্ বলিল, "উঃ কি সয়তানী! বেটাছেলেকে অপ্রস্তুত করতে কি চমৎকার জানে!" হঠাৎ ডেজীকে ছাড়িয়া দিয়া সে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া সে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে সুরু করিল।

ব্যাস্, আপদ চুকিয়া গেল। নাঃ ডেজীকে সে কিছু বলে নাই; ডেজী ত বলিতে পারিবে না যে সে তাহাকে মারিয়াছে। তাহাকে ফেলিয়া চলিয়া যাই, এই সব চেয়ে ভাল পন্থা। বটে! আমাকে দৌড়াইয়া ধরিবে। দেখ না। বেশ হইয়াছে। এখন কুকুরের মত হাঁফাক। ডেজী তাহাকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছে। দু'একবার ডেজীর কাছে ধরা না দিয়া

দৌড়াইয়া এড়াইয়া তাহার মনে হইল নেহাৎ ছেলেমানুষী হইতেছে। দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে বলিল, "বেশ ! কি চাও বলত !"

হাঁফাইতে হাঁফাইতে ডেজী বলিল, "ওগো তোমার তুটী পায়ে পড়ি আমায় ফেলে রেখে অমন করে চলে যেও না। তোমার যা ইচ্ছা করো আমি বাধা দেব না। মারো, আমায় মারো, আমি তাই চাই।" উত্তেজনায় ডেজী কাঁপিতেছিল। বিস্রস্তবেশ ডেজীর ব্লাউজের ফাঁক দিয়া তাহার অনাবৃত বক্ষস্থলের আক্ষোভ দেখা যাইতেছে — তাহার উষ্ণ নিঃশ্বাস ঝলকে ঝলকে ডেভের মুখে আসিয়া লাগিতেছে। সেই মুহূর্ত্তে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করিবার এক তুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা ডেভের সর্ব্ব অঙ্গে যেন এক বন্যা আনিয়া দিল। প্রবল চেষ্টায় আত্মসংযম করিয়া ডেজীর অনাবৃত কাঁধে হাত রাখিয়া ডেভ দাঁড়াইয়া রহিল। শ্রান্তিতে ডেজীর মাথা হেলিয়া পড়িয়াছে—ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধর ; নাসাপুট স্ফুরিত হইতেছে। ডেভ্ সভয়ে চক্ষু মুদিল। অতি ধীরে ডেভ্ বলিল, "না না তুমি নয়"। ডেজী ডেভের আরও কাছে ঘেঁসিয়া আসিয়া বলিল, "ডেভি, তোমার যা ইচ্ছে করো, আমার দেহের উপর অত্যাচার করো, কিন্তু দোহাই তোমার চোখ বুজে থাকো না। আমার বড্ড ভয় করছে। লক্ষীটী একবার তাকাও। শুন্‌ছো ? সত্যি শুন্‌ছো ? তোমার তুটী পায়ে পড়ি একবার তাকাও।" নিষ্পন্দ ডেভ্‌কে দেখিয়া আতঙ্কে ডেজী চীৎকার করিয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ ডেভের মুখে এলোপাতাড়ি ঘুসি মারিতে লাগিল।

ডেভ্ একটু হাসিয়া নির্বিকার চিত্তে ডেজীর শিলাবৃষ্টির মত আঘাত সহ্য করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের সঙ্গে গায়ের জোর খাটাইয়াই বা লাভ কি ? আচ্ছা রাগের মাথায় পাথরে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে না ত ? মরুকগে। ডেভ্ চোখ বুজিয়াই রহিল।

আস্তে আস্তে পা সরাইয়া সে একবার খপ্ করিয়া ডেজীকে বেশ শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিল। তার পর বেশ জোরে একবার দম লইয়া তাহার সমস্ত দেহের শক্তি দিয়া ডেজীকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ধুপ্ করিয়া ডেজী ঘাসের উপর গড়াইয়া পড়িল, যন্ত্রাণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল। কপাল ভাল, পাথরের উপড় পড়িয়া মাথা ফাটে নাই।

তার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একবার চোখ মেলিয়া চাহিল। তার পর দৌড়। প্রথমে বেশ জোরে, তার পর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৈত্যের মত। চোখ বুজিয়া থাকিতে হইবে নইলে ওদের মায়া কাটানো যায় না। মনে পড়িল ইস্কুলের বইয়ে কাহার কথা পড়িয়াছিল, যে এমন অবস্থায় কান বন্ধ করিয়াছিল। চোখ বোজা কিন্তু তার চেয়েও ভাল।" ডেভী ! ডেভী ! নাঃ শোনাও ত আর যায় না। চোখ কান তুই বুজিতে হইবে। পাগলের

মত চীৎকার করিতে করিতে ডেভ্ ছুটিয়া চলিল। হোঁচট খাইয়া, কাঁটা ঝোপে পড়িয়া গিয়া পা দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। পথের পাশ হইতে গরু ঘোড়া ভয় পাইয়া পালাইয়া গেল। বিকৃত মুখভঙ্গী করিতে করিতে সরু পথ দিয়া সে তীর-বেগে ছুটিয়া চলিল। একবার পা ফস্‌কাইলে হয়ত হাত পা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে। মস্ত এক ফোঁটা জল তাহার চোখের পাতায় হঠাৎ আসিয়া আচমকা এমন এক ধাক্কা মারিল যে সে একটু থতমত খাইয়া চোখ মুছিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিয়া একটু যেন প্রকৃতিস্থ হইল। আকাশের ভীষণ মূর্ত্তি !

আকাশ যেন সীসার পাতের ছাত, তাহার কোথাও ঘোলাটে কমলা রঙ্গের, তাহারই পিছনে ঘন নীল, ধূসর, গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণ, নানান রঙ্গের মেঘ ভিড় পাকাইয়া আসিতেছে। দূরে উপত্যকার উপরে ঘন মেঘের প্রাসাদ। ছোট ছোট পাৎলা মেঘের টুকরা এই মেঘস্তূপে কখনও আসিয়া লাগিতেছে, কখনও বা খসিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার ঠিক দক্ষিণে এক রাশ বেগুনী ও নীল রঙ্গের মেঘ যেন কলহপ্রিয় রমণীর মত অঞ্চল আন্দোলিত করিয়াই মুহূর্ত্তে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অঙ্গে জড়াইয়া লইয়া। দূরে এক টুকরা মেঘ কোন্ দিকে যাইবে ঠিক করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের জন্য যেন স্থির হইয়া কি ভাবিল, তাহার পর অকস্মাৎ মাটির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার নিচে অন্ধকারের ঘন যবনিকা সমস্ত বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দিল। প্রান্তরের দিক হইতে শীতল বায়ুর প্রবাহ ডেভের দিকে ছুটিয়া আসিল—ভীষণ মেঘের স্তূপ নামিয়া আসিবার আগেই যেন সেখানকার সব হাওয়া পালাইয়া যাইতে চায়। সমস্ত পৃথিবী যেন আসন্ন বিপদের ভয়ে চোখ বুজিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

ডেভ আর একবার হাসিয়া আবার নিচের দিকে ছুটিতে লাগিল। ভ্রূকুটীকুটিল আকাশের দিকে চাহিয়া ডেভ্ বলিল, "দেবো, আজ ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা। ভিজবার আগে নিচের আশ্রয়ে পৌছাবোই।" আরও জোরে ডেভ্ ছুটিতে লাগিল। তাহার পায়ের নিচে সরু ফিতার মত রাস্তা জাগিয়া রহিয়াছে। আসিবার সময় যে তুই বুড়াকে দেখিয়াছিল তাহারা বোধহয় মাথা গুঁজিবার জায়গা খুঁজিয়া লইয়াছে। ঘরের মধ্যে বসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা কি রকম ঘাবড়াইয়া গিয়াছে ভাবিতে ডেভের ভারী হাসি পাইল। গরম বাতাসে তাহার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে ; আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া তাহার মাথায় পড়িতে চায়। যাক্। এই ত পথ ! পা তুটা যেন একটু আড়ষ্ট হইয়া আসিল না ? দোষই বা কি ? তিন মাইল ত প্রায়

হইল, তার উপর কত দিনের অনভ্যাস। কিন্তু হ্যারি শুনিলে বলিবে কি? হ্যারি বুড়ো যে বলে এখানে হাঁটা খুব সোজা।

বাঃ এই ত! উঃ। আর কতটুকুই বা? উঃ আর ত পারি না। চুলোয় যাক। এইবার! নিঃশ্বাস যে আর চলে না। মুখের ঘাম চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিতেছে। যাক, নামিবার সময় অনেকটা সহজ। উঃ, চোখেও ত আর দেখা যায় না। শেষে পা দুটাও যাইবে না কি?

পথ ত মিলিল। টলিতে টলিতে সে ছুটিতেছে। ভীষণ পরিশ্রমে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। শুধু নিজের কণ্ঠস্বরে তাহার বিশ্বাস হইতেছে সে এখনও বাঁচিয়া আছে। ও কিছু না। বিশ্রাম করিলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে।

অন্ধকার! আকাশের দিকে চাহিয়া ডেভ্ দেখিল কালির মত আকাশ—যেন একটা মস্ত কাফ্রির মুখ নিচের দিকে তাকাইয়া আছে। আকাশ তাহার দিকে চাহিয়া যেন ভীষণ ভ্রূকুটী করিল—সে চাহনি দেখিতে না পারিয়া সভয়ে ডেভ্ চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল। এক নিমেষে সমস্ত দৈত্যপুরীর কাড়ানাকাড়া বাজিয়া উঠিল। তার পর সে কি প্রবল ধারায় বৃষ্টি! বিদ্যুতের তীব্র আলোতে ডেভের চোখ ধাঁধিয়া গেল, বজ্রের ভীষণ নির্ঘোষ ডেভের কানে তালা লাগাইয়া দিল। মুষল-ধারে বৃষ্টি আসিয়া ডেভের মুখে সজোরে আঘাত করিতে লাগিল, যেন শত শত দৈত্য নিষ্ঠুর উল্লাসে মাতিয়া ডেভের মুখে জলের ধারা ছুঁড়িয়া মারিতেছে। বৃষ্টি! অসম্ভব! এ শুধু বৃষ্টি নয়। নিশ্চয়ই দেখিতে না পাইয়া সে নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ডুবিয়া মরিতে হইবে। নিস্তার নাই।

বৃষ্টি! চারিদিকে বৃষ্টির অভেদ্য প্রাচীর। বিদ্যুতের অবিরত ঝলক খড়খড়ির ফাঁক দিয়া আলোর ঝলকের মত বৃষ্টির প্রাচীরে আসিয়া আহত হইতেছে। বৃষ্টির অশ্রান্ত কল্লোলে যেন বজ্রনিনাদও মিলাইয়া যাইতেছে।... সহসা বৃষ্টির এই প্রাচীর যেন মন্ত্রপ্রভাবে অন্তর্হিত হইয়া গেল। নিচে বনের মধ্যে তখনও বৃষ্টির কলরোল। ডেভ্ দেখিল সে হামাগুড়ি দিয়া একটা ঝোপের দিকে যাইতেছে—মাথার উপর আকাশ তখনও মসীবর্ণ।

অতি সন্তর্পণে সে কোনও মতে উঠিয়া দাঁড়াইল—কালো আকাশের গায়ে যেন খড়িমাটি দিয়া লেখা যায়। আচ্ছা এ রকম অদ্ভুত খেয়াল তাহার মাথায় আসিল কেন? নিশ্চয়ই ঐ বিদ্যুৎ দেখিয়া।...আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তার পর কেমন যেন একটা তীব্র বিকট আলোর বন্যার মধ্যে সে তলাইয়া গেল। তাহার চোখের সামনে একটা

গাছ—তাহার সমস্ত শাখাগুলি এক মুহূর্ত্তে গলা রূপার মত সাদা হইয়া উঠিল—তাহার পরেই আস্তে আস্তে কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল। এক মুহূর্ত; তার পরেই অন্ধকারের গভীরতার মধ্যে ডেভ্ ডুবিয়া গেল। নানান রঙের চরকি তাহার চোখের সামনে আলোর ফুল্‌কি ছিটাইয়া ঘুরিতে লাগিল—ঘোরার শব্দ যেন তাহার কানে আসিয়া লাগিতেছে। তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমিয়াছে। উঃ, এই বুঝি ফট্ করিয়া মাথা ফাটিয়া গেল—রক্তে তাহার সমস্ত চোখ মুখ ভিজিয়া গিয়াছে। কই না? রক্ত ত এত ঠাণ্ডা হয় না। বোধহয় বৃষ্টি! হাঁ, তাই ত। তবে ঝড় ত এখনও থামে নাই—কিন্তু কমিয়াছে, নইলে সে ডুবিয়া যাইত।

উঃ, ভগবান। রক্ষা করো। আর ত পারি না। কোথায় সে? খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া ভেজা ঝোপের ভিতর হইতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল—দেখিল তখন পর্য্যন্ত সে অক্ষত। আকাশ নির্ম্মেঘ, বৃষ্টি অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে—বৃষ্টি-ধৌত প্রকৃতি সূর্য্যের কিরণে হাসিতেছে। ঝড়ের অবসানে পাখীরা আনন্দে দিশাহারা হইয়া গাহিতেছে। একটু শ্রান্ত! কিন্তু মনে তাহার কোনও অবসাদ নাই; চলিতে চলিতে সে লুপ্ত শক্তি যেন অনেকটা ফিরিয়া পাইল। তাহার সম্মুখে একটা পাখী হঠাৎ আকাশে উঠিয়া তাহার আনন্দের প্লাবনে সারা আকাশকে যেন ডুবাইয়া দিল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল—ডেজী।

ঝড় তাহার ক্রোধ নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে। ধীর সমাহিত চিত্তে তাহার আত্মবিস্মৃতির কথা ভাবিতে বসিয়া সে লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। ডেজীর কি হইল। হয়ত ঝড়ে অজ্ঞান হইয়া কোথায় পড়িয়া আছে। হয়ত ভয়ে জাগিয়া উঠিয়া দৌড়িয়া পালাইতে গিয়া তার মাথায়···না, এ অসম্ভব। নতজানু হইয়া ডেভ্ ডেজীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"ভগবান! তুমি এ অযোগ্য সন্তানের প্রাণ ত রক্ষা করিয়াছ। সন্তান কিসে—এই পশুর। যে স্ত্রীলোককে আঘাত করিতে পারে—তাহাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে সে পশু না ত কি?—এই পশুর প্রাণ রাখিয়াছ, ডেজীকে বাঁচাও। তুমি ত জান ডেজী আমার কি। সেই ডেজীকে আমি নিজের হাতে হত্যা করিলাম।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ডেজীর বাড়ীর দিকে ছুটিল। নিশ্চয়ই তাহাকে ভূতে পাইয়াছিল। সে কি না ডেজীর অনিন্দ্য শিশুমনকে অমন করিয়া আঘাত করিয়াছে। ডেজী তাহাকে এত ভালবাসে যে সে চাহিলে, এমন কি আছে যাহা ডেজী দিতে পারে

না? সে চলিয়া আসিলে তাহার মরা মার কথা ডেজীর মনে পড়ে। তাহার মা তাহাকে কি বলিয়া গিয়াছিল—সে তখন এত ছোট সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই—তাই তার মৃত মাতার স্মৃতি পাছে অপমানিত হয়, পাছে না জানিয়া সে তাহার মার অনভিপ্রেত কিছু করিয়া বসে, তাই ত তার অত সংশয়। ডেভী চোখ বুজিয়া ডেজীর মার মৃত্যু-শয্যার ছবির উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইল। বিশীর্ণ আসন্নমৃত্যু রোগী; একটী কিশোরী সজলনেত্রে তাহার পাশে বসিয়া মাতার প্রত্যেকটী অনুযোগ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। "হাঁ মা, যা বলছ তাই হবে; না, তা কখনও করবো না।" সে কেমন করিয়া অমন অন্ধ হইয়াছিল? ডেজী বাঁচিয়া আছে ত? ভগবান শুধু তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ, আমার পাপের জন্য তাহাকে শাস্তি দিও না। শুধু যদি ডেজী বাঁচিয়া থাকে, তাকে কত সোহাগই না করিবে—ভাবিতে ভাবিতে ডেভ্ ডেজীর বাড়ীর দিকে চলিল।

ঝড় বন্ধ হওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ডেজী আবার ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে বাহিরে আসিয়াছে। হঠাৎ দেখে টলিতে টলিতে ডেভ্ তাহার দিকেই আসিতেছে। অধীর আগ্রহে ছুটিয়া আসিয়া ডেজী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। নইলে ডেভ্ সেখানেই পড়িয়া যাইত।

"ছিঃ ডেভী। এঃ একেবারে ভিজে গেছ যে। অসুখ না করে শেষে। এই সব ঝড়টা মাথার উপর দিয়ে গেছে ত? চল এখন, ঢের হয়েছে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলবে এস।"

শুষ্কমুখ ডেজীর দিকে তুলিয়া ডেভ্ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল। "ভগবান, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। যাক্ ডেজী তুমি ত ভাল আছ।"

ডেজী একটু অবাক হইয়া ডেভের দিকে চাহিল। ডেভ্ বলিল, "তোমার লাগেনি ত? ঝড়ের মধ্যে বাইরে ছিলে না ত?" "ঝড়ের মধ্যে? না গো না, জান, বৃষ্টি আসার আগেই আমার কাপড়গুলো তোলা হয়ে গিয়েছিল।"

"সত্যি ডেজী লক্ষ্মীটী বলো, তোমার নিশ্চয় খুব লেগেছিল—সেই আমি যখন তোমায় ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।"

"দুর।" বলিয়াই ডেজী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ডেভ্‌কে ধরিয়া চড়াই উঠিতে উঠিতে বলিল, "ডেভ্, আমি আর তোমায় কখ্‌খনও বিরক্ত করব না। তোমায় বড্ড চটিয়েছিলুল—না? আর কখ্‌খনও অমন হবে না।"

ডেভ্‌কে ধরিয়া রান্নাঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া ডেজী তাহাকে উনুনের কাছে বসাইল। ডেজী রান্নাঘরের সিঁড়ির কাছে যাইতেছে, এমন সময় নেহাৎ সুবোধ বালকের মত ডেভ্ বলিল, "ডেজী, এই সমস্ত বৃষ্টিটা আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে। জান, আমি প্রায় ডুবে গিয়েছিলুম—আর আমার চোখের সামনে একটা গাছের উপর যা বাজ পড়ল।"

ঘাড় ফিরাইয়া ডেভের দিকে চাহিয়া ডেজী বলিল, "ওঃ, যা দুর্য্যোগ।"

একা একা বসিয়া অবসাদে ডেভের শরীর যেন ভরিয়া আসিল। সে আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল—বোকার মত। ঝড় তাহার মন হইতে সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত প্রবল অনুভূতি নিশ্চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে—তাহার মনের ব্যথা ডেজীকে কেমন করিয়া বুঝাইবে—ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা। তাহাকে দেখিয়াই কেন ডেজী বুঝিতে পারিতেছে না, সে কত অনুতপ্ত। বোঝাইবার ক্ষমতা যে এখন তাহার নাই। যাক ডেজী ভাল আছে। এটাই কি কম কথা। ডেজীকে তবে মারিয়া ফেলে নাই—ভগবানের কম দয়া।

উপরের ঘরের মধ্য দিয়া ডেজী সিঁড়ির কাছে আসিল। তাহার পর ডেজীর ছোট দু'খানি পা, ক্রমে ডেজীর হাতে এক বোঝা কাপড়, সব শেষে ছোট একখানি মুখ, পরিশ্রমের রক্তিম আভা মাখা।

হাসিতে হাসিতে ডেজী বলিল, "এই নাও কাপড়—বাবার—হাঁ তোমার গায়ে হবে। ও বাবার কথা ভাবছ? নিশ্চয়ই মেরিভেলে আটকে গেছে। হাঁ গো হাঁ বাবা নিজের শরীর বাঁচাতে জানে—সবাই তোমার মত বোকা নয়।"

খপ্ করিয়া ডেজীর হাত ধরিয়া ফেলিয়া যেন শেষবারের মত নিজের কথা বোঝাইতে চাহিতেছে এই ভাবে ডেভ্ বলিল, "ডেজী শোন। সমস্ত ঝড় আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে—আমি পড়ে যাই—প্রায় ডুবে গিয়েছিলাম—আমার দু হাত দূরে একটা গাছ বাজে পুড়ে গেল।"

"ষাট ষাট। তা এখন ওঠ। ভিজে কাপড়গুলো ছেড়ে ফেল।"

"ডেজী, যখন আমার জ্ঞান হল—যখন দেখলাম আমি বেঁচে আছি, আমার ভয় হল—ভয়ঙ্কর ভয় হল তুমি ঝড়ে বাইরে পড়ে আছ—বেঁচে নেই—হয়ত আমিই তোমায় মেরে ফেলেছি।"

নাঃ, ডেজী শুনিতেছে না। শোনার দিকে তাহার মন ছিল না, তাহার দৃষ্টি তখন ঘরের ভিতর কাপড়ের আলমারির দিকে নিবদ্ধ।

"কি বোকা তুমি। তোমার ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই?" সে সহাস্যে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "বৃষ্টির অনেক আগে আমি ঘরে এসেছি।

তুমি সেই চলে যাওয়ার পরেই আমি ভিজে কাপড়গুলো নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। কি যে দেরী করছ। ওঠই নি। লক্ষ্মীটী ওঠ শীগ্‌গীর। যাও কাপড় ছেড়ে এস। তার পর তোমায় বেশ এক গেলাস গরম দুধ খাইয়ে দেব, তা হলে আর ঠাণ্ডা লাগবে না।"

আর একবার তাড়াতাড়ি করিতে তাগিদ দিয়া ডেজী অন্তর্দ্ধান করিল।

কি আর করা। ডেজী বুঝিবে না—কোনও দিনই বুঝিবে না। ডেভের মনের মধ্যে যে বেদনার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহার আঁচটুকুও ডেজীর গায়ে লাগে নাই। তবুও একথা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সে ডেজীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে। আর কখনও তাহাকে আঘাত করা চলিবে না। হয়ত সব মেয়েরই কল্পনাশক্তির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। দয়িতের কাছে তাহারা হয়ত এই রকম হাসিমুখেই সব কিছু গ্রহণ করে—নিষ্ঠুরতা, নির্য্যাতন পর্য্যন্ত। হয়ত—

ভিজা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে ডেভ্ বুঝিতে পারিল ঝড়ে তাহার মন হইতে সংশয় ও বিরক্তির বিরাট বোঝা উড়াইয়া লইয়া গেলেও ডেজীর সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই রহিয়া গেল।

শ্রীদিলীপকুমার সান্যাল

কবিতাগুচ্ছ

ভীরু

জানিনা সাঁতার ডুবিবার ভয়ে মরি,
তবু জাগে সাধ ডুবিতে সাগরে ; কত কল্পনা করি,
—অতল পরশে কি আছে তোমার,
কতনা মুকুতা-মণি-সম্ভার !
কূলে তব একা আসি'
দেখেছি উদয়-অস্ত-শোণিমা, চাঁদের অমল হাসি
বিম্বিত তব তরল মুকুর 'পরে,
দেখেছি আমার ছায়া লয়ে খেলা করে
উছল তটের উৎসুক ঢেউগুলি।
মজ্জন-ভয় ভুলি'
গহনে তোমার গাহন লাগিয়া ঝাঁপায়ে পড়িতে গিয়া,
তুষার-শীতল পরশনে শিহরিয়া,
ত্রস্ত চরণে ফিরিয়া এসেছি তীরে,
ভেসেছি অশ্রুনীরে ॥

তরণী বাহিয়া খুঁজিয়াছি পরপার,
যতদূরে যাই তত মনে হয় দিশা নাই সীমানার।
ভরা পালে আমি চলেছি ভাসিয়া,
কল কৌতুকে উঠেছ হাসিয়া :
উজানে বাহিয়া শেষে
দুরু দুরু হিয়া হয়েছে শান্ত নিরাপদ কূলে এসে।
ঢেউ পরে ঢেউ ভেঙে পড়ে সিকতায়,
জানি তারা টানি তোমার গভীরে আমারে ডুবাতে চায়।
ফেনিলোচ্ছল তুহিনপরশা বারি
কেন হেন মনোহারী ?
বিভীষিকা ভরা মৃত্যুপসরা ধরিছে কি বুকে তার
মোর তরে গাঁথা তোমার রতনহার ?
আমি নিশিদিন আহ্বান তব শুনি,
স্বপনের জাল বুনি ॥

শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

যাত্রা

অমাবস্যা-তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলি' ঠেলি' কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের মাঝে পথ করি'
চলিয়াছ সঙ্গহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?
নাহি ভয় রজনীর, বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনের নাহিকো ঠিকানা,
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত উপরি
চলিয়াছ স্থিরদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রূর হাসি আঁধারের,
জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেছে আঁধারের দুর্দ্দম জোয়ারে,
বেলাভূমি স্তব্ধ রাত্রি-আঁধারের উদ্দামপ্রণয়ে,
নিঃশ্বাস রুধিছে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, চলিয়াছ কোথা ?
কোন্ নারী কি ঐশ্বর্য্যভার
ছিনিয়া লইবে বলো বলীয়ান্ দুই বাহু দিয়া।
কোন্ দেশ লক্ষ্য তব অভিনব এ জয়যাত্রার,
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান
তোমারো যাত্রার সাথে সাথে ধায়, সেই সত্য জানো ?
তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্ত্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র একাকী করিছে ?
ভুলিয়াছ বুঝি, বন্ধু, নব নব পথের নির্ম্মাণে
পথ কভু হয়নাকো শেষ ?
পৃথিবীতে কোনো পথ আজো কভু হয়েছে কি শেষ ?
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব অমাবস্যা-তমিস্রারে ঠেলি',
দূরে দূরে ফেলি' কালো হিংস্র সাগরে
—শ্যেনকপোতের প্রেম-কূজনেমুখর কোনো নব অলকায় নহে—
নিয়ে' যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার
যাত্রা করো রোধ
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে

যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
হেরে নাই এখেনি বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন ক্রূর কালো মদমত্ত সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
ডিয়োটিমা, বলো তো বন্ধুরে।
তাই বলি আমার মিনতি
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

শ্রীবিষ্ণু দে

ভোর

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমেল চোখে
নরম ভোরে ?
দ্যাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শিখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা ?
ঘুমিয়ে রয়েছো, কতবার এল এমন ভোর
এমন আলো !—
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্ণা তলে।
আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে
শুননি বুঝি ?—
পাপ্ড়ি-হাতের নরম ছোঁয়ায় চম্‌কে উঠে'
অ্যাডোনিস্ হাসে ভোরের মতো।
এম্নি ভোরেই তেপান্তরের মাঠের শেষে
গহন বনে
রাজকন্যার ঘন কালো চুল মেঘের মতো
রাজপুত্রের স্বপনে আসে।
এম্নি ভোরেই আসে একদিন ফুলের কথা
হাওয়ায় ভেসে :
"মোর সাত ভাই চম্পা জেগেছ ?···হয়েছে ভোর"
ঘুম হ'তে জেগে পারুল ডাকে।

আরো কত কথা রূপালী বকের মালার মতো
আকাশে দোলে ;
আকাশের সেই স্বপ্নরা মরা মাটির সনে
মিশে আছে এই নরম ভোরে।

শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

আমরা কবিতা লিখি

(মার্কিন কবি কার্ল স্যাণ্ড্‌বার্গ লিখিত We Write কবিতা হইতে)

আমরা কবিতা লিখি, বিধাতার শুভ্র আশীর্ব্বাদ
মোদের লেখনী-মুখে অর্পিয়াছে অন্তহীন প্রাণ ;
মর্ত্ত্যের মানুষ মোরা শুনি তাই অমর্ত্ত্য আহ্বান,
কল্পনার পাখা মেলে উড়ে যাই উন্মুক্ত অবাধ !
প্রত্যহের ধূলি-লিপ্ত বিষ-তিক্ত গ্লানি, অপমান,
জীবনেরে করে যবে পলে পলে বিকৃত বিস্বাদ,
আমরা আনিয়া দিই ক্ষণিকের আনন্দ-সংবাদ,
ছন্দোবদ্ধ গান !

আমরা সৌন্দর্য্য-লিপ্সু, পৃথিবীরে মোরা বাসি ভালো—
দিগন্ত-প্রসারী মাঠ, নির্ম্মেঘ উদার নীলাকাশ,
প্রশান্ত নদীর ধারা, অকুণ্ঠিত স্বচ্ছন্দ বাতাস,
নিশার সীমন্ত-প্রান্তে অর্দ্ধস্ফুট নক্ষত্রের আলো ;
প্রথম পরশ-হতা কিশোরীর ভীরু ভ্রূ-বিলাস
আমরা লুকায়ে দেখি, ভালোবাসি বেণী মেঘ-কালো,
মোদের বেপথু বক্ষে অতর্কিতে ঘনায় ঘোরালো,
ভারাতুর শ্বাস !

তা ব'লে বধির নই, কানে মোরা শুনি দিনরাত
ধ্বনিছে চৌদিক হ'তে ধরণীর আর্ত্ত ক্লিষ্ট রোল ;
জীবন-দোলায় নিত্য মরণের উচ্চকিত দোল
আমরা জানিতে পারি ; দাব-দগ্ধ নির্ম্মম আঘাত,
দুঃসহ তরঙ্গ-ভঙ্গে তটে তটে তুলিয়া কল্লোল
ভঙ্গুর সঞ্চয় যত অসঙ্কোচে করে আত্মসাৎ ;—
তবু ত রজনী শেষে ডাকে আসি আসন্ন প্রভাত,
'খোল্‌ দ্বার খোল্‌' !

তনুর লাবণ্য হেরে মোরা হই উন্মাদ-বিহ্বল ;
জানি তবু রক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা, কদর্য্য কুৎসিত
আছে তার অন্তরালে ; কুসুমের সঙ্কীর্ণ সম্বিৎ
জানি ক্ষুদ্র পতঙ্গের ক্ষুদ্রতর ক্ষুধার সম্বল ;
মূর্চ্ছাতুর হৃৎ-তন্ত্রী, ভয়-ক্ষুব্ধ বিষণ্ণ চকিত,
সম্মুখে নিবিড় কালো, পায়ে পায়ে প্রহত উপল—
তবু এ ধরণী পানে চেয়ে চেয়ে চোখে আসে জল,
কণ্ঠে জাগে গীত !

জানি বন্ধু জানি মোরা, এ ধরণী নয় চিরন্তন,
তুমি-আমি তুচ্ছ কথা ; সবি হবে নিঃশেষে নিলয়,
স্তব্ধ হবে চরাচর, মহাব্যোমে ব্যাপিবে প্রলয়,
বিস্মৃতি-পাণ্ডুর হবে আজিকার উদগ্র যৌবন !
তবু এ দেহের প্রান্তে যতদিন প্রাণ-বন্ধ রয়,
ক্ষণিক খেলেনা ল'য়ে রচি মোরা অনন্ত স্বপন—
অফুরন্ত গীত-গন্ধে আমাদের নিজস্ব ভুবন
চির প্রাণময় !

ছন্দের শৃঙ্খলে মোরা রোধিয়াছি সময়ের গতি,
গ'ড়েছি চিন্ময় বিশ্ব বিস্মৃতির বারিধি-বেলায় ;
নশ্বর শূন্যতা শুধু বাহু মেলে ডাকে 'আয়' 'আয়',
সৃষ্টির আনন্দে মোরা ফিরে নাহি চাই তার প্রতি !
মোদের সঙ্গীত-রেশ কেঁপে কেঁপে তারায় তারায়,
লোক হ'তে লোকান্তরে ছুটে চলে ত্রস্ত লঘুগতি—
ভবিষ্যের স্বপ্ন মোরা, অনাগত জানাবে প্রণতি
আমাদের পায়।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

জয়ন্তী

(হান্‌স্‌ কারোসা-কৃত 'রুমেনিয়ান্‌ ডায়ারি'-র অন্তস্থ কবিতার ভাবানুবাদ)

কিশলের উর্দ্ধ চূড়ে কণ্টকিত তুষার-শয়নে
প্রাণ-বিনিময়ে যারা অবশেষে লভিলো বিরাম,
তাদের সমাধিস্তূপ এসো রচি প্রস্তর-চয়নে,
অনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভে এসো লিখি তাহাদের নাম।

করেনি আক্ষেপ তারা, চাহে নাই অগ্রে বা পশ্চাতে,
মাগেনি বিরতি, আজ্ঞা করিয়াছে নীরবে পালন,
বিদেশের বন্ধ্যা মাটি সিঞ্চি বৃথা হৃদিরক্তপাতে
উপেক্ষার রন্ধ্রে তারা ঢেলে দেছে অখ্যাত জীবন ॥

কোথা এ-ধ্বংসের শেষ ?   দিশাহারা মানুষের আঁখি।
অন্ধকার ভবিতব্যে সাবধান, বন্ধু, সাবধান !
যদি দেখো মুমূর্ষুরে, বোলো তারে নম্র কণ্ঠে ডাকি,
যেন সে হিংসার স্পর্শে মৃত্যুর করেনা অপমান।
বোলো তারে শ্রদ্ধাভরে, সে মোদের সবার অগ্রণী ;
বিলুপ্তির ধূলিপথে আমরাও অনুযাত্র তার।
তার পরে জুনিপারে বিরচিয়া শবপ্রাবরণী,
কোরো, বন্ধু, ধ্রুব পদে, কোরো, বন্ধু, তার অনুসার ॥

কিন্তু যদি ভাগ্যগুণে হেথা হতে পারো ফিরিবারে,
উন্নিদ্র প্রহরা তব থাকে যেন সতত জাগর ;
বিধাতা অচেনা কণ্ঠে ডাকে যদি কখনো তোমারে,
আলস্যের অন্যমনে কোরোনা তাহারে অনাদর।
ভুলোনা তোমার পন্থা নিরন্তর সঙ্কীর্ণ বন্ধুর,
তোমার সুদীর্ঘ বেলা পরিশ্রান্ত শত সাধনায়,
তাহাতে উৎসব নাই, নাই তাহে উল্লাসের সুর,
সন্ত্রস্ত বিশ্রাম তব শৃঙ্গচারী ছাগলের প্রায় ॥

নির্ম্মদ সত্যের বরে চিত্ত তব রহে যেন শুচি।
মিথ্যার দুরভিসন্ধি জাতিদের করেছে পাগল ;
জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বাপিত ; সমস্ত অর্গল গেছে ঘুচি,
অবাধে বিহরে বিশ্বে নিশাচর পিশাচের দল।
মোদের শ্রান্তির পরে চক্রচর চর্ম্মচটীসম
নির্ব্বাক নৈরাশ্য আজি ফিরে সদা নিঃশব্দ সঞ্চারে ;
এ-পক্ষী পতত্রহীন অনপত্য জ্বলন্ত নির্ম্মম,
আপনি সে দুঃশাসন, কিন্তু সবে প্রণমে তাহারে।
শিশুর স্মরণ হতে মুছে আজি চোখের নিমেষে
যুগান্তসাধনধন প্রত্যাদেশ আপ্তবাক্যগুলি।
সর্ব্বভুক বুভুক্ষায় নরকীয় দ্রোণকাক এসে,
দেউল উজাড় করে শ্রুতিস্মৃতি লয়ে যায় তুলি।

হয়তো সমাপ্ত লগ্ন, বৃথা ওই অর্ঘ উপচার ;
বিদীর্ণ মন্দিরকূট ভেঙে পড়ে সন্তপ্তের পরে ;
ভগ্ন সেতু দীপ্যমান ; উদ্বেলিয়া উঠে পারাবার ;
লুপ্ত তীর্থযাত্রাপথ ; স্তবস্তুতি শূন্যে কেঁদে মরে।
উদ্বাস্তু আজিকে আত্মা, নিজগৃহে নাই তার স্থান ;
অন্তরতমের দ্বার শৈবালিত, নাই সেথা ভীড়।
মন আজি হিমায়িত, হিমচারী মৎস্যের সমান
বিকল বাসনারাশি, পঙ্গু আশা, চেতনা নিবিড় ॥

যদি কোনো সুলগনে পারো বন্ধু ফিরিবারে ঘরে,
দেখো যেন প্রহরায় কখনো না-আসে অবসাদ ;
স্বার্থের ভঙ্গুর স্বপ্ন উপাড়িয়া ফেলো দৃঢ় করে ;
নিষ্কলঙ্ক বিস্মরণে ঢেকে দিও এ-চণ্ড প্রমাদ ;
আপনারে ঘিরে রেখো স্বয়ন্তর শৃঙ্খলার পাকে ;
অন্তরে হোমাগ্নি জ্বেলো নিরুদ্দেশ দেবতার তরে ;
নিত্য করো প্রদক্ষিণ তিনবার সে-নাচিকেতাকে ;
প্রিয়ার সান্নিধ্য, বন্ধু, ইচ্ছা হলে খুঁজো তার পরে ॥

ধন্য সে, যে পারে পাখা প্রসারিতে কালের গহনে ;
অনিষ্টের মুষ্টি হতে, কেড়ে আনে সে গূঢ় কল্যাণ ;
লঙ্ঘে সে প্রলয়সিন্ধু ; মুক্তির সানন্দ সন্ধিক্ষণে
অচেনা উতল ছন্দে তার কাছে করে আত্মদান।
জগতের গোষ্ঠীপতি, জন্মমৃত্যু-অতিক্রান্ত রবি,
তার দীপ্তি, তার তেজ জ্বলেনা কি আমাদের মাঝে ?
অতীত স্নেহের স্মৃতি, বর্ত্তমান করুণার ছবি
উদ্বায়ী মুহূর্ত্ত মধ্যে, দেখোনি কি, নিয়ত বিরাজে ?
তারায় তারায় কাঁপে আমাদের চিরন্তন প্রাণ,
সপ্ত সিন্ধু বিচঞ্চল সে-প্রাণের অমৃত পরশে,
সে-প্রাণের উপাদানে নিৰ্ম্মিত স্বয়ং ভগবান,
সৃষ্টির অবেদ্য বার্ত্তা পরিপ্লুত তাহার হরষে ॥

চিরসুন্দরের দূত, নামো তবে গিরিশীর্ষ হতে
মৃত ভাবীকথকেরে, মেঘার্ত্ত শ্যেনেরে পরিহরি।
তোমার প্রেমের জ্যোতি ব্যক্ত হোক তমিস্র জগতে,
আত্মীয়ের প্রতীক্ষায় তব বাণী উঠুক গুঞ্জরি।

হয়নি সংকার যার, উজ্জীবিত হবে সে কেমনে ?
ফিরে চাও, ক্ষেমঙ্কর, লগ্ন আজো হয়নি অতীত ;
চূর্ণ যে-মনুষ্যমূর্ত্তি মিশে আছে স্তব্ধ ধূলিসনে,
নবীন বেদীর মূলে করো তারে পুনশ্চ প্রোথিত।
নহে তো অপরিচিত তুমি করো যে-সত্য প্রচার ;
ইতিমধ্যে বারম্বার অগ্নিদীক্ষা দিয়েছো নিষ্ঠুর।
যে-সন্দিগ্ধ সীমাসন্ধি মাপে রাজ্য আলোর, ছায়ার,
সেখানে মোদের কানে হানো তব আগমনীসুর।
বিশুদ্ধ চৈতন্য জাগে জড়বক্ষে সে-শিব সঙ্গীতে ;
তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি আনে বিশ্বে অমর্ত্ত্য বিপ্লব ;
তব ইন্দ্রজালে পাশ পরিণত অধরা-রশ্মিতে,
জেতারে শেখায় বন্দী লাঞ্ছনার দুরূহ গৌরব॥

কিন্তু যে প্রথার জালে বদ্ধমূল অনীহ পাতালে,
কুড়ায়ে উচ্ছিষ্ট কণা কাটে যার অনুবৃত্ত দিন,
করো তারে আবিষ্কার গতক্লম তুষ্টির আড়ালে,
ধরো ওষ্ঠে সুধা বিষ, করো তারে ভয়ভ্রান্তিহীন।
দাও তারে শক্তি দাও, মিতব্যয়ী ধরণীরে জিনে
সে যেন আহরি আনে জীবনের অজস্র বৈভব ;
আপন দক্ষিণা যেন আপনি সে নিতে পারে চিনে,
রহেনা গ্রহণে তার যেন কভু লোভের সংস্রব।
যেন সে নিষ্কুণ্ঠচিত্তে দিতে পারে উদার আহুতি
প্রথম সঞ্চয়টুকু চিরন্তন হোমাগ্নির পুটে ;
থাকেনা অভুক্ত যেন অভ্রংলিহ আত্মার আকুতি ;
অমৃতের দানসত্রে নিত্য যেন বিত্ত ভরে উঠে॥

প্রাচীন পথিকসম নির্দ্দেশক চিহ্ন দিও আঁকি
অনুগের তরে, বন্ধু, বালু-হিম-বন্ধল-প্রস্তরে ;
পথে যদি মৃত্যু ঘটে, অন্তকালে বিহঙ্গমে ডাকি
মৈত্রীর কুহকলিপি লিখে যেও শুভ্র পক্ষপরে।
কিশভের ঊর্দ্ধ চূড়ে কণ্টকিত তুষারশয়নে
গতাসু বীরের তরে, এসো, তবে কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়ি ;
যাহারা মাগেনি ক্ষান্তি, ঝাঁপ দেছে অমোঘ মরণে,
তাদের মহার্ঘ্য নাম, এসো, বন্ধু, জপমন্ত্র করি॥

রুমানীর গিরিশ্রেণী মুহ্যমান শীতের কবলে,
গগনে গগনে কিন্তু বসন্তের অপূর্ব্ব বিলাস ;
ভূর্জ্জবৃক্ষ জরাশীর্ণ, তবু ছিন্ন কাণ্ডের ফাটলে
ইঙ্গিতিছে ক্ষণে ক্ষণে নূতনের রজত প্রকাশ।
উধাও ঝঞ্ঝার মুখে বৃন্তচ্যুত পত্রের সমান
মোরা আজ বিতাড়িত বার্ত্তাহীন প্রান্তরে প্রান্তরে,
না-জানি অদৃষ্টলিপি, কোথা হবে যাত্রা-অবসান,
অঙ্কুরিবে কোন বীজ এ-সর্ব্বনাশেরে ধন্য করে !

নক্ষত্রের কণাসম সংগ্রথিত শ্রদ্ধার সঞ্চয়
রবে দীপ্র অহরহ, বিচ্ছুরিবে নিষ্কম্প্র আলোকে ;
হয়তো বা যুগান্তরে একদা সে-অমর প্রত্যয়
হানা দিবে অকস্মাৎ ঘনীভূত হৃদয়গোলকে ঃ
যদিও সে-অভ্যাঘাতে নাহি গলে তুষার-স্ফটিক,
তথাপি চিত্রল ছটা কীর্ণ হবে সে-ন্যুব্জ দর্পণে ;
স্পর্শে তার উদ্ভাসিবে দূরান্তরে অন্য কোনো দিক,
জাগিবে নবীন বহ্নি পুরাতনী পৃথিবীর মনে॥

ক্ষয়িষ্ণু শবের স্তূপে পরিপূর্ণ কিশভের চূড়া,
বিস্মৃত বিজয়মাল্য, লৌহমল অসির ফলকে ;
কিন্তু আজি পুনর্ব্বার মিষ্ট লাগে বিষতিক্ত সুরা,
মানুষ উৎসবমত্ত অনাবিল প্রেমের পুলকে।
আরণ্যিক লালসার উচ্ছৃঙ্খল উত্তরাধিকার
দীর্ণা চীর্ণা বসুধারে করিয়াছে আবার উর্ব্বরা।
এসেছে পরম মুক্তি, অন্ধকূপ হলো ছারখার,
উড্ডীন মানব-আত্মা সন্ধানিছে অচিন্ত্য অমরা।
নিঃসৃত রুধির হতে স্বসমুত্থ, রক্তবীজসম,
অভয়জয়ন্তীবাহী তরুণের অক্ষয় বাহিনী,
প্রাচীন অনুজ্ঞা যত পরিণত গানে অনুপম,
আজি সাধ্য অসম্ভব, সিদ্ধ আজি পুরাণকাহিনী॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তক-পরিচয়

কৃষ্ণরাও—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত, (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্)।

মানুষের গল্প শোনার প্রথম যুগে হয়েচে রূপকথার সৃষ্টি। রূপকথা বলতে বোঝায় চেহারাওয়ালা গল্প। মনে হওয়া চাই,—ঠিক যেন দেখতে পাচ্চি। ঐ দেখতে পাওয়াটাই আসল কথা, তার বেশি আর দাবী নেই। গল্পটার প্রমাণ কল্পনায়, যুক্তিতে নয়। কথার সত্য যুগ তখন, অর্থাৎ সত্যকে সেকালে অন্য সাক্ষ্য খুঁজতে হোত না, তার আপনার সাক্ষ্য আপনাতেই। যে সংসারটাকে নিয়ে ব্যবহার করতে হয়, সম্ভবপরতার দরকার তার আগাগোড়া। তার মধ্যে সৃষ্টিছাড়ার হঠাৎ আবির্ভাবকে কেউ ক্ষমা করে না। রূপকথায় ব্যবহারের বেড়া ডিঙিয়ে সৃষ্টিছাড়ার মহলেই মানুষের চড়ুইভাতি।

সাহিত্যের ইতিহাসের গোড়ার পর্ব্বে একটা ছিল প্রাক্‌প্রাকৃতিক যুগ। তখন বিধাতার সৃষ্ট যে প্রাকৃত জগতে মানুষের ব্যবহার ছিল নিয়মে বদ্ধ, তার থেকে নিজের সৃষ্ট অপ্রাকৃত জগতে ব্যবহারের শাসন থেকে নিত সে ছুটি। তখন মানুষের মনের পক্ষে এই ছুটির একান্ত দরকার ছিল। কেননা কঠোর ছিল তার জীবিকার দাবী, সঙ্কীর্ণ ছিল তার ভাগ্য-নির্দ্দিষ্ট সংসার। সেই অবস্থায় সে হাঁপ ছাড়তে চেয়েচে, সেই কল্পলোকে যেখানে যা খুসি তাই হতে পারে।

কিন্তু সংসারেই ঘটুক—গল্পেই ঘটুক—ঘটনামাত্রেরই একটা অভিজ্ঞানপত্রের দরকার আছে, তাকে নিঃসংশয় সত্যের প্রমাণ আনতে হবে। এই নিঃসংশয়তার প্রমাণ প্রাকৃতজগতে একরকম গল্পজগতে আরএক রকম। প্রাকৃতজগতে যে সঙ্গতি তার থাকা চাই সেটা নিয়মের, আর গল্প-জগতে সেটা রূপের। আরব্য উপন্যাস সংসারের নিয়মকে একেবারেই মানলে না কিন্তু রূপ-সঙ্গতিকে তার মানতে হয়েচে। এমন করে তাকে গড়তে হয়েচে গল্প, যে মনে হয়েচে যে দেখতে পাচ্চি। প্রতিদিনের যে দৈনিক জগৎটা সর্ব্বদাই মানুষের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে আছে তার থেকে দূরে যাবার জন্যেই সেদিন মানুষ বলেচে গল্প বলো। আজ পূজোর ছুটি হলে টাইম টেব্‌ল্ খুলে বসি, ভাবতে থাকি যাব চিতোরে না উটকামণ্ডে, পেশোয়ারে না কন্যাকুমারিকায়। চিন্তাও করিনে হাড়কাটা থেকে যাব কি রাণীমুদির গলিতে। প্রয়োজনের তাগিদে বাসা বদলাবার সময় সে তর্ক ওঠে। কিন্তু ছুটির সময় আমরা খুঁজি দূরকে, অনভ্যস্তকে। গল্প জিনিষটার সুরু হয়েচে ছুটির আয়োজন নিয়ে।

ইংরেজিতে একটা শব্দ আছে রোমান্স্, যেটা আমাদের রূপকথার সমশ্রেণীর। রাজা আর্থারের কাহিনী হোলো রোমান্স্। ঘরের বাঁধা বরাদ্দ থেকে অঘটন ঘটনের মধ্যে বেরিয়ে পড়বার ফিকির। সেখানকার মাপকাঠি সংসারের গজের মাপকে একেবারে মানে না। খুসি হয় মন সেই জন্যেই, প্রচলিত হিসেব মিলিয়ে চলতে হয় না, জবাবদিহি নেই প্রাত্যহিক প্রয়োজন-বিধাতার কাছে।

শকুন্তলা হোলো রোমান্স্, বইখানা যে পড়ে, নাটকখানা যে দেখে সে নেয় ছুটি। চলে যায় দূরে। এই সব সাহিত্য মানুষের ঘরের মধ্যে দূরকে রচনা করেচে। আশ্বিন মাসে আগ্রায় চিতোরে যাওয়া, আর সার ওয়াল্টর স্কটের নভেল পড়া একজাতের

ব্যবসায়। আগ্রা চিতোর যেসব স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সে হোলো দূরস্মৃতি, তাদের পরিমাপও আমাদের হাটবাজারের মাপের নয়। তাদের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যে ভুলে যাই আপন প্রাকৃত সত্তাকে, কল্পনার পালে দূর ইতিহাসের হাওয়া লাগে, যে হাওয়াতে একালকার বড়ো বড়ো ওজনের মানুষ তরঙ্গিত প্রবাহে আপন আপন ভাগ্যতরী নিয়ে বাচ খেলেচে। কেউ পারে গেছে কেউ তলায়। তখনকার রামায়ণ মহাভারত জাতককথা কাদম্বরী সব কিছুর মধ্যেই ছিল মানুষের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়বার প্রয়াস।

আজ মানুষ এত বড় ঘোরতর কুণো এবং বুড়ো হয়ে গেছে যে এই ইচ্ছেটা তার একেবারে ঘুচে গেছে তা বলতে পারি নে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম যখন দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা দেখা দিল তখন সমস্ত বাঙালী পাঠকের মন যে কী রকম মাতিয়ে দিল তা এখনকার পাঠকেরা কল্পনা করতে পারবে না। ঘোরো বাঙালী সেদিন হঠাৎ বিপুল পরিমাণে ছুটির রস পেয়েছিল। রস-সাহিত্য মাত্রেই এই ছুটি কোনো না কোনো আকারে আছে।

এখনো মানুষ বলে, গল্প বলো। আজকাল এই গল্পের ভূমিকা প্রধানত বাইরের দিক থেকে ঝুঁকেচে মনের দিকে। সে রাজ্য অতি অপরূপ এবং বিশাল। সেখানেও কত অভাবনীয় নানা সংঘাতে সম্ভাবনীয় হয়ে উঠ্‌চে। কলম্বস যেমন আমেরিকা আবিষ্কার করে ইতিহাসের দিগন্তকে বড়ো করে দিয়েচে, এও তাই। এখানে প্রতিদিন বের হচ্ছে নতুন নতুন ক্ষেত্র, নতুন নতুন খনি। এই মানস মহাদেশে লেখকদের উপনিবেশীর দল চারিদিক থেকে প্রতিদিন এসে জুটচে। মানুষের মন নিয়ে চষা, খোঁড়া, খোঁজা এর আর অন্ত নেই। এই ঠেলাঠেলির ভিড়ের মধ্যে সেদিনের কথা ভুলেছিলুম সেদিন সারাদিনের কাজের ও খেলার শেষে সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জ্বেলে বলেছিলুম, গল্প বলো।

বাংলা সাহিত্যে এই দূরের কথা ছুটির কথা নেই বললেই হয়, এমন সব কাহিনীর অভাব যার মধ্যে দূরদেশী অজানার রং লেগেচে। তার স্বাদ পাইনে বলেই তার ফরমাস পর্য্যন্ত নেই। অনেক বাঙালীকে দেখেচি বিদেশে, তারা বিদেশের রস পায় না, অত্যন্ত ঘরমুখো তাদের মন। সেখানে যে-ভোজের আসন পাতা তার দিকে সে পিছন ফিরে বসে। বাংলার কথা-সাহিত্য দেখলেই বোঝা যায় বাঙালীর "ঘর হৈতে আঙিনা বিদেশ"।

এমন সময় চারুচন্দ্র দত্তের "কৃষ্ণরাও" বইখানা হাতে এল। লেখক মজলিষি মানুষ, তার উপরে দূরপ্রদেশের অভিজ্ঞতায় তাঁর স্মৃতি-ভাণ্ডার ভরা। যা দেখেচেন তার মধ্যে সমস্ত মন দিয়ে প্রবেশ করেচেন। বোঝা যায় মারাঠায় তিনি ঘরের লোক ছিলেন। এই ঘরের লোক হবার শক্তি সকলের নেই। যাদের আছে তাদের কথা বলবার শক্তি কম। চারু বাবু বিদেশের লোকসমাজের রস পেয়েচেন এবং গল্পে সে রস দিয়েচেন ঢেলে। তাঁর এই কথাগুলিতে দূর দেশ ও দূর-কালের স্বাদ চমৎকার মিলে গেছে। এ'কেই বলে খাঁটি গল্প। এই রকম গল্প পথিকদের কাছে শোনা যেতে পারে পথের ধারের আসরে। এ'কে গল্পগুজব বলে না যেটা চণ্ডীমণ্ডপে বসে পাড়ার লোককে নিয়ে কানাকানি।

গল্প হয়ে গেলেও ছেলেরা বলতে ছাড়ে না, তার পরে। এই বইয়ের প্রথম গল্প ফুরোলে আমাকে সেই ছেলেমানুষিতে পেয়েছিল। আমি হঠাৎ চমক খেয়ে

আবিষ্কার করলুম এটা ছোটো গল্প। এই ভেবে মনটাকে গুছিয়ে বসেছিলুম যে এই গল্পটাই এই বইয়ে সর্ব্বব্যাপী। আবার আসন বদলাতে হোলো, তাতে লেখকের উপর কিছু রাগ হয়েছিল। অবশেষে আরো দুটো চারটে গল্প পড়ে মনে মনে মিটমাট করে নিলুম।

আমার দেহ শ্রান্ত এবং কলম কুঁড়ে হয়ে এসেচে। বই এখনো লিখে থাকি কিন্তু বই সমালোচনা করবার মত উদ্বৃত্ত উদ্যম নেই। এই লেখাটাও ঠিক সমালোচনা হোলো না অর্থাৎ সম্যকরূপে কিছুই বললুম না—মনের কথাটা মোটামুটি বলা হোলো। বিপদ এই ঘটল, আধুনিক অনেক ভালো গল্প সম্বন্ধে আজও কোনো মত দিই নি সেই অপরাধ হোলো নিবিড়—যথা বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি। নিতান্তই কুঁড়েমি করেই কিছু বলি নি, সে ওজর আজকের বেমানান হবে।

কৃষ্ণরাও গল্পের যে ভূমিকা সেইটেই অল্প কিছু বদল করে ঐ বইয়েরও ভূমিকা করা যেতে পারে। পথের পাঁচালির আখ্যানটা অত্যন্ত দেশী। কিন্তু কাছের জিনিষেরও অনেক পরিচয় বাকি থাকে। যেখানে আজন্মকাল আছি সেখানেও সব মানুষের সব জায়গায় প্রবেশ ঘটে না। পথের পাঁচালি যে বাংলা পাড়াগাঁয়ের কথা সেও অজানা রাস্তায় নতুন করে দেখতে হয়। লেখার গুণ এই যে, নতুন জিনিষ ঝাপসা হয় নি, মনে হয় খুব খাঁটি, উঁচু দরের কথায় মন ভোলাবার জন্যে সস্তা দরের রাঙতায় সাজ পরাবার চেষ্টা নেই। বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই বইখানিতে পেয়েচি যথার্থ গল্পের স্বাদ। এর থেকে শিক্ষা হয় নি কিছুই, দেখা হয়েচে অনেক যা পূর্ব্বে এমন করে দেখি নি। এই গল্পে গাছপালা পথঘাট মেয়েপুরুষ সুখ-দুঃখ সমস্তকে আমাদের আধুনিক অভিজ্ঞতার প্রাত্যহিক পরিবেষ্টনের থেকে দূরে প্রক্ষিপ্ত করে দেখানো হয়েচে। সাহিত্যে একটা নতুন জিনিষ পাওয়া গেল অথচ পুরাতন পরিচিত জিনিষের মতো সে সুস্পষ্ট।

ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের "কলরব" আর "নিশি পদ্ম" বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

রিয়ালিজ্‌ম্ এবং আইডিয়ালিজ্‌ম্‌কে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিকেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার সঙ্গে তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুইয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি; কোনো একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জ্জুন তা নয়, কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা রিয়ল, যে অংশে মহত্ত্ব সেই অংশটাই বানানো।

মহাভারতে প্রাকৃতিক এবং ভাবিক অনায়াসে মিশে গেছে, এমন কি অপ্রাকৃতও আপন জায়গা নিয়েচে বিনা কৈফিয়তে। অত বড় সর্ব্বগ্রাহী গল্প জগতের আর কোনো সাহিত্যে লেখা হয় নি। ওর মধ্যে সাহসের সীমা নেই।

কিন্তু নবীন মতবাদওয়ালাদের সাহিত্যে ভীরুতা আছে যথেষ্ট। এরা সুন্দরকে ভয় করে পাছে কেউ গাল দিয়ে বসে এসব মন ভোলাবার ছল, ভালোকে সরিয়ে ফেলে পাছে সেটাতে গুরুগিরির অপবাদ লাগে। এমনি করে এরা কিছুতেই অসঙ্কোচে সহজ হতে পারে না। সাহিত্যে ভালোটা মন্দর চেয়ে ভালো এমন কথা যদি বা অশ্রদ্ধেয় হয় তবু সাহিত্যে ভালোমন্দর একই দর অন্তত এও তো মানতে হবে। কিন্তু এমন ব্যবহার করলে তো

চলবে না যে মন্দটার দর ভালোর চেয়ে বেশি—যেহেতু মন্দটাই রিয়ল্। সাহিত্যে এরা এমন একটা জাল পাততে চায়, যে জালে চুনোপুঁটিই পড়ে, এড়িয়ে যায় রুই কাৎলা। রুই কাৎলাকে গাল দিয়ে বলে ওগুলো উঁচকপালে সৌখীনদের মাছ। কোনো কারণে কোনো ভোজে বা কোনো তরকারীতে চুনোপুঁটির যদি বিশেষ ফরমাস থাকে তাহলে আপত্তি করব না কিন্তু কুলবন্ধনের নতুন নিয়মে বড়ো মাছকে যদি একঘরে করা হয় তাহলে বলতেই হবে খাঁটি রিয়ালিজ্‌ম্ এ নয়, এটা বিশেষ দলের ঘরগড়া রীতি, অর্থাৎ কন্‌ভেন্‌শন্, নীচতাকেই কৌলিন্যের একমাত্র মর্য্যাদা দেওয়া। এটাকে বাইরে দেখতে মনে হয় সাহসিকতা কিন্তু বস্তুতই এটা ভীরুতা। এটা বাঁধারাস্তার আধুনিকতাগিরি।

প্রবোধ সান্যালের "কলরব" পড়লুম। পড়ে তাঁর রচনা ও কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হোলো। এই বইয়ে নানা চরিত্র ও নানা ঘটনার ভিড়। কোনোটাকেই মনে হয় না যে বেঠিক। এতগুলো মেয়ে পুরুষকে স্পষ্ট করে গড়ে তুলতে ক্ষমতার দরকার। সে ক্ষমতা আছে লেখকের।

লেখক ইচ্ছে করেই এই বইয়ে দেখাতে চেয়েচেন, একটা বাড়িতে অত্যন্ত সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার একটা ঘোলা আবর্ত্ত। তারা পরস্পর কাছাকাছি আছে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাদের নেই। যেমন অনাদৃত গলি যত রকম আবর্জ্জনায় নোংরা দুর্গন্ধ এবং অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে এ বাড়িতে তেমনি বহুলোকের চিত্তদৈন্য ও অবস্থাদৈন্যের যত কিছু উচ্ছিষ্ট স্তূপাকার হয়ে বাতাসকে মলিন করে তুলেচে। এর মধ্যে অসামান্যতা কোনো চরিত্রে কিছুমাত্র নেই তা নয়—কিন্তু সে কেমন, হাঁসপাতালে মাঝে মাঝে যেমন দেখা যায় নার্স কিম্বা ডাক্তার কিম্বা ছাত্র। তারা মুখ্য নয় তারা গৌণ।

হাঁসপাতালটা সাধারণ সংসারের প্রতিরূপ নয়। সাধারণ সংসার স্বাস্থ্যে অস্বাস্থ্যে মেলানো; সেইটাকেই বলা যেতে পারে রিয়ল্। হাঁসপাতাল রিয়ল্ নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, ও একটা ছেঁকে আনা জিনিষ। তবু ওর স্বীকৃতির দাবী আছে, কেবল প্রয়োজনের দিক থেকে নয় অস্তিত্বের দিক থেকে। ওটা একটা-কিছু হয়ে দাঁড়িয়েচে অতএব সেই মূল্য তাকে দেওয়া চাই। কলরবের বাসাখানাও নিছক অসুস্থদেরই বাসা। সংসারে তারা এ-গলিতে ও-গলিতে ছড়িয়ে থাকে। তাদের ছেঁকে এনে একটা জায়গায় সংহত রূপ দেওয়া হয়েচে—অর্থাৎ যা ছিল ক্ষেতের মধ্যে তাকে টিনের মধ্যে বিশেষ জারক রসে ডুবিয়ে প্যাক করা হোলো। আচ্ছা তাই সই।

হাঁসপাতাল সংসার থেকে দূরের জিনিষ, স্বতন্ত্র করা তার সত্তা। সেই দূরের দৃশ্য বিশেষ দিনে দেখতে যাওয়া চলে, রোগীরূপে নয়, ডাক্তাররূপে নয়, নিরাসক্ত দর্শকরূপে। সেই হিসাবে এই হাঁসপাতালী গল্পটাকেও কি রোমান্স্ বল্‌ব না। কিন্তু যদি বলি রোমাণ্টিক তা হলে আধুনিক মতওয়ালারা লজ্জা পাবেন, কেননা ও শব্দটাকে তাঁরা পছন্দ করেন না। উপায় নেই, পাঠক গল্প শুনতে চেয়েচে, লেখক গল্প জুগিয়েচে নিত্যনৈমিত্তিক সংসার থেকে দূরের দৃশ্যে। মনটা ছুটিতে দূরে যেতেই চায়—গল্প ছুটির জন্যেই। এই দূরের হাওয়া বিচিত্রবর্ণ বসন্তের হতে পারে, হতে পারে ফ্যাকাশে রঙের দরিদ্র শীতের।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা কিছুদিন পূর্ব্বে আমার হাতে পড়েছিল। মনে হয়েছিল তাঁর লেখা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আমার দ্বারা আর ঘটে উঠবেনা। যে লেখকরা অবকাশধনে ধনী সমালোচনা তাঁদেরই পোষায়। আমার অবকাশ তলায় এসে ঠেকেচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণের বিদ্রোহ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
স্বদেশ ও সাহিত্য—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের বই সমালোচনা কর্‌তে গিয়ে প্রথমেই তাঁর এই একটা ভাব সকলের নজরে পড়ে যে শরৎচন্দ্র যে দেশের মাটিতে জন্মেছেন সে দেশ তাঁর নিজের ; সে দেশের কোন নিন্দা, সত্য হোক্ বা মিথ্যা হোক্, তিনি অন্যের মুখ থেকে শুন্‌তে রাজী নন। এই মনোভাব তাঁর 'গোরা' পড়ার ফল কিনা জানি না—কিন্তু গোরার মনোভাবের সঙ্গে এই মনোভাবের যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। আর একটি মনোভাবও শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রচুর পরিমাণে দেখ্‌তে পাই। সেটি হচ্ছে এই যে দেশ জাতি ও সমাজকে যদি কিছু গালাগালি কর্‌তে হয় ত সে তিনি করবেন কারণ দেশকে তিনিই ভালবেসেছেন কিন্তু অন্যে বল্লেই সেটা দেশদ্রোহিতা হতে বাধ্য। সত্য কি মিথ্যা, এ প্রশ্নই সেখানে বিবেচ্য নয়। এই মনোভাবটি আমাদের অক্ষম বাঙালী মনের আত্মসম্মানকে বড় একটি আশ্রয় দান করে। বাংলা দেশে এই দুইটি ভাবের সাধারণ নাম দেশভক্তি যাকে চল্‌তি কথায় বলে পেট্রিয়টিজ্‌ম।

এটা গেল দেশভক্তির এক পিঠ। এর আর একটা দিক্ আছে, সেটা যেমন মনোরম, তেমনি দায়িত্ব-ভার-শূন্য, সেটা হচ্ছে পরনিন্দার দিক। এক্ষেত্রেও সত্য মিথ্যা বিচার করাটা দেশদ্রোহিতা। দেশভক্তকে মান্‌তেই হবে যে দেশের যা কিছু মন্দ তা ইংরাজ-কৃত। এই দুটি মনোভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে এই প্রবন্ধগুলি পড়্‌লে ভাষাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লোকচিত্ত রঞ্জনের অদ্ভুত ক্ষমতা পাঠককে অভিভূত কর্‌বে—একথা জোর করে বলার দরকার করেনা।

কিন্তু সমালোচনায় দেশভক্তির স্থান নেই, বিশেষত এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে বহু স্থলেই 'সত্য গোপন করা পাপস্বরূপ' বলে দৃঢ়কণ্ঠে তার থেকে নিবৃত্ত হতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। জীবনে অনেক পাপ করা গেছে—কিন্তু পাপ না কর্‌বার সুযোগ এত সহজে বড় একটা পাই নি। তাই আজ ভরসা ক'রে উপন্যাস ও গল্পকলার যাদুকরের প্রবন্ধ সমালোচনা কর্‌তে অগ্রসর হয়েছি। আর একটা ভরসা আমার আছে। সেটা হচ্ছে উত্যক্ত শরৎচন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের উপদেশ : "যাকে সুখ্যাতি কর্‌তে পারিনে তাকে নিন্দে কর্‌তেও আমার লজ্জা বোধ হয়।" শরৎচন্দ্রের সুখ্যাতি আমি প্রচুর কর্‌তে পারি, সুতরাং লজ্জা বোধ কর্‌বার কারণ আমার সে পক্ষেও নেই।

শরৎচন্দ্রের যে দুখানি বইয়ের সমালোচনা করতে বসেছি তার মধ্যে 'তরুণের বিদ্রোহ' বইখানি "১৯২৯ সালের ইষ্টারের ছুটিতে রংপুরের বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতির আসন হইতে প্রদত্ত বক্তৃতা।" এই বক্তৃতার স্পষ্ট উদ্দেশ্য স্বর্গগত দেশবন্ধুর দলের মোক্তাররূপে মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গোক্তি ক'রে তাঁর প্রচারিত মতগুলিকে তরুণ দলের কাছে খেলো করা। যিনি যত বড়ই হোন্ না কেন, তাঁর মত বা তাঁর কার্য্যপ্রণালী সমালোচনা কর্‌বার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু ব্যঙ্গোক্তিমাত্রের দ্বারা কোনো মতকে খণ্ডন করা হয় না এবং ব্যঙ্গোক্তি দ্বারা কোন মহৎ ব্যক্তিকে ছোট করাও যায় না। শরৎবাবু লিখেছেন—

"কোথায় কোন এক অজানা পল্লী চৌরীচৌরায় হলো রক্তপাত, মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ ক'রে।" ..."এবার কিছুদিন নিঃশব্দে থাকার পরে, সাড়া পড়ে গেছে। সেবার ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ, এবার হয়েছে সাইমন কমিশন। আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন ; সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়ার প্রস্তাব।" জালিয়ানওয়ালাবাগই হোক্ আর সাইমন কমিশনই হোক্—দেশের আন্দোলন কোনো একটা উত্তেজনার ব্যাপারকে অবলম্বন করেই তার ফল্গুবাহিনী থেকে বন্যার আকারে প্রকাশ পায়। সেই প্রাণশক্তির দুর্নিবার স্রোতপ্রবাহকে, দেশের কল্যাণের পথে প্রবাহিত করতে, দেশের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁরা, যে কার্য্যপ্রণালী স্থির করেন, তা যে সকল সময়ই, এমন কি কোন সময়ই অভ্রান্ত হয় এমন বলা যায় না। অভ্রান্ত হওয়া যদি সম্ভবও হোতো তা হলেও তার ফল যে সব সময় আশানুরূপ, এমন কি কল্যাণকর হয় তাও নয়। নানা প্রতিকূল নূতন ঘটনায় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া হয়ত সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এবং লোক-পরিচালনের দুরূহ কার্য্যপ্রণালীতে যদি কোথাও ভ্রান্তি থাকে তবে সেই ভ্রান্তি সংশোধনের সমস্যা—সস্তায় যাদের সহজে উত্তেজিত করা যায় এমন তরুণ দলের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কটূক্তি করে—নিরাময় চিত্তে "নিভৃত পল্লী"-কোটরে, যেখানে বাইরের "তর্জ্জন গর্জ্জন গিয়ে পৌছবে না", সেখানে আশ্রয় নিলেও মেটে না।

এই সূত্রে বলা ভাল যে শরৎচন্দ্র, তরুণকুলের ক্রোধ উদ্দীপ্ত না করেও কি ক'রে বক্তব্যে স্পষ্টবাদিতার চেহারা ফোটে তারি চেষ্টায় দিশাহারা হয়ে, এই প্রবন্ধটির মধ্যে তরুণ-স্তুতি ছড়িয়েছেন প্রচুর পরিমাণে ও নির্ব্বিচার প্রশ্রয়ে—আত্মত্যাগে, নিষ্ঠার সঙ্গে খাদি প্রস্তুত কর্‌তে, জেলে যেতে, দেশকে ভালবেসে অকাতরে প্রাণ দিতে এই বাংলার তরুণেরা যেমন এমনটি আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ আবার পাতা চারেক পরেই দেখি যে তাদের আর এক মূর্ত্তি। শরৎচন্দ্র এই অনন্যসাধারণ আত্মত্যাগী যুবকদের নির্জ্জীব বলে ভৎর্সনা করছেন। বল্‌ছেন "শান্তি-স্বস্তি-হীন সম্মান-বর্জ্জিত প্রাণ কি একা ভারতের তরুণের পক্ষেই এত লোভের বস্তু?" (এখানে অবশ্য ভারত কথাটা বাংলার প্রতিশব্দ) ৮০ "তরুণ-শক্তি যে প্রাণ দিয়ে ধ্বংসের কবল থেকে জন্মভূমিকে রক্ষা করে এ যদি তারা ভোলে" ইত্যাদি। অথবা "এই যে যুব-সঙ্ঘ, খোঁজ কর্‌লেই দেখা যাবে এর মধ্যে তেরটা দল। কারো সঙ্গে কারো মতের মিল নেই" ইত্যাদি। কৌতুকের কথা এই যে এই শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের একদলের হয়ে অন্য দলের উচ্ছেদ

সাধনোদ্দেশেই এই বক্তৃতায় সেদিন ব্রতী ছিলেন। যুব-সঙ্ঘে কটা দল সে কথা ছেড়েই দি—অন্ততঃ সেদিন শরৎবাবু যে বৃহত্তর ভারত-সঙ্ঘের মধ্যে "মতের মিল" প্রতিষ্ঠার 'চ্যাম্পিয়ান' স্বরূপ দাঁড়ান নি সে দিকে "তাঁর" দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌বার লোক বোধহয় সেখানে ছিল না। অথবা যুবকেরা বোধহয় বিশিষ্ট অতিথির প্রতি শিষ্টতার খাতিরে এ কৌতুকাবহ ব্যাপারটাকে নিঃশব্দে হজম করেছিল।

অতএব খদ্দর প্রচারের প্রতি প্রচুর যুক্তিসম্পর্কশূন্য ব্যঙ্গোক্তির পর শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বল্‌ছেন, "এ দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এই যে মানুষের জীবনযাত্রার প্রয়োজন নিত্যই কমিয়ে আনা দরকার। অভাব-বোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কৌপীন পরিধান—এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ, সেই হেতু সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র্‌সাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বোত্তম উপায়। ……এই ত্যাগের মন্ত্র সর্ব্বসাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে পশুর কোঠায় টেনে এনেছে।"

"সর্ব্বপ্রকার কৃচ্ছ্র্‌সাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্ব্বোত্তম উপায়" এমন কথা সম্প্রতি কে কোথায় বলেছেন সেটা শরৎবাবু বলে দিলেই ভাল করতেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা অনামা কাল্পনিক মহৎ লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে এ যেন 'বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে কোঁদল করা।'

একটা কথা শরৎবাবুর মত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির অবধান করা উচিত ; সেটা এই, মানুষ যখন কোনো বিশেষ সংকল্প সাধনের উদ্দেশ্যে নিজের সহজলব্ধ আরামের পথ ছেড়ে দিয়ে বিশেষ কোনো কৃচ্ছ্র্‌সাধনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই কৃচ্ছ্র্‌সাধনকে "পুরুষকার" বলে অভিহিত করা অসমীচীন হয়না। এবং পুরুষকারের সঙ্গে "ভগবান করেছেন" "কপালে লেখা" "সংসার ত মায়া দুদিনের খেলা" প্রভৃতি মনোভাব এক পংক্তিতে পাংক্তেয় নয়। সুতরাং কপালের দোহাই যারা দেয় তারা সাধকের দলে নয়। পাঁচ হাত কৌপীন যাঁরা পর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁদের মনে দেশটাকে "পশুর কোঠায়" টেনে নিয়ে যাবার কোনো মৎলব ছিল না। পূর্ব্বে যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের হয়ত নিছক আধ্যাত্মিক কারণ ছিল কিন্তু এবার যিনি দিয়েছেন তাঁর কারণগুলির মধ্যে একটি প্রধান যে অর্থ নৈতিক ও ব্যবস্থাটা জনসাধারণের পক্ষে যে সাময়িক সে কথা জাতীয় কংগ্রেসের শাখা-পতির অজানা থাক্‌বার কথা নয়। অবশ্য মানসিক সিদ্ধি ও শক্তিলাভও এই উদ্দেশ্যের অন্যতম হওয়া সম্ভব। ধনী ব্যক্তিকে যদি কোন কারণে দারিদ্র্যে দিনযাপন কর্‌তে বাধ্য হতে হয়, তবে ভিক্ষা ও পরমুখাপেক্ষিতার চেয়ে নিজের জন্যে নিজের হাত পা খাটালে তাকে "চাকরের কোঠায়" গিয়ে পড়্‌তে হয় না। তাতে তার অর্থসমস্যা সাময়িকভাবে সমাধান ত হয়ই, তাছাড়া আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি মানসিক উৎকর্ষসাধনে তার চিত্ত সম্পদ্‌বান হয়।

যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি চলে, কিন্তু গালাগালি বা ব্যঙ্গ ত যুক্তি নয়—রাগ। উদাহরণস্বরূপ শরৎচন্দ্রের লেখা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "একদিন এলো মহাত্মার অদ্রোহ (?) অসহযোগ। তার টিকি বাঁধা রইল তাঁর খাদি চরকার দড়িতে" ইত্যাদি। (২) "স্বরাজের তারিখ ধার্য্য হোলো ৩১শে ডিসেম্বর।" (৩) "পশ্চিম ভারতের কংগ্রেসের নেতাদের মত অমন তাল ঠুকে ঠুকে বেড়িও না।" (৪) চৌরীচৌরায় হোলো রক্তপাত। মহাত্মা ভয় পেয়ে দিলেন সমস্ত বন্ধ করে।" (৫) "আবার সেই চরকা, সেই খাদি, সেই বয়কটের অহেতুক গর্জ্জন, সেই তাড়ির দোকানে ধন্না দেওয়া।" (৬) "মহাত্মাজী হুকুম কর্‌লেও নয়" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কথা—"সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে লেখাপড়া শেখানো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত" থাক্‌তে কেউ বলেন কিনা আমার জানা নেই। দেশের কল্যাণ নির্ভর করে নানা বিষয়ের সাধনায়। তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান ব'লে ধরা যায় এবং অপর কতকগুলি আনুষঙ্গিক। দেশের মুক্তি ও কল্যাণের পন্থা উদ্ভাবন ও অনুসরণে যাঁরা অগ্রসর সেই সকল মনীষীর মধ্যে যাঁর চিত্তে যে ব্যাপারের সাধনাকে দেশহিতের প্রধানতম উপায় ব'লে মনে হয়, তিনি সেটাকেই বড় ক'রে দেখেন ও বড় ক'রে বলেন, তারি জন্যে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যদান করেন ও অন্যকে দান কর্‌বার জন্য আহ্বান করে থাকেন। উৎসাহের আতিশয্যে নিজের উদ্ভাবিত পন্থাকে আবশ্যকের অতিরিক্ত মূল্য দেওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু লোকশিক্ষা, চরকা, জাতিভেদনাশ, বা স্ত্রীজাতির উন্নতি যিনি যতই মঙ্গলকর ব'লে মনে করুন না কেন, অন্যান্য মঙ্গলসাধনের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখ্‌তে উপদেশ দেন দেশের এমন বন্ধু আমাদের চোখে পড়েন নি। শিক্ষাবিস্তারের যাঁরা পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ত নয়ই। শরৎবাবু লিখ্‌ছেন, "শিক্ষাবিস্তার চেষ্টা কর্‌তে মানা করিনে, কিন্তু এখানে একটা নাইট্-ইস্কুল, আর ওখানে একটা আশ্রম, বিদ্যাপীঠ খুলে, যা হয়, তা ছেলেখেলার নামান্তর।" এর দ্বারা শরৎবাবু দেশের শিক্ষাবিস্তারের এ চেষ্টাটা যে আবশ্যকের পক্ষে ছেলেখেলা, সেই জন্যই দুঃখ কর্‌ছেন, সুতরাং এ অপেক্ষাও অধিকতর শিক্ষাবিস্তার চেষ্টাকেই সমর্থন কর্‌ছে। শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা এদেশে যাঁরাই কর্‌ছেন তাঁরাই শিক্ষাদানের এই স্বল্প আয়োজনের দীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রে থাকেন এবং এই চেষ্টাকে বহুগুণ প্রসারিত, লোকপ্রিয় ও প্রচলিত করা চাই এটা জেনেই তাঁদের এই প্রাণপাত পরিশ্রম। সফলতা লাভ কর্‌তে আমাদের দেশের জমিতে দেরী হতে পারে, এই পর্য্যন্ত। অথচ দেশের এই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের যে চেষ্টাকে তিনি ছেলেখেলা ব'লে বর্ণনা করেছেন সেই চেষ্টা দেখেই আবার তার বাহুল্যে তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে। বল্‌ছেন, "তাঁরা ভাল লোক সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁদের পরে আমার ভরসা কম।" অর্থাৎ তাঁরা লোক খারাপ নয়, তবে নির্ব্বোধ। শরৎবাবুর মতে গভর্ণমেণ্ট ছাড়া এ কাজ কেউ কর্‌তে পারে না। যে দেশে গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা শিক্ষাবিস্তার-কল্পে জাগানো সম্ভব নয় সেখানে কি হাত পা ছেড়ে মানুষকে তবে বসে থাক্‌তে হবে ? তাছাড়া, যে কোনো সংস্কার চেষ্টার প্রেরণাই ব্যক্তি থেকে মণ্ডলী, এবং মণ্ডলী থেকে জাতিকে অনুপ্রাণিত ক'রে থাকে এবং ক্রমে সেটা জাতীয় ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতিরেকে ব্যক্তি বিশেষের চেষ্টায় কেবল ছেলেখেলা হয়, একথা অশ্রদ্ধেয়।

এইটুকু প্রবন্ধের সমালোচনা কর্‌তে অনেকখানি লিখ্‌তে হচ্ছে। তার প্রধান কারণ প্রবন্ধটি মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ চেষ্টার প্রতি যুক্তিবিহীন কটূকাটব্যে পূর্ণ এবং তরুণ দলকে উত্তেজিত ক'রে দলবিশেষের পুষ্টিসাধনই এই বক্তৃতার উদ্দেশ্য। এমন বক্তৃতা যদি শরৎবাবুর মত মান্য লোকের মুখ থেকে না বেরোতো এবং একে যদি বাংলার অক্ষয় কলঙ্কের মত সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না হোতো তবে এর সমালোচনাও দরকার হোতো না। শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "সত্য মনে ক'রে অনেক

অপ্রিয় কথা বলেছি। পুরস্কার তার তোলা রইল। এই কংগ্রেস মণ্ডপেই দু'দিন পরে তিরস্কারের বান ডেকে যাবে। কিন্তু আমি তখন হাওড়ার নিভৃত-পল্লী মাজুতে" ইত্যাদি। গোড়ার লাইনটা একটু বদলে "সত্য মনে ক'রে" না লিখে, 'মহাত্মার বিরুদ্ধে তরুণদের উত্তেজিত ক'রে কংগ্রেসে নিজের দল ভারী করব এই মনে ক'রে' লিখলে সত্য মনে করতে হোতো না তবু সত্যই হোতো। আর বাংলার তরুণদলকে কোন্ মন্ত্রবলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তেজিত করা সম্ভব শরৎচন্দ্রের চেয়ে সে বিদ্যার বড় ওস্তাদ বাংলা দেশে নেই। কোন্ কোন্ বাক্যবিস্ফুরণে তাদের শ্রেষ্ঠত্বকে অভ্রভেদী ক'রে তোলা যায়, কোন্ কোন্ তুলনায় তাদের আহত আত্মম্ভরিতাকে নিরাময় আশ্রয় ও নির্ব্বিরোধ প্রশ্রয় দেওয়া যায়, কোন্ কথায় তাদের উদ্দাম কল্পনাকে মাদকতায় দশ গুণ ক'রে তুল্‌তে পারা যায়—এ বিদ্যার তিনি যাদুকর। কিন্তু কাল্পনিক চিত্রকে চিত্তহারী ক'রে প্রকাশ করাই তাঁর ব্যবসা, ঐতিহাসিক সত্যকে অ-সংস্কৃত ভাবে প্রকাশ করতে তিনি অভ্যস্ত নন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে এই প্রবন্ধে সত্যভাষণের খাতিরে অপ্রিয়ভাষণের কথা স্থানে স্থানে শাসানো আছে—অর্থাৎ শরৎচন্দ্র সত্যের জন্য অপ্রিয়তাকে ডরান্ নি। কিন্তু সমস্ত প্রবন্ধটি বারংবার পড়েও এই উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারলেম না। অর্থাৎ নিতান্ত দুঃসাহসিক সত্যভাষণের চিহ্ন কোথাও দেখতে পাই নি; বরং বিস্তর স্তুতিবাক্যে বাংলার তরুণদের (যাদের সম্ভাষণ ক'রে এই বক্তৃতা তাদের) কংগ্রেসের চেয়ে, বরদৌলীওয়ালাদের চেয়ে, নিখিল ভারতের অন্যান্য সকলের চেয়ে, অভ্রভেদী আসনে বসিয়েছেন। তারপর তাদের দলের মধ্যে দলাদলির যে উল্লেখটুকু করেছেন তারও ঝাঁঝটুকু মারবার জন্য তাকে যুগান্তের অভিশাপ, বাঙালীর জাতীয় উত্তরাধিকার-কলঙ্ক, প্রকাশ করেছেন। যাই হোক্ বক্তৃতাটি অক্রোধী ও অকামী মহাত্মার প্রতি কটূ ও ব্যঙ্গোক্তিতে পূর্ণ, তাও আবার দলাদলির সৃজনকল্পে।এ সম্বন্ধে আমি শরচ্চন্দ্রের স্বদেশ ও সাহিত্যের "শেষ প্রশ্ন" শীর্ষক একখানি পত্র থেকে দু চারটি পংক্তি উদ্ধার ক'রে, আমার সমালোচনার এই অংশটি শেষ কর্‌ব—পাঠক সন্দেহ করবেন না, এই পত্রখানি এই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তারই লেখা।

(১) "মনের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ ও উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও যে ভদ্র ব্যক্তির অসংযত ভাষাপ্রয়োগ করা চলে না এই কথাটাই অনেক দিনে, অনেক দুঃখে আয়ত্ত কর্‌তে হয়।" আয়ত্ত যে হয় নি তাই প্রমাণ করতেই যেন অধুনা-আলোচ্য বক্তৃতাটির অবতারণা। কত দিনে ও কত দুঃখে আয়ত্ত হবে তার সঠিক উল্লেখ নেই। (২) "মানুষকে আহত করায় নিজের মর্য্যাদা আহত হয় সব চেয়ে বেশী।" আশা করি ভবিষ্যতে একথা তিনি আর বিস্মৃত হবেন না। "আত্মরক্ষার ছলেও মানুষের আত্ম-সম্মানে আঘাত করা আমার ধাতে পোষায় না।" এই পত্রের লেখকও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় !!!

বইখানার নাম "তরুণের বিদ্রোহ" দেবার কারণ বইয়ের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল না—তবে নামটা বাংলা দেশে ব্যবসা হিসাবে মূল্যবান্ বটে।

এই বইয়ের 'সত্য ও মিথ্যা' প্রবন্ধ শরৎচন্দ্র তাঁর অন্তরের অনপনোদনেয় বেদনা দিয়ে রচনা করেছেন। এর প্রত্যেকটি কথা আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন প্রত্যেক ভারতীয় নরনারী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন। শিশুকাল থেকে প্রতি পদে স্কুলের শিশুপাঠ্য

বই থেকে হেড মাষ্টারের আফিসের খাতা পর্য্যন্ত সব আগাগোড়া মিথ্যের মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষ। "কর্ত্তৃপক্ষদের উত্তর ওতে কিছু মিথ্যা হয় না—ও সকলেই জানে।" যেটা সকলে জানে সেটা না হয় বোঝা গেল; কিন্তু ভয়ে বা লোভে মিথ্যা বলার এই ক্ষুদ্রতা শিশুর মনে ধীরে ধীরে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে বড় হয়ে মিথ্যা কথা বলার অপমান, হীনতা, দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা আমাদের আত্মসম্মানবোধকে আর আহত করে না। একথা যদিও অতীব সত্য যে আমাদের দেশ দুর্ভাগ্য, কেননা এ রাজ্যে সত্য বলা সিডিশন কিন্তু একথাও কম সত্য নয় যে ঘরে এবং বাইরে আমরা আমাদের সামাজিক, সাংসারিক ও ব্যাবহারিক জীবনে অসত্যাচরণকে, আমাদের শিশুদের জীবনের সাম্‌নে 'ক্লেভারনেস্' ও 'ট্যাক্টফুলনেস্' চতুরতা ও সংসার-বুদ্ধির আদর্শরূপে দাঁড় করিয়ে থাকি। এরই আব্‌হাওয়াতে তারা বড় হয়। সুতরাং যে সম্পাদক শরৎবাবুকে বলেছিলেন গোড়ায় একটা 'যদি' এবং শেষে একটা 'কি না' দিয়ে তিনি রাজদ্রোহ বাঁচিয়ে থাকেন তাঁর এ বিদ্যার শিক্ষা পিতামাতার এবং স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুকাল থেকেই হয়েছে। জাতির এই হীনতা শরৎচন্দ্রের চিত্তে তাঁর স্বাভাবিক আত্মসম্মানবোধকে পীড়িত করেছে। এবং তাঁর অননুকরণীয় আবেগময়ী ভাষায় তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর মনের এই দুরপনেয় বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরই ভাষায় বলি, "ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস্ না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নিচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ?"

'স্বদেশ ও সাহিত্যে'র প্রকাশকের নিবেদন লেখাটি অতি মনোজ্ঞ হয়েছে। ভাষার উপর লেখকের একটি সহজ অধিকার আছে লেখার মধ্যে বাঁধ কোথাও শিথিল হয়ে যায় নি—পড়তে ভাল লাগে।

"আমার কথা"—শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের ঘরোয়া ঝগড়ার কচকচি। তার রাজনৈতিক দিকের কথা বলতে চাইনে। নৈতিক দিকে একটা কথা বল্‌ব। শরৎচন্দ্র লিখেছেন "আর 'ইন্‌ডিফারেন্স' অর্থে যদি কেউ (ইংরাজরা) এই ইঙ্গিত ক'রে থাকে যে, মহাত্মার কারারোধে দেশের লোকের গভীর ব্যথা বাজে নি, ত তার বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। ব্যথা আমাদের মর্ম্মান্তিক হয়েই বেজেছে" ইত্যাদি। আমাদের বল্‌তে দেশের লোকের মধ্যে ক'জনকে বোঝায় তা জানি না। গভীর ব্যথা অত্যন্ত নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েকজনের বেজে থাক্‌তে পারে, কিন্তু দেশের লোক বল্‌তে যে বিপুল জন-সঙ্ঘকে বোঝায় তাদের ত শতকরা ৯৯ জনের দেশের সম্বন্ধে কোনো অনুভূতিই নেই। বাকী লোকের মধ্যে কয়েক সহস্র যারা দেশের ও মহাত্মার খবর রাখেন তাঁদেরও (শরৎচন্দ্রের কথাই তুলে দি) "আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, সর্ব্বপ্রকারের সুখ সুবিধার কোথাও যেন কোনো ত্রুটি না ঘটে পান থেকে এক বিন্দু চূণ যেন না খস্‌তে পায়—তার পর স্বরাজ বল, চরকা বল, খদ্দর বল, মায় ইংরাজকে ভারত সমুদ্র উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে আসা পর্য্যন্ত বল, যা হয় তা হোক্, কোনো আপত্তি নেই।"—অর্থাৎ হয় যদি ত পরের উপর দিয়েই হোক্। তার ফলাফল না হয় তাঁরা কৃপা ক'রে সহ্য করবেন। এমন কি পরের ছেলের মার খাওয়া, প্রাণ দেওয়া নিয়ে সকাল বিকেল চায়ের আসর, মেসের আড্ডা এবং লাটুবাবুদের বৈঠক-

থানায় বিজয় হুঙ্কারে ফাটাফাটি পর্য্যন্ত করতে রাজী আছেন। গভীর বেদনার জাজ্বল্য চিত্র! মহাত্মার কারাদণ্ডে কটা থিয়েটার, বায়স্কোপ, একদিনও পড়ে আছে? শরৎবাবুর এই কথাই ত সব চেয়ে সত্য যে, "তাঁকে মুক্ত দেশের লোকেরই হাতে। যেদিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ জেলে রাখতে পারবে না, তা সে গভর্ণমেণ্ট যত শক্তিশালী হউন।" এই হায় গভীর ব্যথাটিকে "সে (গভর্ণমেণ্ট) যদি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে" ইনডিফারেন্স "সে কি এত বড়ই মিথ্যা কথা?"

"স্বরাজ সাধনায় নারী" প্রবন্ধে শরৎবাবু লিখেছেন যে "মেয়েদের স্বাধীন যারা যে পরিমাণে থর্ব্ব করেছে তারা সেই অনুপাতেই সামাজিক, নৈতিক, আ দিকে ছোট হয়ে গেছে কিম্বা যারা তাদের স্বাধীনতা হরণ করে নি অন্ত কোন তাদের পরাধীন করতে পারে নি, পারে না, ভগবানের বোধ হয় তা আইনই ন ভগবানের আইন আমার জানা নেই, এবং সে সম্বন্ধে স্পেকিউলেট করা আম ব্যবসাও নয় কিন্তু স্বাধীনতা যদি সকলেরই কাম্য বস্তু হয় তবে মেয়েদেরও তা থে বঞ্চিত করবার কোনো ন্যায্য কারণ নেই। যে জিনিস ভাল, মঙ্গলকর, সে নিজের জোরেই মঙ্গলজনক। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখি প্রাচীন গ্রীস শিক্ষায়, শি চিন্তায়, সাহিত্যে অতুলনীয়; কিন্তু সেখানে নারীর স্থান কোথায় ছিল? ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর তুর্কী ও মোগলের কথা বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীর তুর্কী ছি 'টেরর অব্ ইউরোপ'। স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল বলেই তা ভাল, তা বই তাকে স্বরাজ লাভের উপায় ব'লে উৎকোচের ব্যবস্থা করা কেন? কোনো ভাল জিনিসের মূল্যকে তাতে থর্ব্ব করা হয় না কি?

"শিক্ষার বিরোধ" প্রবন্ধ পড়লে সেই "তরুণের বিদ্রোহ"-এর বক্তাকে মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কথা ইচ্ছে করলে শরৎচন্দ্র যতটা স্পষ্ট বুঝতে পারেন ব'লে আমাদের জানা আছে এমন অল্প লোকই আছেন অথচ দুঃখের বিষয়, শরৎচন্দ্র অযথা কথার মারপ্যাঁচে কতকগুলি অবান্তর তর্কের সৃষ্টি করেছেন। পশ্চিমের কাছে আমাদের কিছু শেখবার আছে, এই সামান্য সত্যটুকুতে উষ্মা প্রকাশ করলে হয়ত দেশভক্তি প্রকাশ পেতে পারে কিন্তু স্বদেশপ্রিয়তা যে প্রকাশ পায় না শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা সে কথা শরৎচন্দ্রকে তাঁর বই থেকেই স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন। আসলে শরৎচন্দ্রের অনন্যসাধারণ সেন্স অব হিউমার-এর মধ্যেও কোথায় যেন একটা নাটুকে বাঙালী বীর লুকিয়ে আছে; সে সময়ে এবং অসময়ে তার যাত্রার দলের পোষাকটা পরে আসরে নেমে পড়ে—তার হুঙ্কারে চারিদিকে হাততালি পড়্তে থাকে—তখন আর শরৎচন্দ্রকে চেনা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"একথা মানতেই হবে যে আজকের দিনে পৃথিবীতে পশ্চিমের লোক জয়ী হয়েছে। পৃথিবীকে তারা কামধেনুর মত দোহন করেছে, সে কোনো একটা সত্যের জোরে।"

শরৎচন্দ্র লিখ্ছেন—

"লোহা মাটিতে পড়ে, জলে ডোবে এ একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু একেই যদি মানুষ চরম সত্য ব'লে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্ত ত" ইত্যাদি।

শরৎবাবুর মত লোকে যে তথ্য এবং তত্ত্ব, 'ফ্যাক্ট' এবং 'ট্রুথে'র গোলমাল করেছেন, দেখ্লে আশ্চর্য্য লাগে। আসল কথা রাগ হলে লোকের আর যুক্তি থাকে না—বিশেষতঃ রাগ প্রকাশের জায়গাটা যদি এমন মাটিতে হয় যেখানে লোকে যুক্তি বা ন্যায়ের চেয়ে বা সত্যের চেয়ে একটা নাটকোচিত স্বদেশিয়ানার জন্য বাহবা দিয়ে থাকে। কতকগুলি অদ্ভুত কথার উপর ভিত্তি করে শরৎবাবু এই বিতণ্ডাটি প্রাণপণে খাড়া করেছেন, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ দু'চারটে তুলে দেই।

১। সংসারে জয় করা বা কেড়ে নেওয়ার বিদ্যেটাকেই একমাত্র সত্য ভেবে লুব্ধ হয়ে ওঠাই পশ্চিমের মানুষের বড় সার্থকতা এবং সেটার উপরেই রবীন্দ্রনাথের লোভ।—এটা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরচ্চন্দ্রের একটা আবিষ্কার বটে। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিন্তার ধারা আজ বাংলা সাহিত্যে নবশক্তিতে নবীন আলোকে, ভারতবর্ষের ধ্যান ও সাধনার পরমসম্পদ—এই বিশ্বব্যাপার ও মানবচেষ্টার অন্তরালে অজেয় আত্মিকশক্তির পরিচয়বার্ত্তাকে ঘোষণা করছে। এ খবর শরৎবাবুকে আমাদের দেবার দরকার আছে কি?

২। ইংরাজরা পৃথিবীকে কামধেনুর মত দোহন করেছে—কিন্তু আমরা উপবাসী রয়েছি। এ একটি ফ্যাক্ট, একেই চরম সত্য বলে রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্তে বলেছেন।

৩। পশ্চিমের সভ্যতার বোধ করি এই একটি মাপকাঠি—কে কত অল্প পরিশ্রমে কত বেশী মানব হত্যা করতে পারে। এদের কাছে বিজ্ঞানের এইটাই হচ্ছে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন। ইত্যাদি।

এ যেন নূতন 'লজিক' পড়া কলেজের ছেলের কথায় কথায় ছল ধরে তর্ক করা। 'সারভাইভেল অব্ দি ফিটেষ্ট'-এর রাজ্যে, জগতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর রূপে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, অর্থে, শক্তিতে জীবনের প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রে মাথা তুলে রাখ্তে পেরেছে—যাদের শ্রেষ্ঠত্বর দাবী এ যুগের কালের যাচাইয়ে পরখ হয়ে গেছে—ঠিক যেমন কোনও এক যুগে পূর্ব্ব দেশের শ্রেষ্ঠত্ব হয়েছিল—তাদের সেই শ্রেষ্ঠত্বকে তাদের অন্তর্নিহিত কোনো মহাশক্তির প্রকাশ বলেই জান্তে হবে—কোনো অঙ্কশাস্ত্রই তাকে ফাঁকতালে পাওয়া (এক্সিডেণ্ট) বল্বে না। সেই অন্তর্নিহিত মহৎ শক্তিই তাদের জীবনের মহৎ সত্য—বড় হবার সেই সত্য, একটা 'ইউনিভার্সাল ট্রুথ'। একদিন পূর্ব্ব দেশের লোক তার যে দিক সাধন করেছিল সে দিকে সে সিদ্ধি লাভ করেছিল—আজ পশ্চিম যদি তার কোনো দিকের সাধনায় বড় হয়ে থাকে তবে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখে তার কাছে তা শিখ্তে হবে বই কি—এতে রাগের কি আছে? যে লোকটা গায়ে ভীমের মত শক্তি সঞ্চয় কর্‌ল—তার গায়ের জোর একটা 'ফ্যাক্ট', সে মেছো-বাজারে গুণ্ডামি ক'রে ঠ্যাঠারি বাজারে বাড়ী তোলে এও একটা 'ফ্যাক্ট', কিন্তু তিলে তিলে যখন সে শক্তি সঞ্চয়ের সাধনা করেছে এবং সেই শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে, তার ভিতরকার রহস্য বা সত্য কি তার পরস্বাপহরণ না গুণ্ডামি? তার একনিষ্ঠতা, শক্তিলাভ করা যদি অভিপ্রেত হয় তবে তার সাধনার গূঢ় তত্ত্ব তার 'মেথড্‌স্' সব তার কাছ থেকে শিখতে হবে। তারপর আমরা আমাদের শক্তির ব্যবহার কি ভাবে করব তাই দিয়ে আমাদের মেণ্টালিটির (মতির) পরিচয় দেব।

যে বিদ্যুৎ দিয়ে তারা মারছে তাই দিয়ে মানুষকে বাঁচাচ্ছেও ত—সুতরাং মারবার কথাটাই যে একমাত্র ফ্যাক্ট তাও নয়—তাদের জীবনেও নয়। সেইটেই একান্ত ক'রে শেখবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথ দেন নি।

তাছাড়া, বড় হওয়া বিদ্যাটা ত মাত্র তাদের নর-হত্যাতেই প্রকাশ পায় নি? যে যুগ যুগ সাধনার দ্বারা তারা শক্তি সঞ্চয় করবার মন্ত্র-সকল তাদের জীবনে পরিণত করেছে, তাদের কাজে ও ব্যবহারে, নিষ্ঠায়, আত্মদানে, একাগ্রতায়, তাদের কাজ ও সময়ের সুনিয়ন্ত্রণে, তাদের শৃঙ্খলা ত সৌন্দর্য্যবোধের সাধনায়, ভদ্রলোক ব'লে পরিচিত হবার শিক্ষায় এবং সর্ব্বোপরি তাদের 'ডিসিপ্লিন ও 'ম্যানলিনেসের' চর্চ্চায় এবং কর্ম্ম সংসাধনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, তাদের জাতির অন্তর্নিহিত মহৈশ্বর্য্যের যে পরিচয় পাই, সেই ঐশ্বর্য্যেই তাদের চরিত্রের পরম সত্য। এই সত্যই তাদের বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথে আলোক স্বরূপ, মরু ও মেরু অভিযানের পাথেয়, পৃথিবীব্যাপী অধিকার বিস্তার ও প্রভুত্ব করবার শক্তির উৎস। এ নিয়ে রাগ ক'রে লাভ নেই। উত্তেজনা প্রকাশ করাই এই বই দুখানির অধিকাংশ প্রবন্ধের প্রকৃতি। সুতরাং সাময়িক উত্তেজনার খোরাক জুগিয়ে, সাময়িক কাগজের বিস্তৃতি গর্ভে নিহিত থাকলেই লেখক অন্ততঃ কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিজের প্রতি ও দশের প্রতি অধিক বিবেচনার কাজ করতেন ব'লে আমার বিশ্বাস। নানা ব্যক্তিগত কারণে চিত্ত যখন বিক্ষুব্ধ থাকে তখন যে সব কথা লোকে প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য ক'রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্চারণ করে তাতে বিচারবুদ্ধির চেয়ে উত্তেজনা প্রকাশ পায় বেশী, তাকে সত্যের সামনে বসিয়ে চিরস্থায়ী করবার বুদ্ধিকে সুবুদ্ধি বলা চলে না। সুতরাং এর মধ্যেকার সেই কটি প্রবন্ধ অন্ততঃ ধ্বংস পাবার যোগ্য।

শ্রীজীবনময় রায়।

Talleyrand—By Duff Cooper, (Jonathan Cape).

এককালে জীবনচরিত লিখন নীরস ঘটনা-নির্ঘণ্ট মাত্র ছিল। কিন্তু কয়েক-বৎসর যাবৎ এক নূতন শ্রেণীর পুস্তক রচিত হইতেছে যাহা একাধারে জীবনী ও ইতিহাস, সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। আলোচ্য পুস্তক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মন্ত্রীবর তালের্ঁার জীবনকাল কিঞ্চিদধিক অশীতিবর্ষ। এই অশীতিবর্ষের অদ্ভুত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আধুনিক ভারতবাসী আমাদের বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। কুপার সাহেব তালের্ঁাকে উপলক্ষ করিয়া ঐ যুগের ইউরোপীয় রাজনীতির ক্রম-বিকাশ এমন প্রাঞ্জল করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইতিহাসে অনভিজ্ঞ পাঠকও সহজেই তাহা বুঝিবেন। এই মহাপুরুষ ইতিহাসে যেন এক অতিকায় কলোসাস্। তাঁহার বামপদ বুর্বন যুগে, দক্ষিণপদ বিক্টোরীয় যুগে। আর এই দুইযুগের মধ্যবর্ত্তী কালের ঘটনাপরম্পরার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। কিরূপ আবেষ্টনের মধ্যে এই অসাধারণ ধীসম্পন্ন পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার শৈশবের ও যৌবনের শিক্ষা হইল, কি প্রকারে ধীরে ধীরে তিনি ফরাসীদেশের সর্ব্বপ্রধান রাষ্ট্রনীতিবিৎ বলিয়া

খ্যাত হইলেন, তাহা কুপার সাহেব উপন্যাসের ন্যায় সরসভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভাষা বাস্তবিকই চমৎকার। গাম্ভীর্য্য, কবিত্ব ও শ্লেষের অপূর্ব্ব সমন্বয়। লেখকের পাণ্ডিত্যের কথা বলাই বাহুল্য। তিনি তাঁহার ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ যে কত স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পাঠক পরিশিষ্টে দেখিতে পাইবেন। দেখিলে বুঝিবেন যে তাহার জন্য গ্রন্থকার কি কঠিন পরিশ্রম করিয়াছেন। এই কঠিন শ্রমের প্রয়োজনও যথেষ্ট ছিল। কেননা এতাবৎকাল তালের্ঁাকে লোকে অসাধারণ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বলিয়া জানিলেও স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-প্রেমিক বলিয়া মনে করিত না। এতদ্দেশে কৌটিল্য ও যবন দেশে মাকিয়াবেলী যে কুটিল রাজনীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা অনেকেই তালের্ঁাকে সেই নীতির মূর্ত্তিস্বরূপ বলিয়া জানিতাম। কুপার এই মন্ত্রীপ্রবরের কার্য্যাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে এ ধারণা ভ্রান্ত। কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা পাঠক বিচার করিবেন।

কোনও খ্যাতনামা ব্যক্তির গুণাগুণের যথাযথ পরিমাণ করিতে হইলে তাঁহার নিজ যুগের মাপকাঠি লইতে হইবে। কেননা, ন্যায়ান্যায় সম্বন্ধে ধারণা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর তালের্ঁার দোষগুণ বিচার করিবার সময় সপ্তদশ শতাব্দীর পিউরিটান শুচিবায়ু, কি উনবিংশ শতাব্দীর বিক্টোরীয় ভব্যতার আদর্শ লইলে চলিবে না। যে যুগে পম্পাদুর ও দ্যুবারীর কক্ষ হইতে ফ্রান্সের শাসন-কার্য্য পরিচালিত হইত, যে যুগে প্রত্যেক নূতন দার্শনিক চিন্তার ধারা গণিকার সালঁতে প্রবর্ত্তিত হইত, যে যুগে কবি তাঁহার প্রত্যেক নূতন কবিতা লইয়া প্রণয়নীর বৈঠক-খানার দিকে ধাবমান হইতেন, সেই তালের্ঁার যুগ। সুতরাং তাঁহার কার্য্যাবলী বাইবেলের অনুশাসন-অনুযায়ী হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

তালের্ঁার জন্ম সাবেক ফ্রান্সের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ঘরে (১৭৫৪)। সাবেক ফ্রান্স বটে, কিন্তু নামে মাত্র। রাজকুলরবি চতুর্দ্দশ লুইয়ের অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী শাসনের ফলে দেশের অভিজাত শ্রেণী এখন রাজার আসাসোটাবরদারের দলভুক্ত হইয়া গিয়াছেন। প্রিন্স আছে, ডিউক আছে, কাউণ্ট আছে, আছে সবাই। কিন্তু তাহাদের একমাত্র কাজ খুব জমকালো সুবর্ণখচিত মখমলের পোষাক পরিয়া রাজার চতুর্দ্দিকে গ্রহ-উপগ্রহের মত বিবর্ত্তন। আর সাধারণ প্রজা, যাহাদিগকে এই জরি-পরিহিত চোপদারেরা canaille বলিত তাহাদের উদরে অন্ন নাই; কিন্তু তাহারা ইতিমধ্যে কখন নিঃশব্দে শনৈঃ শনৈঃ রাজদরবারের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাদিগকে আর রিক্তহস্তে গৃহে ফেরানো অসম্ভব। তাহাদের উপদেষ্টা, তাহাদের গুরুস্থানীয় বল্‌টেয়ারপ্রমুখ ভাবুকের দল তাহাদের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে। বলটেয়ার রাজদরবারে ফিরিতেন বটে, কিন্তু তিনি গুরুগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "জগতের প্রথম রাজারা ত ভাগ্যবান সৈনিকমাত্র ছিলেন। দেশের যে যথার্থ সেবক, তাহার বংশগৌরব নিষ্প্রয়োজন।" নৃপতি উপ-নৃপতিদিগের দিন ফুরাইয়াছে, ধর্ম্মযাজকের প্রভাব অন্তর্হিতপ্রায়—একথা সকলেই বুঝিয়াছিল। রাজার আপন বংশের চৌহদ্দির মধ্যেও এই নূতন চিন্তাস্রোত প্রবেশ করিয়াছিল। কালবৈশাখী তখনও বহুদূরে, ঈশান কোণের আকাশ তখনও সুন্দর নীল, তবু যেন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস, একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি সমস্ত জাতির মন চঞ্চল ও

অশান্ত করিতেছিল। পরম ভট্টারক লুই যে ইংরেজ জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, যে ইংরেজের রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার মোসাহেব মাত্র ছিল, সেই ইংরেজের হস্তে শেষ জীবনে তাঁহার দুর্দ্দশার একশেষ হইল। মার্লবরার হস্তে লুইয়ের নিগ্রহের কথা পড়িয়া রাজপুত মারাঠার হস্তে বৃদ্ধ আলমগীরের লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ে। কি বুর্বন কি মোগল, কেহই বুঝিলেন না যে জীর্ণ অট্টালিকার সংস্কার করিয়া বাহিরের ঠাট বজায় রাখা যায় কিন্তু তাহাকে আর মজবুত করা যায় না। উপরন্তু মেরামতের খরচ দুঃসহ হইয়া পড়ে। যখন রাজকুলরবি লুই অস্তমিত হইলেন, তাঁহার জন্য কেহই কাঁদিল না। রাস্তার canaille তাঁহার কফিনের উপর কর্দ্দম নিক্ষেপ করিল। লুই গেলেন কিন্তু ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের স্থায়ী বোঝাপড়া হইল না। কথায় কথায় ঝগড়া বাধিতে লাগিল। অবশেষে তালের‍াঁর জন্মের সময় যে সাত বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ চলিল তাহাতে ফ্রান্সের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। Wandiwash-এ ফরাসীর ভারত-সাম্রাজ্যের স্বপ্ন চূর্ণ হইল, কুইবেকে কানাডার রাজ্য বিধাতাপুরুষ ইংরেজের হস্তে তুলিয়া দিলেন। তবু ফরাসীজাতি ইংলণ্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়িল না। ভারতের নানা রাজদরবারে, আমেরিকার নানা উপনিবেশে লালী, বুসী লাফায়েতের ন্যায় ফরাসী বীর প্রতিহিংসার পথ দেখিতে লাগিলেন। ভারতে প্রতিশোধ হইল না। ভারতের ভাগ্যদেবতা ইংরেজকে দুলাল বলিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। আমেরিকায় ফ্রান্সের প্রচেষ্টা বৃথা গেল না। U. S. A. নামে এক উজ্জ্বল নবীন নক্ষত্র রাজনৈতিক গগনে উদিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডের এই রাজ্য-ক্ষয়ে ফ্রান্সের দুঃখ ঘুচিল না। কিরূপে ঘুচিবে? ফ্রান্সের অবস্থা তখন সঙ্গীন। রাজ্যের সমস্ত বোঝা একা বৃদ্ধ বুর্বন রাজার দুর্ব্বল স্কন্ধে। দেড় শত বৎসরেরও অধিককাল প্রজার প্রতিনিধিগণ একত্র হইতে পায় নাই। যাহারা পূর্ব্বে সামন্ত ভৌমিক ছিল তাহারা আজ মোসাহেব মাত্র। ঋণজালে জড়িত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় রাজা কাহার সাহায্য চাহিবেন? এরূপ অবস্থায় পড়িলে সাধারণ গৃহস্থের যে দশা হয় রাজারও তাহাই হইল। ভণ্ডগুরুও টোটকা চিকিৎসকের কবলে পড়িলেন। নূতন নূতন মন্ত্রী বাহাল হইতে লাগিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হইল না। কালে লম্পট বৃদ্ধ রাজা পরলোকে গমন করিলেন। সচ্চরিত্র ধীর-প্রকৃতি ষোড়শ লুই সিংহাসনে বসিলেন। লোকে অনেক আশা করিতেছিল। চ্যানেলের আর পারে ইংলণ্ড। সেখানকার লোকে রাজ্যের কি সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। রাজা আছেন, কিন্তু তিনি রাজ্যশাসন করেন না। জরীমখমল পরিয়া সাক্ষীগোপালের মত সিংহাসনে বসিয়া থাকেন। তৃতীয় জর্জ হাতে রাজদণ্ড লইতে গেলেন কিন্তু আমেরিকা হারাইয়া অপদস্ত হইয়া পার্লামেন্ট দমনের দুরাশা ত্যাগ করিলেন। কমন্‌স্-সভা দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা। এরূপ ব্যবস্থা ফ্রান্সে করিতে পারিলে কি চমৎকার হয়! নেতৃস্থানীয় অনেক ফরাসীরই এই মত। তাঁরা চান ইংলণ্ডের সহিত সখ্য স্থাপন ও ফ্রান্সে নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র প্রবর্ত্তন। তালের‍াঁর প্রথম হইতেই এই মূল মন্ত্র ছিল। কুপারের মতে এই নীতি হইতে তিনি কখনও বিন্দুমাত্র স্খলিত হন নাই। পঞ্চাশ বৎসর নানা বাধা বিপত্তির পর তিনি এই নীতি অনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ১৮৩০ সালে। কিন্তু ১৭৮৬ সালে ও ১৭৯১ সালেও তিনি এই মতই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক গিজো বলিয়াছেন যে বুর্বনদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার অর্থ ১৭৯১-এর constitution-এর পরাজয় ও ইংরেজী

constitution-এর জয়। বলটেয়ার মণ্টেস্কিউর মত ভাবুকও ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

কুপার সাহেব তালের‍াঁর প্রেমপ্রবণতা, অর্থলোলুপতা, কিছুই ঢাকিবার চেষ্টা করেন নাই। এ কথাও বার বার স্বীকার করিয়াছেন যে মন্ত্রীপ্রবর নিমকের মর্য্যাদা কখনও রাখেন নাই। কিন্তু কুপারের মতে তিনি তাঁহার ফ্রান্স দেশকে দেশের রাজা বাদশাহের অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া দেখিতেন। তাই অখণ্ড ফ্রান্সের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি আপন প্রভুর স্বার্থবলি দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। আমার বক্তব্য যে আর যাহার স্বার্থই বলি দিয়া থাকুন তালের‍াঁ নিজের স্বার্থ কোন দিন বলি দেন নাই। কুপার সাহেবের মত দুচার ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

Every change of allegiance that he made was made by France. * * * Like France he responded to the ideals of 1789 and believed in the necessity of the Revolution; like France he abominated the Terror, made the best of the Directory, and welcomed Napoleon as the restorer of order and the harbinger of peace: like France he restored tyranny and grew tired of endless war and so reconciled himself to the return of the Bourbons. When Charles X proved impossible he turned rather wearily, but not without hope, to Louis-Philipe, and once again he reflected the mood of his country. Constitutional monarchy, the maintenance of order and liberty at home, peace in Europe and the alliance with England, to these principles he was never false—and he believed that they were of greater importance than the Kings and Emperors, Directors and Demagogues, Peoples and Parliaments that he served." (P. 354).

আলোচ্য পুস্তক যতই সুলিখিত হউক না কেন, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের মনে সন্দেহ থাকিবে যে এই অসীম প্রভাবশালী মন্ত্রীপ্রবরের কোন principles ছিল কিনা।

সাবেক ফ্রান্সে সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেদের জীবন নির্ব্বাহের দুই পন্থা ছিল। তাহারা হয় সেনানী হইত, নয়ত ধর্ম্মযাজক। তালের‍াঁর বাল্যকালে এক পায়ে আঘাত লাগায় তাঁহার সেনানী হওয়ার পথ বন্ধ হইল। অতএব তাঁহাকে পাদরী হইতে হইল। কিন্তু সামান্য পুরোহিতের (Abbe) কাজ করিয়া জীবন কাটানো এরূপ প্রতিভাবান পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। তালের‍াঁ ধর্ম্মযাজক হইলেও ধর্ম্মপরায়ণ কোনদিন ছিলেন না। তাঁহার কিছুই বাধিত না। কনিষ্ঠ ভ্রাতা count হইয়া পৈতৃক জমীদারী সব পাইলেন। জ্যেষ্ঠ তাহাতে ভগ্নোদ্যম না হইয়া, নিজ বুদ্ধিবলে উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে লাগিলেন। সমসাময়িক প্যারিসে স্ত্রীলোকের প্রভাব কত বেশী ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তালের‍াঁ একজনের পর একজন সুন্দরীকে সারথি করিয়া তাঁহার জীবনরথ চালাইতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর বয়সেই এক সুন্দরীর চেষ্টায় কার্ডিনালের লাল শিরোপা তাঁহার প্রায় হস্তগত হইয়াছিল, কেবল স্বয়ং মহারাণীর শত্রুতায় কার্য্য পণ্ড হইল। অবশেষে নিজ পিতার সুপারিশে বিশপ হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বিশপ মহোদয় Agent-General of the Clergy-র পদ পাইলেন। যখন ১৭৮৯ সালে চতুর্দ্দিকে বিপদজালে বেষ্টিত অল্পবয়স্ক রাজা ষোড়শ লুইকে বাধ্য হইয়া প্রজা মহাসভা (States General) ডাকিতে হইল

তখন তালের্াঁর উপযুক্ত সুযোগ মিলিল। তিনি সভার সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যোগ দিলেন। শুধু যোগ দিলেন তাহাই নহে, চলিত ভাষায় যাহাকে মোড়লী বলে তাহাই করিতে লাগিলেন। বিশপ মহোদয় কোন দলেরই লোক ছিলেন না। রাজকুমার আর্তোয়া, মন্ত্রী কালন, বিপ্লবপন্থী মিরাবো ও দাঁত্ঁ সকলের সঙ্গেই তাঁহার সৌহার্দ্য ছিল। প্রয়োজন মত সকলের সহায়তা করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিলেন। নিজে বিশপ ছিলেন, তথাপি যখন সুবিধা বুঝিলেন সমস্ত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করাইবার উদ্যোগ করিলেন। রাজাকে দূর করিয়া দিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন তাঁহার অভিমত ছিল না, তথাপি কার্য্যতঃ তিনি সেই সাধারণতন্ত্রের দূত হইয়া ইংলণ্ডে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গেলেন। যখন Terror-এর তাণ্ডব আরম্ভ হইল, রাজা রাণী গিলোটীনে গেলেন, তখন তালের্াঁ ইংলণ্ডেই আশ্রয় লইলেন। রবেস্পিয়ারের মন্ত্রীরা তাহাকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল। কিছুদিন পরে তিনি ইংলণ্ড ছাড়িয়া আমেরিকায় গেলেন। সেখানে তখন প্রজাতন্ত্রের অত্যন্ত কদর। তালের্াঁ সেই সূত্রে খুব খাতির জমাইলেন ও নিজের নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া লইলেন। অর্থও যথেষ্ট সঞ্চয় করিলেন। এইরূপ যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সঞ্চয় সেই যুগে সকলেই করিতেন। সেজন্য যদি Fox, Clive, Hastings-কে অর্থপিশাচ না বলা হয়, ত ইঁহাকেও বলা চলিবে না।

ফ্রান্সে ডিরেকটরী স্থাপন হইলে পর তালের্াঁ দেশে ফিরিলেন। বারাস তখন প্রধান ডিরেকটর ছিলেন। Madame de Stael-এর আনুকূল্যে তাঁহাকে মুরুব্বী ধরিলেন ও অল্পকালের মধ্যেই আপন কূটবুদ্ধির বলে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইলেন। গল্প আছে যে এই পদ লাভ করিয়া তালের্াঁ অনেকক্ষণ আপন মনে অস্ফুট কণ্ঠে বিড়বিড় করিয়াছিলেন, "অগাধ অর্থ, অগাধ সম্পত্তি"। বারাস বা কেহই তাহাতে আশ্চর্য্য হন নাই। সে যুগে ত আর William Pitt বেশী ছিল না। মন্ত্রীবর পররাষ্ট্র সচীব ছিলেন, সুতরাং পররাষ্ট্রের নিকট হইতে দুই হস্তে পয়সা লুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নূতন প্রেমিকা জুটিতে বিলম্ব হইল না। এই প্রেমিকাকে তিনি পরে যথারীতি বিবাহ করিয়া Princesse de Talleyrand নাম দিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত আমাদের কলিকাতার একটু যোগ ছিল। ইনিই ছিলেন সেই Madame Grand যাঁহার জন্য Phillip Francis দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে।

এই সময়ে নেপোলিয়ন ইটালীদেশে সেনাপতির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তালের্াঁর লোক চিনিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। অমাত্য হইয়াই তিনি সেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া নেপোলিয়ন বুঝিলেন যে রাজধানীতে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত বিচক্ষণ বন্ধু আছেন। পরস্পর সাক্ষাতের পূর্ব্বেই এই দুই মহাপুরুষের পত্রদ্বারা ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। তালের্াঁ প্যারিসে বসিয়া ভিতর হইতে ডিরেকটারীর ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিপাত করিয়া ফরাসী দেশের হৃদয় জয় করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীবরের এই সময়ের কার্য্যক্রম সম্বন্ধে কুপার বলিতেছেন,—

"It was typical of Talleyrand that in this, as in every other channel of the vast labyrinth of intrigue, he fulfilled himself no definite function, but served only as the go-between, acquainted with

everybody, knowing everything, and holding in his hands the end of every string."

ডিরেকটরীর শেষ করিতে মন্ত্রীবরের বেশীদিন লাগিল না। নেপোলিয়ন কন্সল উপাধি লইয়া দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া বসিলেন। তালেরাঁর পরামর্শে তিনি ফরাসী রাষ্ট্রের পুনর্গঠনে মনোযোগ করিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার মানসে ইউরোপে শান্তি আনয়নের প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাবেক কালের অভিজাত মণ্ডলীকে দেশে ফিরিতে আমন্ত্রণ করা হইল। এমন কি, বুর্বন রাজকুমারদের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। এ সমস্ত ব্যাপারে তালের্াঁ মধ্যস্থ ছিলেন। কিন্তু তখনও বুর্বন বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল নেপোলিয়নকে ফ্রান্সে সর্ব্বেসর্ব্বা করা। তাহাই করিলেন। পাঁচ বৎসরের মধ্যে কন্সল সম্রাট নাম লইয়া সিংহাসন অধিরূঢ় হইলেন। সীজার ক্রমওয়েল যাহা সাহস করেন নাই নেপোলিয়ন তাহা করিলেন। পরন্তু এই কার্য্যের ফল অপ্রত্যাশিত রকমের হইল। রাজচক্রবর্ত্তীর নজর আর দেশের আভ্যন্তরীন উৎকর্ষসাধনের দিকে রহিল না। কি করিয়া ইউরোপের সর্ব্বদেশে সম্রাটের গরুড়-লাঞ্ছিত ধ্বজা উড়িবে সেই চিন্তাই সার হইল। সচীব তালেরাঁ কন্সলের ভালমন্দ সকল কার্য্যেরই প্ররোচক ও সহায় ছিলেন। এমন কি, এঙ্গীয়ানের নৃশংস হত্যা-কাণ্ডেও তিনি লিপ্ত ছিলেন, যদিও কুপার সাহেবের সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু কয়েকবৎসরের মধ্যেই (১৮০৯) বাদশাহের সহিত তাঁহার মতভেদ হইতে লাগিল। তালেরাঁ ফ্রান্সের মঙ্গলকামী ছিলেন, নিজের স্বার্থও যথেষ্ট বুঝিতেন, কিন্তু নিরর্থক দিগ্বিজয়ের সমর্থন তিনি করিতে পারিলেন না। বোনাপার্ট-বংশের গৌরব সাধনেও তাঁহার আগ্রহের একান্ত অভাব ছিল। নেপোলিয়ন মন্ত্রীকে ভালবাসিতেন। তথাপি তিনি সম্রাট, তাঁহার কার্য্যে মন্ত্রী আগ্রহ দেখাইবে না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। একদিন দুইজনের কলহ হইল ও তালেরাঁ অমাত্যের কাজে ইস্তফা দিলেন। ইস্তফা দিলেন কিন্তু রাজসভা ত্যাগ করিলেন না। Vice Grand Elector নামে দরবারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিলেন। বাদশাহ প্রয়োজনমত তাঁহাকে দৌত্য কার্য্যে পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু মন্ত্রীর হৃদয়ে আর প্রভুভক্তির লেশমাত্র ছিল না। অষ্ট্রিয়ার রাজকুমারীর সহিত সম্রাটের বিবাহের ঘটকালী যে তিনি করিলেন তাহা নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ইউরোপের শান্তি সম্বন্ধে চিরদিন তাঁহার যে কল্পনা ছিল অষ্ট্রিয়া ধ্বংস হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইবে। সেই জন্যই অষ্ট্রিয়াকে রক্ষা করিবার পাকা বন্দোবস্ত করিলেন। ১৮০৯ এর পর তালেরাঁ একনিষ্ঠভাবে ভিতর বাহির দুইদিক হইতেই নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সম্রাটের কালপূর্ণ হইয়াছে। ফরাসী জাতিও বিনা-কারণে যুদ্ধে শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নেপোলিয়নের পরাজয়, বুর্বনদের প্রত্যাগমন সহজেই সাধিত হইল। তালেরাঁর প্রভাব এই সময়ে এমন আশ্চর্য্য রকমের ছিল যে রুশিয়ার জার প্যারিসে আসিয়া তাঁহার গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। বুর্বনরাজা মুকুট পরিলে তালেরাঁ আবার পররাষ্ট্র সচীব হইলেন। ফ্রান্সের প্রতিনিধি হইয়া তিনি বিয়েনা কংগ্রেসে স্বদেশের সহিত ইউরোপের সন্ধি স্থাপন করিলেন। এমন সর্ত্তে সন্ধি হইল যেন ফ্রান্স যুদ্ধে কাহারও হস্তে পরাজিত হয় নাই।

তার পর সম্রাটের এল্‌বা হইতে পলায়ন, একশত দিবসের জন্য পুনরায় সিংহাসন অধিকার, এবং সর্ব্বশেষে ওয়াটারলুতে নেপোলিয়ন-নাটকের যবনিকা পতন। এই একশত দিবস তালেরাঁর অবস্থা কতকটা ত্রিশঙ্কুরের মত হইয়াছিল। স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া তুই রাজার দরবার হইতেই দূরে বসিয়া রহিলেন। যখন ওয়াটারলুতে সম্রাটের নিঃসন্দেহ পরাজয় হইল, তখন মন্ত্রী লুইয়ের নিকট গেলেন কিন্তু লুই তাঁহাকে আদর অভ্যর্থনা কিছুই করলেন না, তখন তালেরাঁ মন্ত্রীত্বে ইস্তফা দিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পর পঞ্চদশবর্ষ তাঁহার রাজদরবারের সহিত কোন যোগ রহিল না।

কিন্তু ১৮৩০ সালে, বৃদ্ধবয়সে পুনরায় তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন। অবস্থা অনুকূল, প্রজারা বুর্বন রাজার উপর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়াছে। প্রজাদলের একজন উপযুক্ত নেতাও প্রস্তুত। তালের‍াঁ আবার বিপ্লব বাধাইলেন এবং ফ্রান্সের রাজমুকুট অর্লেয়াঁ বংশের লুই ফিলিপের মাথায় পরাইয়া দিলেন। এবার কিন্তু মন্ত্রীত্ব লইলেন না। অর্থ যথেষ্ট সঞ্চয় হইয়াছিল, শুনা যায়, এক উৎকোচ গ্রহণের দ্বারাই তিনি ছয় কোটী ফ্রাঙ্ক সঞ্চয় করিয়াছিলেন। লোকে তামাসা করিয়া বলিত, প্রিন্স যাহা স্পর্শ করেন তাহাই স্বর্ণ হইয়া যায়। লুই ফিলিপের দূত হইয়া তিনি লণ্ডনে গেলেন এবং সেখানে ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁহার চিরদিনের ইচ্ছানুযায়ী বন্দোবস্ত করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

১৮৩৪ সালের পর আর সরকারী চাকরীর সহিত প্রিন্সের সংস্রব ছিল না। চারি বৎসর পরে, ৮৪ বর্ষ বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। লোকের কিন্তু বিশ্বাস, যে তাঁহার শেষ দিন পর্য্যন্ত ফরাসী রাজদরবারে যাহা কিছু ঘটিতেছিল সবেতেই তাঁর হাত ছিল। তিনি স্বহস্তে তাঁহার জীবনের আশ্চর্য্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বারণ ছিল তাই সেই আত্মজীবনী ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এখন হইয়াছে। কুপার সাহেব সেই পুস্তক হইতে তালের‍াঁর আপন মন্তব্য স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ সত্যবাদী বলিয়া খ্যাত ছিলেন না, তাঁহার আপন কৈফিয়ৎ সর্ব্বত্র অমিশ্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবার কারণ নাই।

আলোচ্য পুস্তকে তালের‍াঁর কয়েকটী চিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দেখিয়া মনে হয় তিনি সুপুরুষ ছিলেন। তবে যে নট এত বড় রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য তুচ্ছ পদার্থ, তাহার আকর্ষণী শক্তি অন্তরের গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

বাংলা ছন্দের মূলসূত্র—শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত (প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থকার, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর ; অথবা দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা)

এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিলো যে বাংলা ছন্দ সংস্কৃত আর্য্যার সন্তান ; কিন্তু যে-জৈব নিয়মের শাসনে প্রাণীমাত্রেই বংশানুক্রমিক অবনতির অধীন, তারি প্রভাবে আর্য্যার মাত্রিক পবিত্রতাও বাংলায় আর অবিমিশ্র নেই। শিশুশিক্ষার অন্যান্য কুসংস্কারের মতো এ-ধারণাও শেষ পর্য্যন্ত টিকলো না ; প্রয়োগের তাগিদে এবং

তার্কিকের নির্ব্বন্ধে মানতে হলো যে বাঙালীর ছন্দশাস্ত্র মূলে হয়তো আর্য্য ঐতিহ্যের ঋণমুক্ত। কিন্তু বাল্য প্রত্যয় ক্ষণস্থায়ী হলেও, তার উপসর্গ দুর্ম্মর। তাই সংস্কৃতের মোহ একেবারে কাটাতে না-পেরে, আমি জোর দিলুম প্রাচীন ছান্দসিকদের একটা নাতিপ্রয়োজনীয় বিধানের উপরে, যার কল্যাণে পদান্ত্য বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা কবির রুচিসাপেক্ষ। অবশ্য কেবল এই বিধিমতোই যে বাংলা কবিতার ছন্দোলিপি বানানো যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তাই কোনো এক অখ্যাত আলঙ্কারিকের কাছ থেকে আরেকটা নিয়ম ধার করলুম, যাতে ক'রে আর্য্যায় যতি ও ছেদের অভিন্নতা প্রমাণ হলো। কিন্তু এতেও যখন বাংলার মাত্রাপরিমাণ পেলুম না, তখন ওই দুই বিধানের সমর্থনে এক তৃতীয় বিধানের পরিকল্পনা করলুম যার ফলে বাংলা কাব্যে শব্দান্ত্য বিরাম আবার যতি ও ছেদের সমকক্ষ হয়ে উঠলো।

সুবিধার খাতিরে নিয়ম নির্ম্মাণের নামই অবৈধতা ; এবং আমার উপরোক্ত বিধিগুলি সেই অভিধারই উপযুক্ত। তবু আমার মনোভাব যুক্তির প্রসাদ থেকে একেবারে বঞ্চিত ছিলো না। আত্মজিজ্ঞাসাকে আমি এই ব'লে নিরস্ত করতে চেয়েছিলুম যে বাংলার উচ্চারণপদ্ধতি সংস্কৃতের মতো একটানা না-হওয়াতে বাংলা ছন্দে প্রতি শব্দের শেষে যে-অবকাশ আসে, তা সংস্কৃততে শুধু চরণান্তেই বর্ত্তমান ; কিন্তু এই দুই অবকাশের কালপরিমাণ যদি এক হয়, তবে তাদের ধর্ম্মও এক হবে এবং পদান্ত্য বর্ণের মতো প্রাগযতি অথবা প্রাগ্‌বিরাম বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতাও স্বয়ম্বশ হতে বাধ্য। অনুমানটা হয়তো নিতান্ত অন্যায্য নয় ; কিন্তু এত ক'রেও সকল সমস্যা মিটলো না। অনেক পরিচিত দৃষ্টান্তে এই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্কৃত বিধির ব্যতিক্রম তো ঘটলোই, এমন-কি বাংলা কাব্যের একটা বিরাট বিভাগ, অর্থাৎ স্বরমাত্রিক ছন্দ, এই নিয়মের বশ্যতা কোনোমতেই মানলে না। বরং তাকে বিজাতীয় ছন্দরীতির সাহায্যে বোঝা গেলো, তবু সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্ত করা গেলো না। স্বরমাত্রিককে বৈদেশিক আখ্যা দিতে পারলে, হয়তো গোলোযোগ চুকতো, কিন্তু সেদিকে কোনো সুরাহা ছিলো না। কারণ মেয়েলি ছড়া এবং গ্রাম্য প্রবচন ইত্যাদি যে-ছন্দে রচিত, তাকে পরদেশী বললে, বাংলার প্রাণবস্তুকেই অস্বীকার করা হয়। কাজেই বহু প্রসিদ্ধ ছন্দোবিদের অনুসরণে বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক দ্বৈত মেনে নিয়ে, আমি মনে মনে স্থির করলুম যে স্বরমাত্রিক ছন্দই বাংলা কাব্যের আদিম বাহন ; তবে তার উৎপত্তি প্রাক্‌সংস্কৃত যুগে হওয়াতে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের অপ্রাকৃত বিধিবদ্ধতা তার নাগাল পায়নি ; কিন্তু জগতের সকল কাব্যকলার মূল নিশ্চয়ই এক ; সংস্কৃত সাহিত্য স্বেচ্ছায় সেই সহজতাকে পরিহার করেছিলো, তাই বাংলা ছন্দের যে-অংশটা সংস্কৃত-গন্ধী, তার নিয়ম জগতের অন্যান্য ছন্দপদ্ধতির অনুরূপ নয়, যেটা অবিকৃত, তার সঙ্গে বাহিরের সংযোগ সুস্পষ্ট।

এই অদ্ভুত ধারণার ইতিহাস প'ড়ে, অনেকেই হয়তো হাসবেন। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত নই ; কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ যে-ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষক, তার আনুগত্যে অসম্মান নেই, আছে কেবল গৌরব। আমি ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি, পূর্ব্বসূরিগণের সাধনালব্ধ সিদ্ধান্তকে অকারণে বা অল্পকারণে উপেক্ষা করা আমার স্বভাবে বাধে। উপরন্তু বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্করণ বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার অন্তর্গত এবং বিজ্ঞানে অদ্বিতীয় সত্যের স্থান নেই। বৈজ্ঞানিক নিব্যূঢ়তার পূজা করেন না, তিনি খোঁজেন

অনুমিতির ব্যাপকতা। তিনি জানেন যে পৃথিবীকে অচল ভেবে তার চারদিকে সূর্য্যকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানোয় সত্যের অপলাপ হয় না, হয় শুধু অনুমিতি-সংখ্যার অনাবশ্যক বৃদ্ধি। অর্থাৎ পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বললে যতগুলি সমস্যার সমাধান করতে হয়, সূর্য্যকে কেন্দ্রে বসালে ততগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না ; তাই বৈজ্ঞানিক সারল্যের খাতিরে আমাদের জগৎকে সৌরকেন্দ্রিক ব'লেই পরিকল্পনা করেন। ছন্দ-সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে। এখানেও সত্যাসত্যের ভাবনা ভাবা অসার্থক, যেটা আলোচ্য সে হচ্ছে এই যে নবতর অনুমান অধিক ব্যাপক কিনা। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকরণেও বাংলা কাব্যের ছন্দোলিপি করা সম্ভব, কিন্তু তাহলে বাংলা ছন্দকে দ্বিধা- বা ত্রিধা-বিভক্ত ব'লে মনে করতে হয়। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য ক'রেও আমি বাংলা ছন্দের ঐক্য খুঁজি, এবং যখন অন্বেষণ সার্থক হয়, তখনো তাঁর অভিজ্ঞতাকে মূল্যহীন ভাবি না, শুধু মানি যে তাঁর পশ্চাদ্বর্ত্তীরা সারল্যের দিকে অপেক্ষাকৃত অধিক এগিয়েছেন।

আমি যত দূর জানি, এই ঐক্যসাধন ব্রতের প্রথম পুরোধা হচ্ছেন শ্রীযুক্ত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। এ-সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফলাফল ইংরেজিতে লিপিবদ্ধ ক'রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। "বাংলা ছন্দের মূলসূত্র"-নামক আলোচ্য পুস্তিকাখানি সেই সন্দর্ভের সংক্ষেপসার। বইখানির রচনারীতি দেখে মনে হয়, গ্রন্থকার বাংলা লেখায় এখনো অনভ্যস্ত। তাছাড়া তাঁর অপ্রাঞ্জল পরিভাষা, ছাপার ভুল এবং ব্যাখ্যার অভাব ইত্যাদি দোষ বইখানির রসগ্রহণের যথার্থ অন্তরায়। কিন্তু এ-সকল দুর্ব্বোধ্যতা এবং দৃষ্টান্ত উদ্ধারে অমার্জ্জনীয় ভুলচুক সত্ত্বেও, অন্তত আমার মনে আর কোনোই সন্দেহ নেই যে অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতিসম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়। এই প্রশংসা অমিত হ'লেও বিবেচনাসম্ভূত। সত্য বলতে কি, অমূল্যধনের লেখা যখন প্রথমে সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে পড়ি, তখন মনে কেবল প্রতিবাদই জেগেছিলো ; কিন্তু তাঁর প্রতিপাদ্য পুস্তকাকারে হাতে পাওয়ার পরে, আমার মুখ্য আপত্তিগুলির বোধহয় আর একটাও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য এখনো ছোটখাট অনেক বিষয়ে কৌতূহলের তৃপ্তি হয়নি, কিন্তু তার জন্যে হয়তো আমার স্থূল বুদ্ধিই দায়ী। অমূল্যধন যদি তাঁর সূত্রগুলিকে উদাহরণ-সমেত সবিস্তারে লেখেন, তবে আর কোনো অভিযোগ থাকবে না ব'লেই আমার বিশ্বাস। কারণ যাঁর দৃষ্টিতে ছন্দের সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে তিনি কোনোমতেই পরাস্ত হতে পারেন না।

জয়-পরাজয়ের কথা বাধ্য হয়ে পাড়লুম ; কারণ ছন্দ-যুদ্ধ আজকালকার সাময়িকীর প্রধান উপকরণ। এই বাক্‌বিতণ্ডার—অনেক সময়ে ভদ্রতাবিরুদ্ধ বাক্‌বিতণ্ডার, অনেকখানিই আমার বুদ্ধির অতীত ; কেননা ছন্দসম্বন্ধে আমার কতকগুলো কার্য্যকারী ধারণা থাকলেও, এ প্রসঙ্গে গভীর অনুশীলন আমি কখনো করিনি। তবে যতটা বুঝি, তাতে মনে হয়, তর্ক মূলত বাংলা ছন্দের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে। অবশ্য বাংলা ছন্দ যে বস্তুত ত্রিপথগা, তা কোনো পক্ষই অস্বীকার করেন না, অস্বীকার করার উপায়ও নেই, কারণ এই বিভাগ তিনটি কেবল অনুমানসাপেক্ষ নয়, শ্রুতিগোচরও বটে। কাজেই দ্বন্দ্ব প্রভেদের স্বরূপ-সম্বন্ধে। অমূল্যধনের প্রতিবাদকেরা বলেন যে প্রকার-তিনটি বংশগত নয়, জাতিগত। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই ত্রিধারা বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি ; এগুলি অনাত্মস্থ ও স্বসমুখ। অমূল্যধনের বিবেচনায় বাংলা ছন্দ কার্য্যত তিন প্রকারের—

শুধু তিন কেন বহু প্রকারের, হ'লেও তার মূলসূত্র এক ও অবিভাজ্য। এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িক রূপে যতই তারতম্য থাকুক, তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই ; তাদের তাল এক কিন্তু ঢঙ ভিন্ন। নিরপেক্ষ বিচারকের কাছে অমূল্যধনের মতই বেশি যুক্তিবান ; কারণ একই ভাষায় মাত্রাগণনার পদ্ধতি ত্রিবিধ, এমন মনে করা তো কষ্টকল্পনা বটেই, উপরন্তু তাতে কৃতকার্য্য হ'লেও, প্রয়োগের বেলায় দেখি যে অধিকাংশ প্রাচীন কবিতাই এই ত্রিধা আদর্শের বহির্ভুক্ত থেকে গেলো। এ ক্ষেত্রে যাঁরা প্রাক্‌রবি কবিমাত্রকেই ছন্দোদুষ্ট ব'লে ভাবতে না-পারবেন, তাঁদের পক্ষে অমূল্যধনের পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-বাদে বিশ্বাসী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর সাহায্যে একদেশদর্শিতা তো বাঁচেই, অসম্ভাব্যতাকেও প্রশ্রয় দিতে হয় না।

অবশ্য পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ অমূল্যধনের নূতন আবিষ্কার নয় ; ছন্দোবিচারকমাত্রেই ও-দুটির অস্তিত্ব মেনে এসেছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীরা ছন্দে কালের প্রভাব-সম্বন্ধে অমূল্যধনের মতো সচেতন ছিলেন না ; তাই তাঁরা অক্ষর বা মাত্রার হিসাবেই ছন্দোলিপি বানাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। অমূল্যধন দেখিয়েছেন যে পর্ব্ব ও পর্ব্বাঙ্গ, অর্থাৎ কালপরিমাণই হচ্ছে বাংলা ছন্দের প্রাণ। এক ঝোঁকে কতকগুলো কথা ব'লে যাওয়াই বাংলা উচ্চারণের রীতি ; কিন্তু বাক্যারম্ভে বাক্‌যন্ত্রের যে-শক্তি থাকে, বাক্যের শেষে স্বভাবতই তা কমে আসে ; এবং বাংলা শব্দও যেহেতু কাটা কাটা ভাবে উক্ত হয়, তাই এখানেও ওই উত্থান-পতন ধরা পড়ে। এতে ক'রে স্বরগাম্ভীর্য্যের একটা হ্রাস-বৃদ্ধি চলতে থাকে ; এবং সেই স্বরকম্পনই বাংলা ছন্দের প্রধান উপকরণ। অতএব যদি এই পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের আদর্শ ও পরিমাপ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে অক্ষরমাত্রার কম-বেশিতে বাংলায় ছন্দোপতন হয় না ; পাঠক বিনাকষ্টেই অক্ষরমাত্রাকে প্রয়োজন-মতো হ্রস্ব বা দীর্ঘ ক'রে নিতে পারে ও নেয়।

অবশ্য একথা বলার ব্যাবহারিক মূল্য অল্পই। কিন্তু ছন্দশাস্ত্র যেহেতু কাব্য-রচনার পথনির্দ্দেশ করে না, শুধু কাব্যবোধের উপাদান জোগায়, তাই অমূল্যধনের আবিষ্কারকে আমি অত্যাবশ্যক মনে করি। এতে ক'রে বাংলা ছন্দের ত্রিমূর্ত্তি নিশ্চয়ই ওঙ্কারে পরিণত হলো না, কিন্তু ত্রিবেণীসঙ্গমের সন্ধান মিললো। অর্থাৎ বুঝলুম যে আপাতদৃষ্টিতে বাংলা ছন্দকে স্বরমাত্রিক, আক্ষরিক, মাত্রিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা গেলেও, আলোচনাটিকে এমন এক পর্য্যায়ে তোলা যায় যেখানে এই প্রকারভেদ নিতান্ত নিরর্থক। ব্যবহারের ক্ষেত্রে অথবা বাংলা কাব্যের আধুনিক কাণ্ডে পূর্ব্বানুমোদিত স্তরভেদ এখনো মোটামুটি খাটবে ; এবং যে-গন্থকারেরা অঙ্কব্যতীত ছন্দ লিখতে পারেন না, অমূল্যধনের হ্রস্বীকরণ ও দীর্ঘীকরণের নিয়ম তাঁদের কার্য্যোদ্ধারের বিশেষ সহায়তা করবে না। কিন্তু যিনি শুধু কাজ চালিয়েই তুষ্ট নন, বিজ্ঞানসম্মত ঐক্যই যাঁর কাম্য, তিনি ভবিষ্যতে অমূল্যধনকে নিশ্চয়ই ছাড়িয়ে যাবেন, তবু আলোচ্য বইখানির ঋণ অস্বীকার করবেন না, তাঁকেও মানতে হবে যে গন্তব্যে পৌছতে না-পারলেও, পথ-সম্বন্ধে অমূল্যধনের ভুল হয়নি।

আমার ব্যক্তিগত জগতে ঐক্যসাধনের প্রয়োজনটাই সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন। হয়তো সেইজন্যেই আলোচ্য গ্রন্থের এই দিকটাতে বেশি জোর দিয়েছি। কিন্তু তাহলেও এটা আমি জানি যে কেবল সাধারণ সূত্রের উপরে যে-মতবাদ প্রতিষ্ঠিত, যার দ্বারা শুধু অচ্ছিন্নতাই সূচিত হয় এবং বৈষম্য অব্যাখ্যাত থাকে, তার মূল্য সামান্য।

সুতরাং অমূল্যধনের নির্দ্দিষ্ট পথে বাংলা ছন্দের সমস্যামূলক ত্রিত্বের কোনো হেতু পাওয়া যায় কিনা, তার বিচারেই এ প্রবন্ধ শেষ করা প্রশস্ত। প্রথমেই শব্দান্তের বিরাম, পর্ব্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ, এই তিন অবকাশের নাম নিয়েছিলুম। এগুলিকে পৃথক আখ্যা দেওয়ার সার্থকতা এই যে এদের কালপরিমাণ এক নয়, ক্রমবিবর্দ্ধমান। ছেদ সাধারণত অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের মানে বোঝে, এবং আগামী বাক্যের ভাবগ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হয়। এইজন্যে ছেদের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্ক, অন্তত মিত্রাক্ষর ছন্দের সম্পর্ক, খুব নিবিড় নয়। কিন্তু যতি নিঃশ্বাস গ্রহণের কাল; কাজেই যে-ছন্দে যতি দূরে দূরে স্থাপিত, সেখানে শব্দ এবং অক্ষরগুলো একটু তাড়াতাড়ি উচ্চারিত হতে বাধ্য; কারণ বাক্যের মধ্যে শ্বাস নেওয়া বাংলা উচ্চারণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ফলে যতি-বিরল ছন্দে হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্বরান্ত, হলন্ত ইত্যাদি সকল অক্ষরই প্রায় সমান ভাবে উচ্চারিত হয়, যৌগিক বর্ণ তার যথার্থ মর্য্যাদা পায় না। গদ্যে তো এ রকম ঘটেই, এমন-কি পয়ারও এই জাতীয় ছন্দ; কারণ অন্তত আট মাত্রার পরে তার প্রথম অবকাশ, এবং দ্বিতীয় অবকাশ ছয় বা দশ মাত্রার পরে। সুতরাং গদ্যে বা পয়ারে বর্ণোচ্চারণের খুব স্পষ্টতা নেই, আছে একটা ঝোঁক অথবা তান; এবং তার ফলে যুক্ত অযুক্ত, লঘু গুরু, সব অক্ষরই পয়ারে একমাত্রিক ব'লে গণ্য হয়। পয়ারের এই গুণকেই রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি নামে অভিহিত করেছেন।

পক্ষান্তরে অবকাশ যেখানে ঘন ঘন আসে, সেখানে শ্বাসের অনটন না-থাকাতে প্রত্যেক বর্ণ তার প্রকৃত ওজন পেতে পারে। এই শ্রেণীর যতিবহুল ছন্দই মাত্রাবৃত্ত অথবা ধ্বনিপ্রধান নামে পরিচিত। এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত এবং এর শোষণ-শক্তি ফলত সুপরিমিত। অর্থাৎ এতে যৌগিক স্বর, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ, অনুস্বার, বিসর্গ, হলন্ত অক্ষর ইত্যাদির মাত্রাসংখ্যা দুই এবং সময়ে সময়ে তিন। তথাকথিত স্বরবৃত্ত অথবা স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দ, আমার মতে, শব্দান্ত্য বিরামের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এ-ছন্দে শব্দান্ত্য বিরামই শ্বাসের অবকাশ, যতি নিতান্ত গৌণ। কাজেই এখানে পাঠকের নিঃশ্বাসের পুঁজি সাধারণ উপায়ে ব্যয়িত হয় না, তার সদ্ব্যবহার করতে গেলে, তাকে অতিরিক্ত কাজের ভার নিতে হয়। ফলে, বাংলা উচ্চারণে বাক্যারম্ভমাত্রেই যে-স্বরাঘাতের সূচনা হয়, এখানে সেটা, ইংরেজি উচ্চারণের মতো, শব্দে শব্দে অনুরণিত হতে থাকে। অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে অর্থ এবং আবেগই একমাত্র লক্ষ্য, ছন্দশিল্পের কারিকুরি নেহাৎ নগণ্য। হয়তো সেইজন্যেই তাতে যত নিয়মের ব্যতিক্রম চলে, অন্যত্র তা সম্ভব হয় না। সেখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোটখাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলায় না। একটা অবিরাম ও উদাত্ত ধ্বনিতরঙ্গের উপরে ত্রুটি ঢাকবার ভার ছেড়ে দিয়ে, পাঠক ছেদের উদ্দেশে এমনি উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে যে তার স্বাভাবিক বিজোড়বিদ্বেষকে উপেক্ষা ক'রেও, তাকে তিন পাঁচ বা সাত ইত্যাদির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় অনায়াসেই থামানো যায়।

এই বিরাম, যতি ও ছেদ সম্বন্ধে যা বললুম, তার প্রকাশ্য উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, লেখক পরিশিষ্টে এই তত্ত্বেরই ইঙ্গিত করেছেন। এ-ধারণা যদি ভ্রান্তও হয়, আমার শৈশব যতিপ্রিয়তা থেকেই যদি এর জন্ম হয়ে

থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হবো না; কারণ এ-প্রসঙ্গে যদিও বা ভুল করি, তাহলেও অন্যত্র তিনি আমার অজ্ঞানান্ধকারে সত্যই জ্ঞানদীপ জ্বেলেছেন। সে-সব কথার সংক্ষেপসার দিলুম না, কারণ সমগ্র গ্রন্থখানিই এত সংক্ষিপ্ত যে তাকে আর কমানো আমার সাধ্যের অতীত। তাছাড়া পুস্তকখানির সারসংগ্রহের জন্যে যতটা সময় ও স্থানের দরকার, তা আমার নেই। তাই অমূল্যধন-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েই আমি ছুটি নিচ্ছি।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

The Adventures of the Black Girl in Her Search for God—BY BERNARD SHAW (Constable).

বার্ণাড শ-এর অনন্যসাধারণ লিপিদক্ষতা বিশ্ববরেণ্য। তাঁর কলমের খোঁচাটি পর্য্যন্ত আজ নাট্য জগতে প্রভূত অর্থ উৎপাদনে সমর্থ এবং তিনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন। অথচ গত বৎসর Knysna-তে যখন একটানা পাঁচ সপ্তাহ আটক পড়ে লেখবার প্রচুর অবসর পেলেন তখন সামান্য এক কাফ্রি-কন্যার রূপকথা লিখে পাদ্রী-মহলে অনর্থ বাধিয়ে বসলেন। ধর্ম্মগ্রন্থে অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা অবশ্য তিনি বহুবারই অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় জগৎকে জানিয়েছেন কিন্তু এই স্বল্পাঙ্গ বইটির শেষভাগে দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাতে বাইবেল-উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে তার নিশ্চয়তা আমাদের মত অ-খৃষ্টীয় নিরাসক্ত মনেও চঞ্চলতা এনে দিয়েছে।

বিষয়টি মামুলি এবং শ কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনাবশ্যক সৃষ্টি করেন নি; তথাপি ইউরোপীয় চিন্তাজগতে তাঁর ক্ষুদ্রকায় বইটি অবলম্বন করে আজ যে ঝড় উঠেছে তার প্রকোপ দেখে মনে হয় তিনি জীবনের সায়াহ্নকালে যে প্রশ্নটি তুলেছেন তার পিছনে অনেকখানি সত্য প্রচ্ছন্ন আছে। মনে অবশ্য সন্দেহ জাগে যে ইউরোপ হতে বাইবেলের প্রভাবের সমূল উচ্ছেদ সম্ভব কিনা; কারণ বর্ত্তমান নিরীশ্বরবাদের যুগেও ইংরাজ ও মার্কিন জনসমষ্টি ঐ ধর্ম্মগ্রন্থকে স্বয়ং পরমেশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করে থাকে। ভক্তি অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হওয়ায় গ্রন্থটির প্রচার ও ব্যবহার আশ্চর্য্য ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। যথা, ভূত বা রোগ তাড়াবার কবচ, আদালতে শপথ গ্রহণ, যুদ্ধে bullet proof, আরও কত কি। এই সকল যাদুকরী মোহকে আগলে আছে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ও শক্তিমান গির্জ্জা-সঙ্ঘ।

কিন্তু আলোচ্য বইটিতে শ বাইবেল পড়ার ঔচিত্য অস্বীকার করেছেন, গ্রন্থটির মহত্ত্ব স্বীকার করেও। অসভ্য পৌত্তলিকতা হতে চেতনের বিকাশ ও বৃদ্ধির এই যে কল্পনা, এর বাস্তবতা অর্দ্ধেক ভ্রান্ত হলেও প্রাণের গভীর প্রেরণা নিঃসৃত বলে তিনি মেনে নিয়েছেন। অনুবাদকদের অত্যদ্ভুত লিপিদক্ষতা, কবিপ্রতিভা, সংযম ও শালীনতা তাঁকেও মুগ্ধ করেছে। তথাপি তিনি বাইবেলের প্রভাব নষ্ট করতে চান: কারণ মানব-চৈতন্য স্বভাবতঃ অলস এবং এই আলস্যের জন্য সাধারণ শিক্ষিত লোক রাশীকৃত আবর্জ্জনা পরিষ্কার না করেই নূতন জ্ঞানের বোঝা মনের ভাণ্ডারে

জড় করে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে এবং বহু অনাসক্ত ও উন্নত মনেও পুরাতনের সঙ্গে নূতনের জোড়াতাড়া ও গোঁজামিল দেবার প্রবল অভ্যাসদোষ থেকে যায়। তাঁর মতে মানব সমাজে বর্ত্তমান নৈতিক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতার মূলে পুরাতনের এই দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণীশক্তি প্রচ্ছন্ন আছে। উদাহরণ স্বরূপ বাইবেল হতে মেকী, সংকীর্ণ ও কদর্য্য অংশগুলি উদ্ধৃত করে তিনি দেখিয়েছেন যে মহত্ত্বের সঙ্গে সেগুলি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে ভক্ত মনে আসন গ্রহণ করেছে যে বাছাই চলে না। অর্থাৎ নোয়ার ক্রুদ্ধ দেবতা ও জোবের তার্কিক দেবতার সঙ্গে মিশে গিয়ে ক্রাইষ্ট এক হয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন যে যখন চৈতন্যরূপ সূক্ষ্ম ভাবধারা স্থূলকায় দেবতাদের সহজ সঞ্চরণে আবিল হয়ে ওঠে এবং ধর্ম্মের নামে অভ্যাসদোষ মানুষের মনে স্থান অধিকার করে মানবচৈতন্যকে নিষ্ঠুর ভাবে ব্যঙ্গ করে, তখন সচেতন মানবমনের তরফ থেকে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের লেখা শ-এর জীবনী পড়লে ধারণা জন্মায় যে বুদ্ধি-দীপ্ত ঔদ্ধত্য বশতঃ বুঝি চিরকালই শ ক্রাইষ্টকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছেন। শ-এর সব লেখা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়নি তবে এই বইটি পড়ে সে ধারণা দূরীভূত হয়েছে। ক্রাইষ্টকে তিনি অস্বীকার করেন না; তবে কয়েকটি সরল সত্য কথা আগলে রাখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না, বিশেষ করে তাতে যখন বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাই অধিক। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখিয়েছেন যে পুঁথির জীর্ণ কাগজ চৈতন্যের অন্তর্গূঢ় সত্যের একমাত্র বাহন নয়।

বিপর্য্যয়ের প্রমাণের অভাব নাই। বার্মিংহামের বিশপ সম্প্রতি ভীতি প্রকাশ করেছেন যে ইংরাজ গির্জ্জা-পন্থীরা বিজ্ঞানের সংঘাতে পথভ্রষ্ট হয়ে ক্রাইষ্টকে ছেড়ে গোঁড়ামির গোলকধাঁধায় প্রবেশ করেছে। শ তারই রেশ টেনে গত মহাযুদ্ধের উৎকৃষ্ট উদাহরণের সাহায্যে আরও প্রমাণ করেছেন যে ধর্ম্মপ্রাণ সুসভ্য ইউরোপ যেরূপ দ্রুতগতিতে আজ অস্ত্র নির্ম্মাণে মত্ত, তাতে অ-খৃষ্টীয়দের আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখা উচিত।

অনেকের ধারণা শ অতিরিক্ত নাটকীয়, এবং আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁর প্রকৃতি-গত বিরোধ থাকার জন্যেই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠলেই বিশেষণপ্রাচুর্য্য ও অতিকথনের ভারে তিনি নিজের বক্তব্যকে কলুষিত করে তোলেন। কিন্তু আলোচ্য বইটি আদ্যোপান্ত পড়লে তাঁর সত্যনিষ্ঠার প্রাখর্য্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সত্য হয়তো মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে ও নিজের রূপ সময়ে সময়ে পরিবর্ত্তন করে অতিবড় ঔদ্ধত্যেরও মাথা নত করে দেয়—কিন্তু নিষ্ঠার মাধুর্য্য সনাতন। শ-এর বহুমুখী প্রতিভার অন্তর্নিহিত এই নিষ্ঠাই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে।

গল্পের কথা এখনও বলা হয়নি। একটি কাফ্রি-কন্যার ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসা কথনচ্ছলে রূপকথার ছাঁদে বইটি লেখা হয়েছে। উড্‌কাট চিত্রে বিচিত্র, ক্ষুদ্রকায় বইটির রচনাভঙ্গীতে সারল্যের মৌলিকতা ফুটে উঠেছে। ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনায় উলঙ্গ কাফ্রি-কন্যার আমদানি যাঁরা উদ্ভট মনে করতে পারেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে আফ্রিকাই জগতের মধ্যে আজ একমাত্র মহাদেশ অবশিষ্ট আছে যেখানে অতীত হতে আহৃত সংস্কারের ভার মানবমনকে গতিহীন করতে পারেনি। সে দেশে শিশুসুলভ সরল মনের নির্ভীক ও নির্লজ্জ প্রশ্ন কথার চাতুরীতে প্রবোধ মানে না। বালিকাটির কাছে যখন ঈশ্বর পূর্ণগ্রহণ বা ভূমিকম্পের মতই প্রত্যক্ষ সত্য

ও বাস্তব, তখন সে মিশনারীর কথায় না ভুলে যে একটা লগুড় হাতে নিজেই ঈশ্বর অন্বেষণে বেরিয়ে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

একটু অস্বস্তি স্বতঃই মনে জেগে ওঠে যখন নিছক রসের সরলতা বিচিত্রতর করে তুলতে শ তাঁর সৃষ্ট চরিত্রকে বিকৃত করে তোলেন। গল্পের প্রারম্ভে মিশনারী চরিত্র অঙ্কনে তিনি অমার্জ্জনীয় একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। মহিলা মিশনারীমাত্রেই প্রণয়-ব্যাপারে বৈফল্যবশতঃ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়ে পরমার্থ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন না তা শ-এর জানা উচিত ছিল। গল্পটিতে মিশনারী-চরিত্রটি অবশ্য গৌণ কিন্তু নিরর্থক নিষ্ঠুর টিপ্পনীর দ্বারা এক শ্রেণীর লোকদের গাত্রদাহ উপস্থিত করিয়ে তাঁর রচনার সম্পদ অণুমাত্রও বেড়েছে বলে মনে হয় না।

কিন্তু তাঁর শিল্পচাতুর্য্যের এমনি মহিমা যে কূট তর্কের মধ্যে যুক্তিবৈষম্য প্রয়োগ করেও তিনি রচনাকে সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য কর্‌তে পারেন।

চঞ্চলচিত্ত, মুখরা, সত্যসন্ধানী কাফ্রি-মেয়েটির ছোট ছোট স্পষ্ট বাক্য, স্পর্দ্ধা ও আত্ম-সংস্থা অবলীলাক্রমে বাইবেলের দুর্দ্ধর্ষ সংহার-মূর্ত্তি দেবতাদের পরাস্ত করে আমাদের জুজুর ভয়পীড়িত মনকে উৎফুল্ল করেছে। ক্রাইষ্টের সন্ধান মিললো যাত্রা-শেষে নয়, পথিমধ্যে কূপপার্শ্বস্থ সুশীতল বৃক্ষচ্ছায়ায়। তিনি প্রথমে ক্ষিপ্র হস্তে দুই একটি 'ম্যাজিক' দেখিয়ে বালিকাটির হৃদয় জয় কর্‌তে চেষ্টা করলেন—কিন্তু তাঁর বিনয়-ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েও বালিকা চিরন্তন প্রশ্নটি পরিত্যাগ করলে না। অবশেষে ঐ অমায়িক ভদ্রলোকটিকেও স্বীকার করতে হলো—'to find him such as you must go past me'।

গোঁড়া খৃষ্টানদের যাঁরা এইখানে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে হাহুতাশ করতে থাকবেন তাঁদের আশ্বাস দিয়ে সমালোচনাটি এই বলে শেষ কর্‌তে পারি যে বালিকাটির অহমিকা আর বেশী দূর গড়ায় নি। ঈশ্বর অনুসন্ধিৎসার বাতুলতা মস্তিষ্কে প্রবেশ করা মাত্র চতুর বালিকা সনাতন প্রথামত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সন্তান লালন পালন ও বৃক্ষ রোপণে অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গ করিলে।

অবশ্য এইরূপ জীবন্ত সমাধি লাভ করবার পূর্ব্বে তার সরল দৃষ্টির আলোকে বিজ্ঞানের সংকীর্ণতা, শিল্পের অসারতা ও মহম্মদের একদেশদর্শিতা উদ্ভাসিত হয়ে তার চিত্তকে তিক্ত করে দিয়েছিল।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Where is Science Going?—BY MAX PLANCK, with a Preface by Albert Einstein, translated and edited by James Murphy, (George Allen & Unwin Ltd.).

বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কার ও তার ভাবার্থ সম্বন্ধে ইদানিং এতগুলি বই লেখা হয়েছে যে তার তর্কবিতর্কের কচ্‌কচিতে বৈজ্ঞানিক সাহিত্য ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে বল্লেই হয়। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে এই দুরূহ বাদানুবাদ পুনঃসঞ্জীবিত করা কেন। অপরপক্ষে এ কথা মনে করাও অসঙ্গত হবে না যে এই বাদানুবাদের একটা সুরাহা

করবার জন্য প্লাঙ্ক আইনষ্টাইন তুল্য মহারথীদের বিধান নেওয়া নিতান্ত মন্দ প্রস্তাব নয়। আলোচ্য বইটির সম্পাদক মার্ফি কতকটা এই উদ্দেশ্য নিয়েই ঐ দুই বৈজ্ঞানিকের কাছে গমন করেছিলেন। উপরন্তু আইনষ্টাইনের কাছে তিনি এ প্রস্তাবও করেন যে পুস্তকপ্রকাশক ও কাগজওয়ালার কল্যাণে ইংরাজীশিক্ষিত দেশে 'আপেক্ষিকতা'র যতটা প্রচার হয়েছে, আপেক্ষিকতার চেয়েও নব্যবিজ্ঞানের যা ঢের বেশী গভীর তত্ত্ব সেই Quantum law বা মাত্রাতত্ত্বের ততটা প্রচার হয়নি, অতএব এই তত্ত্বটিকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিত করানো অবশ্যকর্ত্তব্য। এ প্রসঙ্গে আইনষ্টাইন্ একরকম এই কথা বলেন যে সাধারণবোধ্য করতে গিয়ে যে সাহিত্য রচনা করা হয় তাতে বিজ্ঞান বেচারী মারা পড়ে। এডিংটন্ জীনস্ প্রভৃতির লেখায় যে আদর্শবাদ ব্যক্ত হয়েছে সে বিষয়ে মত জানতে চাইলে আইনষ্টাইন্ বলেন—এ সব বৈজ্ঞানিক সাধারণ পাঠকের জন্য সাহিত্যের তাড়নায় যাই লিখুন না কেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক অন্তরাত্মা কখনই কোন অবৈজ্ঞানিক কথার আমল দেবে না। অর্থাৎ পাকা বৈজ্ঞানিক আপন গণ্ডীর বাইরের কোন ব্যাপারেই ফতোয়া জারী করবেন না।

এ সত্ত্বেও বিজ্ঞানবৃদ্ধ প্লাঙ্ক এই সাধারণপাঠ্য বই কেন রচনা করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিজ্ঞান রচনা করতে হলে কতকগুলি জিনিষ মেনে নিতেই হয়, সুতরাং কোন্ কোন্ জিনিষ মেনে নেওয়া হচ্ছে তার তালিকা দেওয়া বৈজ্ঞানিকেরই কাজ। এই বিষয়ের জবানবন্দীতে প্লাঙ্ক বলেছেন যে তিনি বৈজ্ঞানিক হয়েই বাহ্য-জগতের অতীত স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেও পূরাপূরি আস্থাবান।

যে মুখবন্দ লিখে দিয়ে আইনষ্টাইন বইটিকে অলঙ্কৃত করেছেন তা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি শ্রদ্ধামণ্ডিত। তা থেকে একটু উদ্ধৃত করলাম,—

I am sure Max Planck would laugh at my childish way of poking around with the lamp of Diogenes. Well! why should I tell of his greatness? . . . . His work has given one of the most powerful of all impulses to the progress of science. His ideas will be effective as long as physical science lasts. And I hope that the example which his personal life affords will not be less effective with the later generations of scientists.

মার্ফি প্লাঙ্কের একটি ছোট্ট জীবনচরিত দিয়েছেন। তা থেকে জানা যায় তাঁর এই personal life-এর প্রভাব তাঁর কাজে, লেখায় ও তাঁর স্বদেশবাসীদের কাছে কত সজীব। আজ পঁচাত্তর-এর কাছাকাছি বয়সে তিনি দেশের সর্ব্বোত্তম বৈজ্ঞানিক আসনে অধিষ্ঠিত রয়েছেন আর বিজ্ঞানে তাঁর সত্যসন্ধানী খরদৃষ্টি, অকৃত্রিমতা ও ঔদার্য্য, শুধু দেশবাসীর নয়, সারা জগতের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে বিপুল সম্ভ্রম অর্জ্জন করেছে।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে প্লাঙ্ক গত পঞ্চাশ বছরের বিজ্ঞান বিকাশের একটা বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তার একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথাটা এই—সাধারণ লোক মনে করেন যে relativity-র মূলসূত্র হল দেশ কাল ও তার মাপযোপ এই সমস্তকেই আপেক্ষিক বলে প্রতিপন্ন করা। তা নয়,—আসল কথা এই যে দেশকালময় four dimensional world-এ যে কোন

দুটি ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ একটা পরিমাণ দিয়ে যুক্ত। আপেক্ষিকতা যে ধ্রুবমানকে উড়িয়ে দেয়নি, এ সংবাদটুকু সাধারণ পাঠকের নিশ্চয় কাজে লাগবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মত তাঁর আগের বইয়েই সুচারুরূপে বিবৃত হয়েছে। তাঁর মতে প্রত্যক্ষমাণ জগতের পিছনে একটা বাস্তব অস্তিত্বমান জগৎ রয়েছে। অবশ্য এ কথা যুক্তি দিয়ে (formal logic) প্রমাণ করা যায় না কিন্তু যুক্তিবলে খণ্ডনও করা যায় না। বৈজ্ঞানিক জগৎ এই আসল জগতেরই প্রতিবিম্ব,—nature's image in science। কিন্তু এ প্রতিবিম্ব অসম্পূর্ণ, আস্তে আস্তে একটু একটু করে গড়ে উঠেছে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত সৃজিত হচ্ছে না, বৈজ্ঞানিকের মন থেকে স্বপ্রণোদিত হয়েই তা সৃজিত হচ্ছে, সুতরাং বিজ্ঞান-কল্পিত জগৎ অভিজ্ঞতার ফল নয় বরং অভিজ্ঞতা-কর্ত্তৃক পরিশাসিত পরিকল্পনার ফল। সম্মুখে যখন বাধা উপস্থিত হয়, পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলি যখন আর বিজ্ঞানকে পথ দেখাতে পারে না, তখন বৈজ্ঞানিকের মনে ঐকান্তিক চিন্তার ফলে নূতন তথ্য বিকশিত হয়ে ওঠে। তার পর যাচাই করার ফলে এগুলি কর্ত্তিত বর্জ্জিত বা সম্প্রসারিত হয়ে গৃহীত হয়। এমনি করে মনের এলোমেলো ও হাতধরা প্রণালীতে বা বরাতলব্ধ অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নীত হয়। অতএব বিজ্ঞান কখনই কোন ব্যাপারেরই শেষ মীমাংসা সম্পাদন করে না, বিজ্ঞান সকল অবস্থাতেই তখনকার মত কাজ চালাবার কলকাঠি। বিজ্ঞানের সকল রকম সূত্রও তাই, বিজ্ঞানাঙ্কিত জগতের চিত্রও তাই। কিন্তু এ চিত্র অঙ্কিত করবার জন্য একান্তভাবে ও নির্ব্বিবাদে দু-একটি জিনিষ মেনে নেওয়া চাই। প্রত্যক্ষ জগতের পিছনে একটা আসল জগতের অস্তিত্ব এইরকম একটা অবলম্বন। প্লাঙ্কের মতে এই আসল জগৎকে মেনে নিলেও বিজ্ঞান কোনদিনই তার শেষ পর্য্যন্ত নাগাল পাবে না, কেবল ক্রমশ তার দিকে অগ্রসর হবে, অগ্রসরের পথ কোনদিনই একেবারে রুদ্ধ হবে না। পথ চলাতেই বিজ্ঞান সফলকাম,—আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের যত বিজয়সিদ্ধি হয়েছে সবই এর অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছে।

এ কথা বলা বোধহয় বাহুল্য হবে না যে বিজ্ঞানে অস্তি নাস্তির বিচার মাথা তুলে উঠেছে এই নূতন তত্ত্ব থেকে যে বস্তুর মধ্যে সবই ফাঁকি, বস্তুভাগ শূন্যমাত্র। অণু ছিল এতদিন বিজ্ঞানের আদি সত্তা এখন অণু হয়ে দাঁড়িয়েছে সবটাই প্রায় ফাঁকা, শুধু দু দশটি ইলেক্‌ট্রণের রঙ্গভূমি। আবার ইলেক্‌ট্রণ তার বস্তুসত্তা হারিয়ে এসে ঠেকেছে শুধু তরঙ্গে। তরঙ্গ বটে কিন্তু কিসের তরঙ্গ তার কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এই থেকেই এসেছে সাকার অস্তিত্বের (objective reality) প্রতি সন্দেহের প্ররোচনা ও তাই থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি নিরূপণের প্রচেষ্টা।

এর পরের দুটি পরিচ্ছেদে প্লাঙ্ক আলোচনা করেছেন causation and free will—যাকে বলা যেতে পারে হেতুধর্ম্ম বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা ও ইচ্ছার স্ববশতা। বিজ্ঞানের পক্ষে যে দৃঢ় অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলতা তার আর একটি। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার শাসনে সমস্ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আনয়ন করাই বিজ্ঞানের একমাত্র কাজ। যেখানে যেখানে বিজ্ঞান দখল পায়নি, বলতে হবে সে সব স্থানে কার্য্যকারণ সূত্রও তার প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। শুধু পদার্থবিজ্ঞানে নয় অন্যান্য বিজ্ঞানেও,—যেমন জীবতত্ত্বে, উদ্ভিদতত্ত্বে, ধনতন্ত্রে, মনস্তত্ত্বে, এমন কি

সমাজতত্ত্বেও এই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলারই অনুসন্ধান চলছে ও যতই এ সব বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে ততই কার্য্যকারণসূত্র প্রয়োগের সফলতা প্রমাণিত হচ্ছে। এর মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানে হঠাৎ Quantum law,—মাত্রাবিধি, এসে হাজির হয়েই কার্য্যকারণের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধ্বজা উড়িয়েছে।

হেতুবিধির দার্শনিক ও যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি কি, সে সম্বন্ধে প্লাঙ্ক এক অপরূপ ও মনোহর বিশ্লেষণ রচনা করেছেন। তাঁর এ রচনা পঁয়াকারের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের পাশে স্থান পাবে বলা বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। প্রচলিত ইউরোপীয় ন্যায় ও দর্শনবাদ আলোচনা করে প্লাঙ্ক দেখিয়েছেন যে হেতুবিধি বা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার কোন যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ নেই। হেতুবিধিকে একেবারে গোড়া থেকেই স্বীকার করে নিতে হয়, হেতুবিধির ওপরই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রতিষ্ঠা। হেতুবিধি আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানে প্রায় সব কিছুকেই ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা করে এসেছে, বিরোধ উপস্থিত হয়েছে ইলেকট্রনের নবাবিষ্কৃত আচরণ থেকে। এই আচরণ ধরা পড়েছে নব্যগণিতে, যার অনুসারে ইলেকট্রনের অবস্থিতি ও গতিমান নির্দ্দেশ করে বলা অসম্ভব, গণনায় তার খানিকটা অনিশ্চিত হবেই হবে। আর কতখানি অনিশ্চিত হবে তার পরিমাণও এই নব্যগণিত নিরূপণ করে দিয়েছে। পাখীটা খাঁচার ঠিক কোনখানটিতে আছে তা নির্ণয় করে বলতে পারি না কিন্তু খাঁচার চৌহদ্দি আমরা নির্দ্দেশ করে বলে দিতে পারি। এই উদাহরণটি আমরা এখানে জুড়ে দিলাম, যদিও প্লাঙ্ক এর উল্লেখ করেন নি। এ ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে তাহলে ও-গণিত কোন কাজের নয়, কিন্তু এ আপত্তি ঠাঁই পাবে না কেননা ও-গণিত পদার্থ-বিজ্ঞানের অণু :পরমাণু ও ইলেকট্রনের অনেক আচরণ ব্যাখ্যা করেছে যা অন্য কোন গণিতমতে ব্যাখ্যাত হতে পারেনি। আর এ গণিতের মূলে রয়েছে মাত্রাবিধি,—যাতে বলা হয় যে, শক্তি একমাত্রা থেকে পরবর্ত্তী মাত্রায় উঠতে নামতে পারে কিন্তু মধ্যবর্ত্তী কোন অঙ্কে উপস্থিত হতে বা স্থির থাকতে পারে না। দেখা গেছে ইলেকট্রন ঠিক এই নিয়মানুসারেই শক্তি ভোগ করে থাকে,—আর এ ছাড়াও মাত্রাবিধি নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্লাঙ্ক বলছেন যে, প্রথমত ইলেকট্রনের অবস্থিতি বা গতিমান নির্ণয় করা যাচ্ছে না বলে এ প্রমাণ হয় না যে ও দুটি কার্য্যকারণসূত্র অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না। তাঁর মতে নূতন গণিতকে একদিন হয়ত এমন করে ঢেলে সাজানো যাবে যাতে হেতুবিধির অমোঘতা বজায় থাকবে। দ্বিতীয় কথা, অবস্থিতি প্রভৃতি কতকগুলি অভিজ্ঞানকে এ ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে ধরা যাচ্ছে না বলেই যখন হেতুবিধি নিয়ে এই বিরোধের সৃষ্টি, তখন এও ভেবে দেখা দরকার যে অবস্থিতিই বা বিজ্ঞানে এমন পরমপদ লাভ করল কিসে। এতদিন সে পদ সে পেয়েছিল কেননা তা দিয়েই হেতুবিধি প্রয়োগক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করেছিল। কিন্তু কোনক্ষেত্রে যদি অবস্থিতি বা গতিমানের বদলে মাত্রাই পরমপদ পায়,—যদি কোন কিছু কয় মাত্রা শক্তির আদান প্রদান করলে এই দিয়েই ঘটনা-পরম্পরা সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হয়, তবে অবস্থিতি ও গতিমানের প্রতি আমাদের পূর্ব্বকার অশেষ নির্ভরশীলতা জলাঞ্জলি দিতে ক্ষতি কি? বরং এইটিই মনে হয় যে অবস্থিতি ও গতিমানের অভিজ্ঞান সেই পর্য্যায়ের যা সমষ্টি-সম্পর্কে খাটে, খাঁটি ব্যষ্টি সম্পর্কে নয়; পরন্তু মাত্রার প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র ব্যষ্টিতে। অথবা এমনই যদি হয় যে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলাসূত্র বিসর্জ্জন না দিলে বিজ্ঞানের প্রগতি রুদ্ধ হবে, তবে তার বদলে

যে সূত্র স্বীকার করলে সে প্রগতি সিদ্ধ হবে সেই সূত্রই বিজ্ঞান অবাধে গ্রহণ করবে। কোন সূত্রেরই স্বয়ংসিদ্ধ অধিকার নেই, সেই সূত্রই স্বীকার্য্য যা ব্যাবহারিকক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষার বিশ্লেষণে টিঁকে থাকতে পারে।

প্লাঙ্ক তাঁর আলোচনায় অহং ও ইচ্ছাশক্তির লীলার কথাও বাদ দেননি। তিনি বলেন এ দুটি বিষয়ে জোর করে কোন কথা বলা সম্ভব নয়, তবে এইটেই যেন মনে হয় যে যতই সকল রকম বিজ্ঞানের উন্নতি হবে ততই মানবচরিত্র, ইচ্ছা ও মনের ক্রিয়া-কলাপ, এমন কি মহানুভব ও মহাজ্ঞানীদের কার্য্যাবলী ও প্রতিভা ইত্যাদি সমস্তই গণনার আয়ত্তাধীন হয়ে পড়বে; কিন্তু অহং-এর দ্বার থেকেই বিজ্ঞানকে ফিরতে হবে। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন বিজয়সাধন যেমন তার সার্থকতার পরিচয় দিচ্ছে, তেমনি বিজ্ঞানের এত অধিকার বিস্তার সত্ত্বেও সাধারণের মনে ঐশী শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস ক্রমশই ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঐশী শক্তি, অহং ও আধ্যাত্মিকতা বিজ্ঞান-পর্য্যালোচনার বাইরে,—religion belongs to that realm that is inviolable before the law of Causation and therefore closed to science।

একটা জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় ন্যায় বা দর্শন কি হেতুবিধি ও বিজ্ঞান এবং reality সম্বন্ধে আধুনিক প্রসঙ্গোপযোগী কোন কিছু আলোক-সম্পাত করতে পারে না?

শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

The Sleepwalkers—BY HERMANN BROCH (Martin Secker).
The Forty-second Parallel—BY JOHN DOS PASSOS (Constable).

পশ্চিমের লেখকেরা দিনে দিনে এমন লিপিচতুর হয়ে উঠছে যে প্রায় সকল আধুনিক পুস্তকই সুপাঠ্য, এবং অনেকগুলি স্মরণীয়। কিন্তু তাহলেও সাহিত্যিক উৎকর্ষ কমেছে বই বাড়ে নি। যদিও এটা বিশেষ ক'রে নভেলেরই যুগ, এবং প্রতি বৎসরেই একাধিক ভালো নভেল মুদ্রিত হয়, তবু যথার্থ মহৎ উপন্যাস যুদ্ধের পরে বড় একটা আর দেখা যায়না। এই সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্যে টল্‌ষ্টয় অথবা হার্ডিকে প্রতিমান হিসাবে ধরা নিষ্প্রয়োজন। তাঁদের তুল্য লেখক সকল দেশে এবং সকল কালেই বিরল; কিন্তু মুর্‌, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, ওয়েল্‌স্‌, বেনেট্‌ ইত্যাদির মতো দ্বিতীয় শ্রেণীর কথকদের তুলনাও আধুনিকদের পক্ষে ক্ষতিকর। এই দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করা শক্ত। এর মূলে হয়তো কোনো একটা কারণ নেই; হয়তো জীবনের সার্ব্বত্রিক দুর্দ্দশাই নভেলেও প্রতিবিম্ব ফেলেছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক সর্ব্বনাশ নভেলকে যতই ক্ষুণ্ণ করুক না কেন, আন্তর দৈন্যই তার প্রধান শত্রু। এ-মতে সম্প্রতিবিদরা সম্ভবত অধীর হয়ে উঠবেন; এবং একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না যে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের বৈচিত্র্যে নবীনেরা প্রবীণদের বহু পশ্চাতে ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু এটাও সুনিশ্চয় যে নভেল রচনায় কেবল উদ্ভাবনাশক্তিই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে সত্যনিষ্ঠাও হয়তো অনাবশ্যক, যেটা অপরিহার্য্য, সে-গুণ হচ্ছে লরেন্স্‌ যাকে বলেছিলেন thought adventure, অর্থাৎ দুঃসাহসিক ভাবুকতা।

লরেন্স্ ছাড়াও দু-একজন উত্তরসামরিক ঔপন্যাসিক ওই গুণের মর্য্যাদা বুঝেছেন, সত্য; কিন্তু অধিকাংশই আজ সনাতন আদর্শে আস্থাহারা। অবশ্য এ-মনোভাব মার্জ্জনীয়; এবং সম্প্রতন উপন্যাসের নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানসারূপ্য আমার অনুমোদিত। কিন্তু তর্ক বাধে বিশেষণটির অর্থ নিয়ে। সাহিত্যসভায় আত্মজীবনীর বস্ত্রহরণ শিল্পবিরুদ্ধ ব'লেই সেখানে আত্মোপস্থিতি নিষিদ্ধ নয়; এবং নভেলে ভালো-মন্দের ব্যক্তিগত বিচার অশোভন হলেও তাতে একটা জাগতিক মূল্যজ্ঞান শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, আবশ্যিকও। নৈরাজ্য ও নৈর্ব্যক্তিকতা যে সমার্থবাচক নয়, এই আর্য্যসত্যটিকে আমরা আজ ভুলতে বসেছি। নৈরাজ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাকাষ্ঠা; এবং যে-ব্যক্তি বিধিবদ্ধ বিশ্বকে অহমিকার অহৈতুক অসংস্থিতিতে পর্য্যবসিত করতে পেরেছে, নৈর্ব্যক্তিক তার উপযুক্ত আখ্যা নয়, তার আখ্যা বৈনাশিক। কাজেই সাহিত্যকে যদি যথার্থ ই অনাত্ম্য ক'রে তোলা কাম্য হয়, তবে মূল্যজ্ঞান বাদ দিলে চলবেনা, বরং কোনো একটা লোকোত্তর আদর্শকে প্রাণপণ ব'লে আঁকড়ে ধরতে হবে। সুতরাং ঔপন্যাসিক যদি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর কল্পনাকে বস্তুবিশ্বের সীমান্তরিত না-করেন, চোখে অতিমর্ত্ত্য নিরীক্ষার কজ্জল না-লাগান, মানবজীবনের পরমার্থ মেনে না-নেন, তবে তিনি হয়তো মমত্ববোধের মাদকতা কাটাতে পারবেন, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বিষকুণ্ডলী এড়াতে পারবেননা, তবে তিনি হয়তো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবেন, কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের জীবন্মুক্ত বিশ্বম্ভরতার সন্ধান পাবেননা। ঐতিহ্যনির্দ্দিষ্ট পথে চলা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই দুঃসাধ্য, এবং মানুষের পশুত্ব অস্বীকার করা অবশ্যই আজ অসম্ভব: তবু আমরা যদি প্রুস্ৎ, লরেন্স্, উল্ফ্ বা জয়েস্-এর মতো আমাদের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে একটা নবাবিষ্কৃত নিকষে পরখ ক'রে দেখতে না-পারি, তবে নৈর্ব্যক্তিক হয়েও আমাদের রচনা সাংবাদিক সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতেই আজীবন আবদ্ধ থাকবে।

অবশ্য নূতন প্রতিমান প্রতিষ্ঠা সকল দেশেই দুষ্কর। কিন্তু ঘটনাচক্রের সমাবেশে সর্ব্বস্বান্ত জার্ম্মানিতে ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এসেছে। জার্ম্মানি আজ এমন একটা সর্ব্বনাশের কবলে যে কোনো একজন ব্যক্তির—তা তিনি স্বয়ং নরনারায়ণ হলেও—অধ্যবসায়ে তাকে আর প্রকৃতিস্থ করা যাবেনা। কাজেই এই ব্যষ্টিবিলাসী দেশ আজকে সমষ্টিবাদের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়েছে। এ-বিবরণ কম্যুনিষ্টদ্বেষী নাৎসিদের সম্বন্ধেও খাটে। কারণ তারা যদিও রুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে তারস্বরে প্রাচীন জার্মেনিয়ার মৌখিক প্রশস্তি গাইছে, তবু কার্য্যত ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় মঙ্গলকে বড় ক'রে দেখাই তাদের মতবাদের মূলসূত্র, এবং এইজন্যেই তারা আজ এত প্রতাপান্বিত। সমাজতন্ত্রের অনুকম্পায়ীরা যে নাৎসি-প্রবর্ত্তিত রাষ্ট্রনিষ্ঠাকে ভয়ের চক্ষে দেখেন, তা আমি জানি; কিন্তু উদারপন্থী মনুষ্যধর্ম্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোনো প্রকৃতিগত বিরোধ নেই ব'লেই আমার বিশ্বাস। যাঁরা বিশ্বমানবের প্রতিভূ, তাঁরা ব্যক্তিমানবকে জনহিতার্থে আত্মবলি দিতে উপদেশ দিয়েছেন: এবং দেশভক্তদের আদর্শও তদনুরূপ। দেশই হোক আর ব্রহ্মাণ্ডই হোক, যদি সামান্য মানুষের আত্মোৎসর্গে কোনো অতিমানুষিক সত্তার কল্যাণ সম্ভবপর হয়, তবে বুঝতে হবে যে বস্তুত মানুষ নগণ্য নয়, তার জীবন প্রকৃতপক্ষে পরমার্থময়। আমার বিবেচনায় টমাস্ মান্ থেকে সুরু ক'রে হের্মান্ ব্রথ্ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানির সকল প্রথম শ্রেণীর লেখকই মানবজীবনের এই মর্য্যাদা মেনে নিয়েছেন। হয়তো সে-দেশের প্রাত্যহিক জীবন

বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্যে আজ একেবারে বঞ্চিত ব'লেই এই অতীন্দ্রিয়প্রিয় জাতি আত্মিক গৌরবের শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু কারণ যাই হোক এই অন্ধ বিশ্বাসের সাহিত্যিক ফল সত্যই লোভনীয়। অন্ততপক্ষে বর্ত্তমান জার্ম্মানির আখ্যানশিল্পে যে-গভীরতার পরিচয় পাই, তার জোড়া মিলে কেবল ফরাসী ক্যাথলিকদের উপাখ্যানে এবং রুষ বোল্‌শেভিক্‌দের কথাসাহিত্যে। কারণ এই দুই দলও মানবাত্মার অনন্ত দায়িত্ব ও অপার বৈভবে একান্ত আস্থাবান।

বলাই বাহুল্য যে এতাদৃশ উপন্যাসে গল্পাংশ উপলক্ষ্যমাত্র, আসল উদ্দেশ্য লেখকের জাগতিক নিরীক্ষার প্রকাশ। ফলে এ-ধরণের আখ্যায়িকায় নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্বসীমা অত্যন্ত অস্পষ্ট; তারা চরিত্র নয়, একটা আদর্শ। কিন্তু এতে ক'রে তাদের ব্যক্তিস্বরূপ কমেনা, বরং তারা মূর্ত্তিমান অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে; তাদের উত্থান-পতন পাঠকের মনে যে-আবেগ সঞ্চার করে, তথাকথিত বস্তুধর্ম্মী পাত্রপাত্রীরা তার ত্রিসীমানাতেও আসতে পারেনা। ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও দুর্ব্বোধ্য নয়, কারণ যে-নর-নারীর সঙ্গে আমাদের নিত্যকার আদান-প্রদান চলে, তারা এমনি প্রবৃত্তিসঙ্করে গঠিত যে তাদের আচরণের অর্থ আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই তাদের জীবনে যখন দুর্ঘটনা ঘটে, তখন আমরা তাকে আর ট্রাজিডি ব'লে ভাবতে পারিনা, কেননা ট্রাজিডির মৌল রহস্য হচ্ছে তার প্রণোদনার অলৌকিক বিশুদ্ধি, তার চরিত্রাবলীর ঐকান্তিক একাগ্রতা, তার সংঘাতের নিখিলব্যাপ্ত মাহাত্ম্য। হের্মান্ ব্রথ্-এর মানস পুত্র-কন্যারা এই অবিমিশ্র ট্রাজিডিধাতুতে নির্ম্মিত, তাদের সমস্যা হচ্ছে সাজুয্যের সমস্যা, তাদের বেদনা নিঃসঙ্গতার বেদনা, তাদের জগৎ মূল্যধ্বংসের আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ। অতএব "দি স্লিপ্ ওয়াকার্স্"-কে "ম্যাজিক্ মাউণ্টেন্"-এর সমগোত্রীয় ব'লে মনে করতে হয়, তার সমকক্ষ খুঁজলে যেতে হয় "জু সুস্"-এর কাছে। অবশ্য ব্রথ্ এখনো মান্ বা ফয়েক্ট্‌ভেঙ্গার্-এর মতো অমরত্বের দাবি করতে পারেননা; কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানি খুব সম্ভব তাঁর প্রথম রচনা, সুতরাং নিরাশ হবার হেতু নেই: ইতিমধ্যেই তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন।

উপন্যাসের সমালোচনায় গল্পের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু এখানে সে-নিয়মের ব্যতিক্রম অনিবার্য্য। তার মানে এ নয় যে এই সাত-শ-পৃষ্ঠাব্যাপী, তিনখণ্ডে-বিভক্ত উপন্যাসখানিতে আখ্যায়িকা নেই; তার মানে শুধু এই যে পুস্তকখানির আখ্যানসূত্র এমনি জটিল, এতই বিস্তৃত যে তাকে দু-চার পাতায় সরল করা অসাধ্য। নানা উপায়ে, বিবিধ দৃষ্টান্তের অনুকরণে, গল্পে, কবিতায়. নাট্যে, নির্ব্যাজ দার্শনিক সন্দর্ভের সাহায্যে ব্রথ্ যে-তত্ত্বটিকে পরিষ্কার করতে চেয়েছেন, সে হচ্ছে এই যে গত পঞ্চাশ বৎসরে পাশ্চাত্য সমাজ এমনি ব্যক্তিপ্রধান হয়ে উঠেছে যে প্রলয়ের অনর্থ ই তার উপযুক্ত উপসংহার। আজকালকার অরাজকতার বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়েছেন যে রিনেসেন্স্-যুগের মানুষ যবে অখণ্ড ধ্রুপদী আদর্শকে অচল ভেবে জীবনের মধ্যে বস্তু ও আত্মার দ্বৈত আনলে, সেইদিনই আধুনিক সর্ব্বনাশের আরম্ভ। এই ভেদবুদ্ধির ছিদ্র দিয়ে যে-শনি ঢুকলো, এখনো পর্য্যন্ত তারি দশায় য়ুরোপ বিধ্বস্ত। কারণ জীবনকে দ্বিধা করাই যদি যুক্তিযুক্ত হয়, তবে তাকে শতধা করতেও কোনো বাধা থাকতে পারেনা। যখন শুধু আত্মার জন্যেই আধ্যাত্ম চিন্তার দরকার, তখন কেবল আর্টের খাতিরে আর্টচর্চ্চাও সঙ্গত। সুতরাং শুধু লোকহত্যার জন্যে যুদ্ধ, খালি পরস্বাপহরণের

উদ্দেশ্যে বাণিজ্য, মাত্র উত্তেজনার নিমিত্ত বিদ্রোহ ইত্যাদি মতবাদও নৈরাশ্যিকের সমর্থন পেলে। এর একমাত্র সমাপ্তি মৃত্যুতুল্য নিঃসঙ্গতায়, এবং তারি প্রসারে সংসার আজকে শ্মশানে পরিণত।

এই মহাবাণীকে ব্রথ্ চারটি আদর্শ চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে ফোটাতে চেয়েছেন। ফন্ পাসেনভ্ জাতীয়তার প্রতীক ; কাজেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সঙ্গে চক্রচর সৌন্দর্য্যরসিক বের্ট্রাঁও-এর আত্মিক সহযোগ স্থাপিত হলোনা। এদিকে বের্ট্রাঁও ছিলো কল্পনাজীবী ; সুতরাং বিপ্লবী হের্ এশ্-এর সংঘাতে তাকে আত্মহত্যা করতে হলো। কিন্তু হের্ এশ্ও জড়জগতের বিশেষ ধার ধারতোনা ; অতএব উগ্নো-নামক নির্ব্বিবেকী পরজীবীটি যখন আসরে নামলো, তখন ফন্ পাসেনভ্-এর হলো বুদ্ধিভ্রংশ এবং হের্ এশ্-এর ঘটলো অপঘাত। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধা ক'রে নিয়েও উগ্নো শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হতে পারলেনা। জীবনযুদ্ধে নির্জ্জিত হয়েও অন্য তিনজন তাদের একনিষ্ঠার জোরে পারিপার্শ্বিক শূন্যতাকে চরম কালে প্রায় আত্মীয়পূর্ণ ক'রে এনেছিলো, কিন্তু উগ্নোর বিজনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেলে। তার রমণীসম্ভোগ বলাৎকারের রূপ ধরলে, বংশবৃদ্ধিকে সে উপসর্গ ব'লে ভাবলে, নাগরিক সম্মান তাকে সাধারণের সন্দেহভাজন ও উপহাস্য ক'রে তুললে। ব্যক্তিসর্ব্বস্বতার চূড়ান্তে উঠে সে বেঁচে রইলো বটে, কিন্তু তার ঘৃতপুষ্ট দেহের ভিতরে হয়তো শুধু মৃত্যুর প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইলোনা। অথচ উগ্নো নেহাৎ মন্দ লোক ছিলোনা। সাধু-সজ্জনদের মতো সেও কায়-মন-বাক্যে চেয়েছিলো স্থায়িত্ব ; শুধু সে যেটা বোঝেনি তা হচ্ছে এই যে অসহযোগে স্থায়িত্ব উৎপন্ন হয়না, সার্ব্বভৌম সদ্ভাবেই তার জন্ম। কিন্তু যে-ম্রিয়মাণ জগতে উগ্নো স্থান পেয়েছিলো, সেখানে ঐক্য তো স্বপ্নাতীত বটে, এমনকি হিতকারী বার্ত্তাবিনিময়ের ভাষা সুদ্ধ সে-সমাজ থেকে লোপ পেয়েছে। মূল্যনাশের এই অবশ্যম্ভাবী অবসান।

"দি স্লিপ্ওয়াকার্স্"-এর পরে "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" পড়া এক দিক দিয়ে যেমন অতৃপ্তিকর, অন্য দিকে তেমনি কৌতুকপ্রদ। শের্উড্ এণ্ডার্সন্, অর্নেষ্ট্ হেমিঙওয়ে প্রভৃতির মতো জন্ ডস্ পাসজ্-ও তাঁর অতি আধুনিক উপন্যাস থেকে কেবল দার্শনিকতা নয়, "সাহিত্যিকতা" সুদ্ধ বাদ দিতে প্রস্তুত। এই হাল-আমলের লেখকেরা ঘোরতর জড়বাদী, মন ব'লে কোনো জিনিসে তাঁরা বিশ্বাস করেননা ; তাই তাঁদের গল্পের ঝোঁক বিষয়ীকে ছেড়ে বিষয়ের উপর। তাঁদের রচনা অনাত্মরীতির অতিভূমি। এই সমস্ত কাহিনীর কুশীলবেরা সিনেমাছবির মতো কেবল কাজই ক'রে যায়, কখনো এতটুকু ভাবেনা ; এবং তাঁদের সাহিত্যাতিরিক্ত শিল্পাদর্শের এইখানেই শেষ নয়। তাঁরা দৈনিকপত্রের হাবভাবের নকল ক'রে আত্মপ্রসাদ পান, ব্যাকরণ ও যতিচিহ্নকে অকাতরে বলি দেন, অর্থসঙ্গতির আশঙ্কায় সদাসর্ব্বদা বেপমান থাকেন। কিন্তু তাহলেও তাঁদের পুস্তকাবলীতে একটা একাগ্র সাধনার, একটা নিষ্কাম সংযমের, একটা আত্মসমাহিত সজীবতার আভাস মেলে, যার পাশে ড্রাইসার্কে তো বাকসর্ব্বস্ব ব'লে মনে হয়ই, এমনকি সিন্ক্লেয়ার্ লুইস্কেও বাহুল্যময় লাগে।

এ-সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু তাহলেও আমার বিশ্বাস যে এই কুসংস্কারের একটা বিচারসাপেক্ষ ভিত্তি আছে। ড্রাইসার্-লুইস্-জাতীয় প্রাচীনপন্থী মার্কিনী লেখকদের সঙ্গে যাঁরাই ঘনিষ্ঠ, তাঁরাই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন যে

ওঁদের চরিত্রাবলীর পটভূমির সঙ্গে ওয়েল্সীয় কল্পলোকের সৌসাদৃশ্য কত বিশদ। এই আমেরিকান জগতেও উনিশ শতকের নিঃসংশয় বিজ্ঞান ত্রৈলোক্যচিন্তামণিরূপে বিরাজমান, এখানেও সকল সাংসারিক সমস্যা শুধু সদিচ্ছার দ্বারা সমাধানসাধ্য, এ-সমাজেও মানুষমাত্রেই প্রচ্ছন্ন উদারনীতির আধার। এ-চিত্র শুধু যে অসত্য, তা নয়, উপরন্তু দুঃসহ অভিজ্ঞতার ধাক্কায় আমরা আজ অন্তত এইটুকু শিখেছি যে এ ধরণের মানসলোকের সংসর্গও বিপজ্জনক। কারণ, জগৎ মূলত মঙ্গলময়, এই রকম শুভবাদের আড়ালে বাস করছিলুম ব'লেই মহাপ্রলয়ের দিনে আমাদের মনে প্রতিবাদের প্রবৃত্তি জাগেনি, মুখে এসেছিলো অসার অতিবাদ। সুতরাং উত্তরসামরিক সাহিত্যেও যখন সেই অসত্যের পুনরুদ্ধার দেখি, তখন বিতৃষ্ণাবোধ তো স্বাভাবিক বটেই, অধিকন্তু সহজেই মনে হয় যে এ-সাহিত্যের আসল উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি নয়, প্রচারকার্য্য।

প্রথমে দার্শনিক উপন্যাসের পক্ষে যে-ওকালতি করেছি, আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে উপরোক্ত অভিমত তার পরিপন্থী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই আর বিরোধ থাকবেনা। স্বকীয় তুলাদণ্ডে ভারি কথার বাটখারা দিয়ে জগৎকে ওজন করা অসার্থক ব'লেই দার্শনিক নিরীক্ষার প্রয়োজন ; কারণ সার্ব্বজনীন বিচারবুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিগত মানদণ্ডের সমীকরণই তত্ত্বদর্শনের প্রধান কর্ত্তব্য। এবং নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্যসাধনাও যেহেতু একের ভাবনা-বেদনাকে সকলের ভাবনা-বেদনার অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তাই অনাত্মরীতির সঙ্গে দার্শনিকের কোনো বিবাদ নেই। প্রচারকের মনোভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটা সর্ব্ববাদিসম্মত, যার মূলমন্ত্র প্রত্যাখ্যান নয়, পরিগ্রহণ, তার বিজ্ঞাপন অনাবশ্যক ; কিন্তু ভেদবুদ্ধি দলপুষ্টি ব্যাতিরেকে টিঁকতে পারেনা, সুতরাং প্রচারকার্য্যই তার নিত্যকর্ম্ম। মানুষমাত্রেই অতুল মর্য্যাদায় অধিকারী, এবং তাই তার আত্মবলিদানে জগতের মঙ্গল নিশ্চিত, একথা বলা এক ; আর মানুষ-মাত্রেই কুসংস্কারাপন্ন, এবং বিজ্ঞানই তার একমাত্র মুক্তিমার্গ, এ-তথ্য জাহির করা অন্য। এই মীমাংসাদ্বয়ের মধ্যে আকাশ-পাতালের প্রভেদ আছে। যে ঔপন্যাসিক প্রথম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাঁর পক্ষে নিরপেক্ষ রূপসৃষ্টি শক্ত নয় ; তিনি জানেন যে মানবচরিত্র ক্রিষ্টালের মতো, নীতিকারের হস্তাবলেপে তার অন্তরঙ্গ শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, কিন্তু স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেলে সে সহজ সৌন্দর্য্যে স্বসমুখ হয়ে ওঠে। অন্য দলের পক্ষে এই রকম নিরীহ সহিষ্ণুতা দুর্ল্লভ ; তাঁরা স্থির করেছেন যে জগত্রাণের বীজমন্ত্র শুধু তাঁদেরই আয়ত্তে ; কাজেই যে-মানুষ সে-দীক্ষা অগ্রাহ্য করে, তার উচ্ছেদ-কামনায় তাঁরা বাধ্য। ফলে তাঁদের উপন্যাস হিতোপদেশ হিসাবে মহার্ঘ হ'লেও জীবনের চিত্র হিসাবে অতিরঞ্জিত। পূর্ব্বে বলেছি যে সত্যনিষ্ঠা হয়তো ঔপন্যাসিকের অভিষ্ট নয় ; কিন্তু সত্যকল্পতা কথাসাহিত্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ। সাহিত্য যতই কল্পনাপ্রবণ হোকনা কেন, তার সঙ্গে কোনো পরিচিত তত্ত্বের সংঘর্ষ ঘটলে, ক্ষতি একা সাহিত্যেরই। এইজন্যেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিকে অবৈকল্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চান ; কারণ যে-শিল্প অবিকল, অখণ্ড, তার সম্পূর্ণতা কোনো অভিমতবিশেষের যাথার্থ্যের সঙ্গে বিজড়িত থাকেনা ; সে স্বাবলম্বী, কাজেই তার অদৃষ্টে সংঘাতের দুঃখ নেই, সে সকল পক্ষপাতের অতীত।

বলাই বাহুল্য যে এই সকল মতামত আমার নিজস্ব চিন্তার ফল। আমি যে-লেখকসম্প্রদায়ের কথা বলছি, তাঁরা প্রকাশ্যে কোনো আধিদৈবিক আদর্শে বিশ্বাস

করেননা ; তাঁরা জীবনকে যেমন দেখেন, ঠিক তেমনি ক'রেই আঁকতে চান ; ফোটোগ্রাফের পুঙ্খানুপুঙ্খ বস্তুনিষ্ঠাই তাদের অভিপ্রেত পদ্ধতি। এবং বোধহয় সেইজন্তেই জন্ ডস্ পাসজ্ আলোচ্য উপন্যাসের বেশ খানিক অংশ পুরাতন দৈনিক-পত্রের পাঠোদ্ধারে ভরেছেন। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" কোনো মানুষের জীবনচরিত নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চৌদ্দ বৎসরই তার মুখ্যপাত্র। এবং আমাদের কালের প্রকৃত স্বরূপ যেহেতু সংবাদপত্রেই সুপরিস্ফুট, তাই যুগচিত্রের প্রত্যেক প্রতীকের বহিঃরেখা তিনি টেনেছেন আষ্টপ্রহরিক খবরের রঙে। এই কালের ট্রাজিডি কতকগুলি সঞ্চরণশীল মূর্ত্তির সাহায্যে রূপায়িত হয়েছে। মূর্ত্তিগুলি মার্কিনী জীবনের বিভিন্ন ধারার বিগ্রহ, ধ্বংসোন্মুখ সময়স্রোতের বুদ্বুদ, তারা নানা কারণে নানা স্থানে উদ্ভূত এবং সকলেই য়ুরোপীয় মহাসমরের প্রলয়পয়োধিতে বিলুপ্ত। তারা এরূপ অন্তঃসারশূন্য ও নৈমিত্তিক, জীবনের এমন সমস্ত অখ্যাত স্তরে তাদের উৎপত্তি, এতই অপ্রতিষ্ঠ তাদের ব্যক্তিত্ব যে তাদের দিনগত পাপক্ষয়ের বিবরণে তত্ত্বদর্শন তো দূরের কথা, কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনার সুদ্ধ অবকাশ নেই। কিন্তু আখ্যানবস্তুর এই অকিঞ্চনতা বইখানির সারসংগ্রহে বাধা দিলেও, তাতে ক'রে গ্রন্থকারের জাগতিক নিরীক্ষা বরং উজ্জ্বলতর হয়েছে। কারণ ফটোগ্রাফের পদার্থনির্ভর সত্যপরায়ণতা প্রসিদ্ধ হ'লেও, তার ব্যাপকতা অসীম নয়। অতএব জীবনের অকৃত্রিম আলেখ্য ব'লে যদি কোনো ফোটোগ্রাফের সুনাম থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ফোটোগ্রাফার জীবনের কোনো একটা দিককে সমগ্রতার পরমোত্তম প্রতিনিধিরূপে বেছে নিয়ে তবেই গ্রাহকযন্ত্রের ব্যবহার করেছিলেন। এবং এই নির্ব্বাচনের পিছনে জীবনসম্বন্ধে একটা মন্তব্য উহ্য থাকেই থাকে।

কিন্তু এই চিরনিয়ম যদি আলোচ্য লেখকসম্বন্ধে প্রযোজ্য নাও হয়, জন্ ডস্ পাসজ্-এর মনে যদি দার্শনিকতার ছায়ামাত্রও না-থাকে, তবুও মানতে হবে যে নিছক সহজজ্ঞানের সাহায্যে তিনি যে-সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, সেই একই সত্য হের্মান্ ব্রথ্ অর্জ্জন করেছেন অতিচেতন বুদ্ধির কল্যাণে। কারণ "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এ যত চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাদের আত্মাও সুষুপ্ত, তারাও নিঃসঙ্গতার দুস্তর পরিখায় বেষ্টিত, তাদের পরস্পরের মধ্যে ক্বচিৎ কদাচিৎ দেহের মিলন হয়তো বা ঘটে, কিন্তু মনের সালোক্য একেবারেই অসিদ্ধ থেকে যায় ; তারাও চলে মৃত্যুর অভিযানে, কেননা বিশ্বে ধ্রুব পাদপীঠ পাবার যোগ্য মূল তাদের নেই,—তাদের জীবন একটা এমনি নিরর্থ উদ্যোগে উপদ্রুত যে যুদ্ধের সর্ব্বনাশকেও তারা গন্তব্য ব'লে ধরে নিয়ে শান্তি পায়। তাছাড়া উভয় পুস্তকেই রচনারীতির একটা সাদৃশ্য আছে : দুই লেখকই কোনো প্রাচীন প্রকরণকে মেনে চলতে রাজি নন, এমনকি বিপ্লবী আদর্শকেও তাঁরা পুরোপূরি গ্রহণ করতে পারেননা ; গদ্য, পদ্য, সাংবাদিক সংক্ষিপ্ততা সকল পদ্ধতিতেই তাঁদের সমান পক্ষপাত। তবে ব্রথ্ আর্টের তথাকথিত কমঠবৃত্তিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেননা, বিনা প্রয়োজনে গল্পের মধ্যে অনবগুণ্ঠিত তত্ত্বকথার অবতারণা করেন ; এবং জন্ ডস্ পাসজ্ শিল্পকে এত ভঙ্গুর ভাবেন যে শিল্পাতিরিক্ত কোনো বস্তুকে কোল দিতে তিনি নারাজ, এমনকি তাঁর মতে ঔপন্যাসিকের পক্ষে ভাবুকতাও হয়তো অমার্জ্জনীয়। বুঝি সেইজন্তেই "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্" "দি স্লিপ্ ওয়াকার্স্"-এর চেয়ে সুখপাঠ্য, এবং "দি স্লিপ্ ওয়াকার্স্" "দি ফর্টিসেকেণ্ড্ প্যারালেল্"-এর চেয়ে

গভীরতর। কিন্তু দুখানিই অসাধারণ পুস্তক ; তাই আশা করি চিন্তাশীল পাঠক কোনোটিকেই বাদ দেবেননা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

Freedom in the Modern World—By John Macmurray, with a Preface by C. A. Siepmann (Faber and Faber Ltd.).

প্রতীচ্যদর্শনক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে জন্ ম্যাক্মারে একজন উদীয়মান লেখক। বিগত ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের Grote অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অক্সফোর্ডের বেলিয়ল্ কলেজে ইঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় এবং অক্সফোর্ডে যে চিরাগত অধ্যাত্মবাদের আবহাওয়া প্রবহমান তাহারই মধ্যে ইঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই পুস্তিকাখানিতে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাই।

পুস্তিকাটির আলোচ্যবিষয়—"বর্ত্তমান জগতে স্বাধীনতার স্বরূপ"। ইহার আয়তনের তুলনায় ইহার ভাবগৌরব যথেষ্ট সমৃদ্ধ বলিতে হইবে। দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য তত্ত্বগুলি এত প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে যে ব্যাখ্যা করা যায় তাহা গ্রন্থখানি পাঠ না করিলে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। গ্রন্থকারের পরিচয়-প্রদান-সূত্রে যে ভূমিকার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে ঠিক এই কথারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থখানির ষোড়শ অধ্যায় ব্রিটিশ ব্রড্কাষ্টিং কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে বেতার শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির একরকম যথাযথ পুনরুল্লেখ। বেতার জগতের শ্রোতৃবর্গ অপেক্ষা বৃহত্তর পাঠকমণ্ডলীর নিকট ইহার যে একটা অবশ্যম্ভাবী আবেদন আছে তাহা বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা এই বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়া ইহার বহুলপ্রচারের প্রচেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের বিচারনৈপুণ্য প্রশংসার্হ।

গ্রন্থকারের উপক্রমণিকা ব্যতীত দুই পর্য্যায়ে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। প্রথম পর্য্যায়ে চারটি বক্তৃতায় "বর্ত্তমান উভয়সঙ্কট" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পর্য্যায় বারটি বক্তৃতায় পর্য্যবসিত এবং এগুলির আলোচ্যবিষয়—"সত্যের স্বরূপ ও স্বাধীনতা"। প্রথম বক্তৃতায় "সত্যই কি বর্ত্তমান সময়ে এক উভয়সঙ্কট উপস্থিত ?"—এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে আমাদের সকল দুঃখ, সকল ব্যর্থতার মূলীভূত কারণ এই যে আমরা সেই আস্তিক্যবুদ্ধি, সেই আত্মনির্ভরতা ও শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিয়াছি যাহা আমাদের সকল কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। যে কেন্দ্রীভূত আশা ও বিশ্বাসের জৈবপ্রেরণায় আমাদের জীবন চরম কামনার বস্তু হইয়া উঠে, সে বিশ্বাস ও আস্থা আজ অন্তর্হিত। তাই আমাদের জীবন এত দুর্গত, এত মোহাবিষ্ট, এত লক্ষ্যহীন। সেইজন্তই একএক সময় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়াবস্থায় বলিয়া উঠি, 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?' —'কোন্ দেবতার উপাসনা করিব ?' জীবনের সেই ধ্রুবতারা আজ লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাই 'পথ কোথায় ?' বলিয়া ফিরিতেছে। মনে হয় বুঝি বা মানবজীবনের উন্নতিতে বিশ্বাস করি। কিন্তু আত্মপরীক্ষা করিলেই দেখি যে এটা মুখের কথামাত্র, প্রাণের

সাড়া এতে পাই না। "এই উন্নতিকল্পে আমরা কি ত্যাগস্বীকার করিতে পারি ?—কারণ এই ত্যাগস্বীকারই আমাদের বিশ্বাসের মানদণ্ড। সমরনীতিতে আমরা বিশ্বাস না করিতে পারি কিন্তু শান্তিতেই কি আমাদের বিশ্বাস আছে ?···দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরাই যাক্—ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতায় কি আমরা বিশ্বাস করি ?—আমার তাহা মনে হয় না। তবে কি আমাদের বিশ্বাস যে ভারতের স্বাধীন হইবার যোগ্যতা নাই ?—নিশ্চয়ই তা' আমাদের বিশ্বাস নয়।" মূলকথা, "আমাদের জীবনের সমস্ত আদর্শ আজ প্রাণহীন, এগুলিতে বিশ্বাসও নাই, অবিশ্বাসও নাই। এইখানেই আমাদের উভয়সঙ্কট"। এই উভয়সঙ্কটের বহিঃপ্রকাশ দেখিতে পাই "আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়, আমাদের চিন্তা ও হৃদয়াবেশের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে"। (পৃঃ ২৪—৫)

এইরূপে হৃদয়াবেশ ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলির দিক্ হইতে দেখিলে সহজেই আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটা অসামঞ্জস্য বা বৈষম্য লক্ষিত হয়। এটাও সেই বর্ত্তমান সমস্যারই আর একটা দিক। "বর্ত্তমান যুগে অর্থাৎ মধ্যযুগের অবসানের সময় হইতেই জ্ঞানরাজ্যের পরিধি সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে ভাবপ্রবণতা বা হৃদয়াবেগের দিক্‌টা পরিণতিলাভ করে নাই। ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে চিন্তাশক্তির দিক্ হইতে সভ্যতার উচ্চগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়াছি বটে কিন্তু হৃদয়বৃত্তির দিক্ হইতে এখনও আমরা আদিম অসভ্য অবস্থায় রহিয়া গিয়াছি। সেজন্য আজ এমন একটি জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছি—যেখানে জ্ঞানের অধিকতর প্রসার ক্রমশঃই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া উঠিবে।" (পৃঃ ৪৩)

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে "এই উভয়সঙ্কটের উৎপত্তি আমাদের মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে কোনো বিরোধে বা বিচ্ছেদে নয়, ইহার মূল আমাদের হৃদয়েই নিহিত। মানবজীবনের যাহা একান্ত কাম্য ও উপাস্য তাহা চিন্তা বা ধীশক্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হয়না—তাহা কেবল হৃদয়বৃত্তির আলোকপাতেই প্রকাশ পায়। "জীবন কোন বিজ্ঞানের কোঠায় পড়ে না, এটা একটা আর্ট।" (পৃঃ ৫১)

পরিশেষে গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্যের নিষ্কর্ষ উপসংহারে নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন —"বর্ত্তমান সমস্যার উত্তরে আমার এই বলিবার আছে যে আমরা জীবনের মূলীভূত বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছি এবং সেইজন্যই ক্রমশঃ আমাদের স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিতেছি। আমাদের ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানে ইহা খুব স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি।" কিন্তু "ধর্ম্ম বা নীতি বলিতে যথার্থ বা প্রাণবান্ ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান বুঝি —ধর্ম্মের বা নীতির কতকগুলি বহিরাবরণ ও উপকরণ বা কাল্পনিক প্রতীক নহে। ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাস, এবং ঈশ্বরসঙ্গ ও সাহচর্য্য ব্যতীত উহা অনর্থক ; এবং নীতি অর্থে বুঝি—মানব জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় বিশ্বাস, নচেৎ উহা কাল্পনিক মায়াজাল বা বাগাড়ম্বর মাত্র।" (পৃঃ ২০০)

এই বিশ্বাসই মানব জীবনে কর্ম্মপ্রেরণার উৎসস্বরূপ। "যখন তাহার সন্ধান আর মিলে না তখন বাধ্য হইয়াই মানুষ জীবনের নিষেধাত্মক আর একটি উৎস আবিষ্কার করে, সেটি ভয়।" মানুষ ভয়ের প্রেরণাতেই যখন চলে তখন তার আত্মনির্ভরপ্রসূত, আনন্দাত্মক সহজ সাবলীল গতিচ্ছন্দ অন্তর্হিত হয়। তখন মানুষ স্বভাবতই শক্তির শরণ নেয়—এবং সেই শক্তি রাজদণ্ড বা সমাজদণ্ডকে আশ্রয় করিয়া "স্বাধিকারপ্রমত্তঃ" হইয়া উঠে। "মানুষ তখন ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে আচারতান্ত্রিক হইয়া উঠে।"

(পৃঃ ২০৯)। আধুনিক খৃষ্টধর্ম্ম অনেকটা এই আচারনিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতারই নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ "দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে খৃষ্টধর্ম্ম বলিতে যা বুঝায় তাহার অনেকটাই যিশুখৃষ্টের বা সেণ্ট পালের ধর্ম্মানুশাসনের সহিত সম্পর্কবিরহিত" (পৃঃ ২১০)। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে "সমাজসেবা বলিতে যা বুঝায় তাহার উপর আমার কোন আক্রোশ আছে।" আমি "যাহার নিরসনার্থে উত্থত তাহা জনসেবা, সমাজসেবা বা রাষ্ট্রসেবার উপলক্ষ্যে মানুষের নীতি বা কর্ত্তব্যজ্ঞানকে স্থানভ্রষ্ট করা।" (পৃঃ ২১০)। যদি জনসেবাকেই মানুষের একমাত্র আদর্শ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় তবে স্বভাবতই মানুষের চেষ্টা ও আশা সমাজগঠনেই আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ হইবে এবং তাহার ফলে রাষ্ট্রনীতিই একমাত্র ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মোক্ষ হইয়া উঠিবে। "ইহার চরম পরিণতি হইতেছে - হয় বলশেভিক্‌বাদ নতুবা ফ্যাসিষ্টবাদ। কারণ বলশেভিজ্‌ম্ বা ফ্যাসিজ্‌ম্ অন্ধ প্রতিষ্ঠানতন্ত্রতার আদর্শানু-কল্পিত।···কিন্তু আমি ইহার একটিরও উপাসক নই। আমার বিশ্বাস মানুষের জীবনের সার্থকতা বা উৎকর্ষ তাহার মানবত্বের পূর্ণবিকাশের উপরই নির্ভর করে এবং এজন্য তাহার পূর্ণ স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজনীয়।" (পৃঃ ২১৩)

আধুনিক জীবনযাত্রার আর একটি অভাবের দিকে গ্রন্থকার পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। "আমার বিশ্বাস বর্ত্তমান কালে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিকৃষ্টতম বিশেষত্ব তার সৌন্দর্য্যবোধের অভাব ও তৎপ্রতি অনাস্থা।" কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে "সৌষ্ঠবসম্পন্ন সুসমঞ্জস আচরণই নীতিসম্মত আচরণ।" (পৃ ২১৪)। পরিশেষে এককথায় যদি আমার বক্তব্য নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে বলি "আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়াই আমাদের নৈতিক জীবনের একমাত্র আদর্শ। কিন্তু সেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে আমাদের আত্মস্থ বা আত্মসমাহিত হইতে হইবে, আমাদের আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।" এ ত প্রাচীর পক্ষে নূতন, অশ্রুতপূর্ব্ব বাণী নয়, তাহারই প্রতীচ্য সংস্করণ মাত্র।

শ্রীসরোজকুমার দাস

The Common Reader—BY VIRGINIA WOOLF (The Hogarth Press).
Criticism—BY DESMOND MACCARTHY (Putnam).

ক্রনেতিয়ের্ ও লেমেয়্‌ত্রের মধ্যে সমালোচনার জাতিবিচার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব এখন ইতিহাসের ব্যাপার হয়ে পড়েছে, সে যুদ্ধে আনাতোল্ ফ্রঁসের মতো আমিও লেমেয়্‌ত্রের দলে। বাস্তবিক সমালোচনার মাপকাঠি শেষ পর্য্যন্ত তো ব্যক্তিগত রুচির কথাই। অবশ্য রিচার্ডস্ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমনা সমালোচকেরা নৈর্ব্যক্তিক বিচারের চেষ্টা করছেন। তাঁর ছাত্র উইলিয়ম এম্‌সনের Seven Types of Ambiguity বিশ্লেষণ জাতীয় সমালোচনার বই। কিন্তু মোটামুটি ম্যাক্‌কার্থি তাঁর ভূমিকায় সমালোচনা সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মান্‌তে হয়। তিনি বলেছেন, যে শুধু aesthetic emotion ও technical perfection নিয়ে যাঁরা চঞ্চল, তিনি তাদের সঙ্গে নেই। তাঁর সমস্ত স্বভাব দিয়ে তিনি পড়েছেন, সাড়া দিয়েছেন ও সমালোচনা লিখেছেন।

বলা বাহুল্য, তাঁর ব্যক্তিত্বকে সকলের ভালো না লাগতেও পারে। এই কারণেই শয়ের লেখা আমার পক্ষে কষ্টপাঠ্য। সুখের কথা, Criticism-এর লেখককে ঠিক তেমনি অসহ্য লাগে না। এমন কি, যদিও রেবেকা ওয়েষ্ট্ ম্যাক্‌-কার্থির নাম গসের সঙ্গেই নিয়েছিলেন তবু পরলোকগত সে জীবন্ত বিশ্বকোষের চেয়ে ম্যাক্‌কার্থিকে আরো নাগরিক ও সাহিত্যিক বলে মনে হল। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই জাতের বই রিভিউ করা। প্রায় ত্রিশটী প্রবন্ধ—ডান্ ও রিচার্ড্‌সন্ থেকে এলিয়ট্ ও জয়স্—সমস্তগুলিকে হৃদয়বৃত্তি দিয়ে পড়ে তার সমালোচনা এক্ষেত্রে অসম্ভব। বিশেষ করেই তাই, কারণ শ্রীমতী উল্‌ফের The Common Reader নামে যা, এখানি কাজে তাই, অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের জন্যে লেখা। এর প্রায় সব প্রবন্ধেই সায় দিতে পারা যায়। কথাগুলি লেখা প্রায়ই ভালো। ডানের প্রবন্ধই ধরা যাক্। স্পষ্ট সহজ বুদ্ধির কথা, প্রায় শ্রীমতী উল্‌ফের Donne After Three Centuries-এরই মতো। কিন্তু কোনো লেখাই ভাবায় না; আর যদিও বা ভাবায় তবু শীঘ্রই সিদ্ধান্তগুলিকে মেনে নেওয়া বা উড়িয়ে দেওয়া যায়। এলিয়ট্ লিখলে হয়ত ডানের অদৃষ্টপূর্ব্ব কোনো গুণ চোখে পড়ত, কিন্তু এ রকম সুখপাঠ্য হত কি? অবশ্য ম্যাক্‌কার্থির প্রবন্ধগুলিতে সারবান কথা নেই ভাবলে ভুল হবে। তাঁর প্রতি প্রবন্ধেই গ্রহণীয় বক্তব্য আছে। তিনি বহু পড়াশোনা করেছেন ও সাহিত্যাদির বিষয়ে ভেবেছেন। তিনি কোনো highbrow দলে নেই, অথচ তিনি টম্‌লিন্‌সনের মতো এলিয়ট বা লরেন্সের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে বাহাদুরি বোধও করেন না। এই প্রবীণ সমালোচকের সৌজন্য ও উদারতা মুরুব্বিবহুল সাময়িক সাহিত্যের মধ্যে তাই খুসি করেছে। জয়সের মহান্ সাধনার বিফলতা বা হাক্‌স্‌লির অসম্পূর্ণতার কথা ম্যাক্‌কার্থি যখন বলেছেন, তখন সে কথা সাধারণ প্রবীণের অসহ্য সঙ্কীর্ণতাজাত হয় নি। প্রসঙ্গত, হাক্‌স্‌লির সঙ্গে Point Counter Point-এর Quarles-এর মিল, রিচার্ডসন ও রস্কিনের সঙ্গে প্রুস্‌ৎ বা কার্লাইলের সঙ্গে লরেন্সের কোথায় সাদৃশ্য আছে, এই রকম কথা আপাতবোধ্য হলেও ম্যাক্‌কার্থি লিখেছেন বেশ।

শ্রীমতী উল্‌ফের The Common Reader-এ জনসনের একটী কথা রয়েছে

"I rejoice to concur with the common reader; for by the common sense of readers, uncorrupted by literary prejudices, after all the refinements of subtlity and the dogmatism of learning, must be generally decided all claim to poetical honours."

যদিচ এ বাক্যে অনেক তর্কের কথা আছে, সে না হয় থাক্, কিন্তু শ্রীমতী উল্‌ফ সাধারণ পাঠক তো ননই, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে সায় দিয়ে উৎফুল্ল হবার অধিকারও তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। লণ্ডনের টাইপিষ্ট্ মেয়েরা কি পড়েন জানি না, কিন্তু বোধহয় যাঁরা *The Countess of Pembroke's Arcadia*, *Dorothy Osborne's Letters*, *Swifts' Journal to Stella*, *Lord Chesterfield's Letters* পড়ে খুসি হন বা যাঁরা *James Woodforde* বা *Skinner*, *Dr. Burney's Evening Party*, *Jack Mytton*, *Mary Wollstonecraft* প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানবান, তাঁদের পথেঘাটে বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য শ্রীমতী উল্‌ফের প্রবন্ধগুলি আমরা পড়তে পারি, মোটামুটি মান্‌তে পারি ও পড়তে ভালো লাগে। তার কারণ

যদি আমাদের common-sense হয় ও তার ফলে যদি শ্রীমতী উল্‌ফ্ উৎফুল্ল হন, তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। অবশ্য তাঁর প্রথম প্রবন্ধ The Strange Elizabethans-এ তিনি সাধারণের মতো রলে, ড্রেক্ সিড্‌নি, বেকন্ আদির কথা না ভেবে গোদোহনরতা মার্সি হার্ভি ও তার ভাই গাব্রিএল হার্ভির বিষয়েই লিখেছেন। তবু মাঝে মাঝে অতিতীক্ষ্ণতা, সৌকুমার্য্যের ত্রুটি ও বিস্তার অক্ষতা থাকলেও শ্রীমতী উল্‌ফ্ প্রকারান্তরে তা ব'লে কিছু অন্যায় বা অশোভন বলেন নি। মারি বা পাউণ্ড্ জাতীয় লেখকের সমালোচনার পরে এই স্বচ্ছন্দ চিত্রবহুল রচনাপাঠে স্বস্তি পাওয়া যায়। এবং ম্যাক্‌কার্থির Criticism-ও এই জন্য ভালোই লাগল। অবশ্য শ্রীমতী উল্‌ফের ও ম্যাক্‌কার্থির সমালোচনা ঠিক একজাতের নয়। যথা, প্রুস্তের উপরে ম্যাক্‌কার্থির সারগর্ভ উপাদেয় প্রবন্ধটীতে লেখক এক জায়গায় বলেছেন,

Personally, nothing would induce me to live in Proust's world . . . .

How I should have missed in him, as a man, contact with the common massive satisfactions of life, and the steadiness of fundamental good nature! শ্রীমতী উল্‌ফ্ তাঁর ROBINSON CRUSOE-তে প্রসঙ্গত লিখেছেন—"Thus when JUDE THE OBSCURE appears or a new volume of Proust, the newspapers are flooded with protests. Major Gibbs of Cheltenham would put a bullet through his head to-morrow if life were as Hardy paints it; Miss Wiggs of Hampstead must protest that though Proust's art is wonderful, the real world, she thanks God, has nothing in common with the distortions of a perverted Frenchman.

এবং সেই কারণেই বোধহয় ম্যাক্‌কার্থির John Donne ও শ্রীমতী উল্‌ফের Donne After Three Centuries দুটীই ভালো এবং স্বভাবতই অনেকটা এক-রকম হলেও বিভিন্ন। দু একটী কথাই শুধু ধরা যাক্। গসের নাম ক'রে ম্যাক্‌কার্থি বলেছেন যে ডানের মন সিড্‌নি রলে জাতের এলিজাবিথানের। এবং শ্রীমতী উল্‌ফ্ বলেছেন যে এলিজাবিথানদের বিশেষত্বগুলির কিছুই ডানের স্বভাবে ছিল না। এলিজাবিথানদের বাক্যবহুলতা, বিস্তৃতির ঝোঁক, নাটকীয় ভঙ্গী ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমতী উল্‌ফের কথাগুলি শ্রোতব্য। এবং তাঁর মতে ডান্ ঠিক এর বিপরীত। সেইজন্যই ম্যাক্‌কার্থি ডানের Anniversaries লেখার জন্য লজ্জিত বোধ করেন ও শ্রীমতী উল্‌ফ্ লেখেন—

True, the rocket bursts; it scatters in a shower of minute, separate particles—curious speculations, wiredrawn comparisons, obsolete erudition; but winged by the double pressure of mind and heart, of reason and imagination, it soars far and fast into a finer air. . .

ইত্যাদি। কিম্বা ম্যাক্‌কার্থির ধর্ম্মকবিতা সম্বন্ধে একটীমাত্র কথাই ধরা যাক্—ডানের ধর্ম্মকবিতাগুলির মধ্যে যেটা তাঁর কাছে সব চেয়ে বড়ো বিশেষত্ব সে হলো the monotony of the experience expressed। শ্রীমতী উল্‌ফের কাছে এই অভিজ্ঞতা full of contraries and agonies এবং সেইজন্য এই কবিতাগুলি are poems of climbing and falling, of incongruous clamours and solemnities ইত্যাদি। এবং সেইজন্যই এই কবিতাগুলির ডাকে আমরা

সাড়া দিই—একঘেয়ে ঘুমপাড়ানির সুর এতে জাগে না, জাগে, আগ্রহ ও বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা ও কৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা।

তাছাড়া এ দুই বইয়ের রচনারীতিতেও প্রভেদ আছে।

শ্রীবিষ্ণু দে

The Revolt of the Masses—By Jose Ortega y Gasset, (George Allen & Unwin Ltd.).

গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য নিবন্ধ পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের সারভূত বক্তব্য তাঁহারই ভাষায় যথাসম্ভব উদ্ধৃত করিতেছি।

"জগতের শাসক কে?"—এই অধ্যায়ের সূচনাতেই গ্রন্থকার তাঁহার ধারণা স্বল্পাক্ষরে ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ইউরোপীয় সভ্যতা স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই জনসংঘের বিদ্রোহ সংঘটন করায়। অপর দিকে ইহারই আর এক ভয়াবহ পরিণতি দেখিতে পাই মানবচিত্তের আমূল নৈতিক অবনতিতে। (পৃঃ ১৩৭)

আজিকার দিনে সমস্ত জগদ্ব্যাপী একটা গভীর নৈতিক অবনতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। জনসাধারণের এক অত্যুগ্র বিদ্রোহিতাই তাহার অন্যতম প্রকাশ এবং নৈতিক অবনতি হইতেই এই জগদ্ব্যাপী অবনতির উৎপত্তি। ইউরোপের অবনতির কারণ অবশ্য একাধিক। ইহার একটি মুখ্য কারণ এই যে ইউরোপের আত্মকর্ত্তৃত্ব ও অবশিষ্ট জগতের উপর প্রভুত্ব আজ তাহার অধিকারচ্যুত। ইউরোপের স্বীয় প্রভুত্বে অনাস্থা জন্মিয়াছে এবং জগতের অবশিষ্টাংশেরও কোন ধারণাই নাই যে ইউরোপ তাহায় শাসক। পরম্পরাগত একাধিপত্য আজ ছত্রভঙ্গাবস্থায় পর্য্যবসিত।

সর্ব্বত্রই কি রকম একটা অনাস্থা ও অনিশ্চিয়তার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে কি বা কাহাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম্ম চালিত হইবে তাহা কেহ জানে না। এজন্য মানুষের জীবন যাত্রা 'দিনগত পাপক্ষয়ে'র মতই হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত জগতেই যে একটা অধ্রুব চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহা কোনও সৃষ্টির সূচনা নয়, তাহা আত্মপ্রবঞ্চনা বা মায়ামুগ্ধতারই নামান্তর। এ অবস্থায় যাহা আমাদের নিকট অনিবার্য্য বা অপরিবর্ত্তনীয় নির্ব্বন্ধের মত আসে তাহাই আমাদের একমাত্র স্থির প্রতিষ্ঠাভূমি ও আশ্রয়। পক্ষান্তরে যাহা কিছু আমার ইচ্ছামত গ্রহণ বা বিসর্জ্জন করিতে পারি তাহা আমাদের জীবনকে মায়াজালে আবৃত করিয়া রাখিবে। পুরুষও যেমন আজ বুঝিয়া উঠিতে পারে না কোন্ পন্থা অবলম্বন করিয়া বা কোন প্রতিষ্ঠানের সেবায় তাহার জীবনের সার্থকতা লাভ করিবে, নারীও সেরূপ জানেনা কোন্ শ্রেণীর পুরুষ তাহার পক্ষে একান্ত কাম্য।

কোন এক বৃহৎ ঐক্যসাধনায় আত্মোৎসর্গ না করিলে ইউরোপীয় মানব বাঁচিতে পারে না। যখন এ বিষয়ে তাহার কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় তখনই তাহার

অধঃপতন আরম্ভ হয় ও তাহার আত্মিক শক্তি অন্তর্হিত হয়। আমাদের চক্ষের সম্মুখেই তাহার সূচনা দেখিতে পাইতেছি। যে সব মানবসমষ্টি আজ জগতের বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত তাহারা প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রম বিবর্ত্তনের প্রভাবে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে আরও কোন উন্নততর অবস্থায় উন্নীত করা ব্যতীত আর কোনও উপায় নাই। এই জাতিগুলি ইউরোপের পক্ষে কেবল অতীতের দুর্বহ ভারস্বরূপ হইয়া উঠিয়া ইহার ক্রমবিবর্ত্তনের গতিরোধ করিয়াছে। মনে হইতেছে যেন জাতিসংঘের এই সংহত অবস্থা বিশ্বমানবের শ্বাসরোধ করিয়াছে। তাই আজ মানব এই অচলায়তনের বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া দিতে কহিতেছে। ইহাতেই তার মুক্তি, ইহাতেই তাহার জীবন। পূর্ব্বে যাহা মুক্ত আকাশের তলে নিত্য বিহার ছিল আজ তাহা নিতান্তই প্রাদেশিক, অবরুদ্ধ আকাশেরই প্রতীক হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ সকলেই জীবনের এক নূতন প্রেরণা আবিষ্কারে সচেষ্ট। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে এখনও তাহাই হইতেছে—অর্থাৎ যে-বিষপ্রয়োগে এই অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহাই পূর্ণমাত্রায় সেবন করিয়া উপস্থিত বিপদ্ হইতে অনেকে ত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিতেছ। ইহাই আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদের স্বরূপ। ইহাই বিনাশের সুনিশ্চিত পথ। দীপে নির্ব্বাণের পূর্ব্বক্ষণে যেরূপ বহুক্ষণব্যাপী আলোকের উল্লাস হয়, মরণোন্মুখ প্রাণীর শেষ প্রশ্বাস যেরূপ গভীর হয়, ইহাও তদনুরূপ। এই যে বর্ত্তমানকালে সমরনীতি ও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে জাত্যভিমানের উত্তরোত্তর সম্প্রসারণ হইতেছে, তাহা ইহারই অন্তিম-প্রয়াণ সূচিত করে।

এই সমস্ত জাত্যভিমান বা জাতীয়তাবাদ নির্দ্দেশশূন্য সুড়ঙ্গের মত। যে শক্তির প্রভাবে মানবসমষ্টি জাতিতে সংহত হয়, জাত্যভিমান সেই শক্তিরই প্রতিকূলাচরণ করে। সেই মৌলিক শক্তি সংযোজনপর, জাত্যভিমানমূলক শক্তি বর্জ্জনপর। জাতি-গঠনের এক অবস্থায় জাতীয়তাব্যঞ্জক শক্তির একটা মূল্য আছে এবং তাহা উচ্চ আদর্শ বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু ইউরোপে এখন সমস্তই সুগঠিত বা অতিমাত্রায় সুসংবদ্ধ। সেজন্য জাত্যভিমানের প্রয়োজন আর নাই। ইহা এখন ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে একটি বায়ু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইয়া সার্থকতালাভ না করায় ইহা শুধু প্রবঞ্চনা হইয়া উঠিয়াছে। আদিম অসভ্য অবস্থার সহিত ইহার যে মূলগত সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় জাতীয়তাবাদ ক্রমাভিব্যক্তিশক্তির বিরোধী।

গ্রন্থকারের নিবন্ধের সহিত আমাদের ভাবগত ঐক্য থাকুক বা নাই থাকুক পুস্তকখানি গভীর ও মৌলিকচিন্তাশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

শ্রীসরোজকুমার দাস

If the Blind Lead—(An Essay for the Post-Democratic Age); A Realist Surveys Modern Culture, (Benn).

The Coming Struggle for Power—JOHN STRACHEY, (Gollancz).

বর্ত্তমান সভ্যতার এখন সঙ্কটময় অবস্থা। তাকে বাঁচাতে হলে সমাজের আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন। কিন্তু পরিবর্ত্তনের পর সভ্যতা কি আকার নেবে তা নির্ভর করছে সমাজ যে ভাবে পরিবর্ত্তিত হবে তার ওপর। একদল বলছেন, শিক্ষার দ্বারা সমাজের স্তরকে উন্নত করতে হবে; অন্যদল বলছেন, স্তর-বিভাগের জন্যই সর্ব্বনাশ হয়েছে, অতএব বিপ্লবের প্রয়োজন। প্রথম দলের একজন প্রতিনিধি পিঙ্ক্—যাঁর অন্য একটি লম্বা প্রবন্ধ, A Realist Looks at Democracy, কিছুদিন পূর্ব্বে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় দলের প্রতিনিধি, জন্ ষ্ট্রেচী যাঁর মতামত শ্রমিকদলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে উঠেছে। দুজনই সভ্যতার হিতকামী, দুজনই সাধারণতন্ত্রের দোষ সম্বন্ধে সচেতন। এ ছাড়া তাঁদের মতে অন্য কোন মিল নেই। সভ্যতার দুর্দ্দিনে দুই শ্রেণীর এই দুইজন সত্যসন্ধিৎসু লেখকের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

পিঙ্ক্ বলেন—সভ্যতা কালাতীত নয়, কাল-সাপেক্ষ, বর্ত্তমান যুগের চিহ্ন হল বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য; অতএব বর্ত্তমান সমাজের যে সব আচার-ব্যবহার ও শিক্ষা-দীক্ষা বিজ্ঞান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের প্রতিকূল সেগুলিকে বর্জ্জন করতে হবে। কিন্তু বর্জ্জন করা শিক্ষিতব্যক্তির পক্ষেও শক্ত, কারণ বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বাধাবিপত্তি সৃজন করে। বিশেষতঃ, গ্রীস, রোম, ও মধ্যযুগের অন্ধসংস্কার এবং পুরাতন অনুষ্ঠান আমাদেরকে বর্ত্তমানের উপযোগী সভ্যতা সৃষ্টি করতে বাধা দেয়। এবং সেজন্য ইতিহাসশিক্ষাই দায়ী। ইতিহাস হয় বিজ্ঞান, না হয় কল্পনা-বিলাস। ইতিহাস বিজ্ঞান হতেই পারে না, অতএব গলস্ওয়ার্দ্দির 'ফরসাইট সাগা' না পড়ে ভিক্‌টোরীয়ান যুগের মোটা মোটা ইতিহাস পড়া নিরর্থক। ইতিহাস আমাদের এমন কোন্ মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রে দিতে পারে যার দ্বারা আমরা ভবিষ্যতের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি? ঐতিহাসিকদের মধ্যেই মতের কোন ঐক্য নেই, অতএব তাঁদের কোন মতামতই ভবিষ্যৎ সমাজের উপকারে আসতে পারে না।

ইতিহাসের মধ্যে যে মূলতথ্য সমাজের কার্য্য-নিয়ামক বিধি বেঁধে দিতে পারে, সেটি ঐতিহাসিকের সংস্কার নয়, সেটি হল যুগ-ধর্ম্ম। যুগ-ধর্ম্ম কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়-বস্তু নয়। বিষয়-বস্তুটি ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট ও সাহিত্যের শিক্ষাপদ্ধতিতে ঐতিহাসিক মনোভাবই প্রকৃত রস-চর্চ্চার অন্তরায় হয়েছে। বিজ্ঞান শিক্ষার বেলাও তাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সামাজিক হিতসাধন থেকে বিচ্যুত। সেখানে বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞান আলোচিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে স্বাধীনতা ও ভদ্রতা লোপ পাচ্ছে—ফ্যাসিজ্‌ম্ ও কম্যুনিজমের পীড়নে। তাই পিঙ্ক্ সাহেব বলছেন—শিক্ষার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নতুনভাবে শিক্ষা দিতে হবে, বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়কে ঢেলে সাজতে হবে। তিনি চান প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবতত্ত্ব, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব পড়ুন, কারণ এই বিদ্যাগুলিই যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ-সাধন করতে সমর্থ। এক কথায়, প্রত্যেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের এবং এই কালের উপযুক্ত সমাজ সৃষ্টি করার সুযোগ প্রস্তুত করুক। শিক্ষার বিষয়গুলিকে

যুগধর্ম্মের উপযুক্ত করে সাজাবার পর রিসার্চ্চের কথা ওঠে। এখনকার যে রিসার্চ্চ হচ্ছে সে সব উদ্দেশ্যহীন ও এলোমেলো। তাদেরকে সামাজিক কল্যাণের দ্বারা গ্রথিত করতে হলে একটি দেশ-জোড়া শিক্ষা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করা চাই। তার পর আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষা-সমিতির প্রয়োজন। পিঙ্কের মতে, শিক্ষার দ্বারা সভ্যতাকে প্ল্যানের মধ্যে আনিতে হবে। অবশ্য প্ল্যান তৈরী করবেন উচ্চশিক্ষিতেরা, যাঁদের সংখ্যা অল্প, কারণ যে-সে লোক শিক্ষিত হতেই পারেনা, সাধারণ-তন্ত্রবাদী জন-সাধারণ যাই বলুক না কেন। সভ্যতা-উদ্ধারের ভার রাম-শ্যামের হস্তে ন্যস্ত করে ওয়েলসের কোন বংশধরই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—শ্রেণীগত আভিজাত্যে এবং উচ্চশিক্ষার অভিমানে আঘাত লাগে।

এ সব কথা আমাদের নিতান্তই মনোমত। জাতি-ভেদ ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-সঙ্কুল, সাধারণ-তন্ত্রে অনভ্যস্ত দেশে পিঙ্কের মন্তব্য সোজাসুজি মরমে পৌছবে। তাঁর লেখা আবার বুদ্ধির উজ্জ্বলতায় দীপ্ত। কিন্তু গম্ভীরভাবে পিঙ্কের মন্তব্য আলোচনা করলে মনে হয় (সে আলোচনায় ষ্ট্রেচীর বইখানি খুব সাহায্য করবে) যে কুলীনের দ্বারা সভ্যতার কুল ও শীল রাখা বর্ত্তমান যুগে অসম্ভব। তাঁদের দ্বারা সভ্যতার পঙ্কোদ্ধারও হবে না, নতুন সভ্যতার মৃত্তিকা-খননও হবে না। তাঁদের বংশ, বুদ্ধি ও শিক্ষার গৌরব সমাজের একটি শক্তিশালী শ্রেণীর আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র। স্ত্রৈণ স্বামী যেমন নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করার জন্য উচ্চৈস্বরে নিজের পৌরুষ প্রকাশ করেন, তেমনিভাবে এই কুলীন-সম্প্রদায় তাঁদের শ্রেণীগত কুসংস্কার ও ভয়-ভাবনাগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখবার জন্যই উচ্চশিক্ষা, বুদ্ধি ও সুপ্রজননের জয়গান করেন। যাঁরা পঙ্কিল করেন কিম্বা পঙ্কজের সামিল তাঁদের হাতে পঙ্কোদ্ধারের ভার দেওয়া মূর্খতা। আসল কথা এই—যে সামাজিক কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের আশ্রয়েই শিক্ষিত সম্প্রদায় গঠিত হয়েছেন। সেই জন্য মুখে হা হুতাশ করাই তাঁদের শোভা পায়, সভ্যতা রক্ষা করা, নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করা, সমাজ-সংক্রান্ত কোন জটিল সমস্যার নিরাকরণ করা তাঁদের সাধ্যাতীত। অন্তত পশ্চিম য়ূরোপে ও আমেরিকায়। সে দেশে তাঁদের অপারগতা যুগধর্ম্মেরই চিহ্ন, অর্থাৎ ঐতিহাসিক নিয়তির, অনিচ্ছার নয়। এ দেশে হয়ত তাঁদের কাজ এখনও বাকী রয়েছে। ষ্ট্রেচী এই কথা বলছেন, ইতিহাসের ধর্ম্ম ও রীতির নজীরে। পিঙ্ক ইতিহাস মানেন না, সেই জন্য বিশ্ব-নাট্যের কোন ভূমিকায় কুলীন সম্প্রদায় অভিনয় করছেন কিম্বা ভারতবর্ষের মতন দেশে করতে পারেন তিনি বুঝতেই পারেন নি। অথচ পিঙ্ক সাহেব যুগ-ধর্ম্ম মানেন! যুগধর্ম্মের একটা পারম্পর্য্য আছে, তার কারণ আবিষ্কার করাই ইতিহাসের প্রধান কাজ। সেই কারণের ফলাফল ও অর্থ নিরূপণ করাই প্রত্যেক সমাজ-তাত্ত্বিকের কাজ। যে কাজ পিঙ্ক করতে পারেননি সে কাজ ষ্ট্রেচী সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।

যুগধর্ম্ম কথাটি ধরতাই বুলি হয়ে উঠেছে। তার প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝবার জন্য ষ্ট্রেচীর বইখনি পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। এমন বই এক যুগে একখানা লেখা হয়। বর্ত্তমান সভ্যতার মূলধারা ও তথ্যটি এই বইখানিতে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, লেখকের জানিত ইংরেজীতে লেখা আধুনিক অন্য কোন বইতে অমনভাবে হয়নি। ষ্ট্রেচীর মতে এই যুগের বৈশিষ্ট্য হল, উপনিবেশে ধনতন্ত্রের বিস্তার, এবং বিস্তারের কারণ, অ-নিয়ন্ত্রিত বাজারের সন্ধান। দেশের ধনী-সম্প্রদায় স্বদেশী বাজারের অবস্থা দেখে শুনে উপলব্ধি

করেছেন যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে মুনাফা কমবে বই বাড়বে না। সেজন্ত তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ করতে মনস্থ করেছেন। এক পন্থা হল, বৃহৎ সমবায়ের রচিত একচেটিয়া-ব্যবসার দ্বারা উৎপাদনের মাত্রা কমান, অন্য পন্থা হল বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন ও পরিদর্শন-কার্য্যের অযথা অপব্যয়কে লঘু করা। মামুলী অর্থশাস্ত্রের monopoly, crisis ও planned economyর মতগুলি অনুশীলন ক'রে ষ্ট্রেচী দেখাচ্ছেন যে তার মধ্যে সার-পদার্থ কিছুই নেই, আছে শুধু ধনতন্ত্রকে যা করে হোক রক্ষা করবার নিষ্ফল প্রয়াস, আছে শুধু ধনতন্ত্রে পুষ্ট অধ্যাপকদের ধনতন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ। ষ্ট্রেচীর মতে কেন্‌স্ ও শ্লেটার প্রবর্ত্তিত planned economy এই অধোগামী ধন-তন্ত্রকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। ইতিহাস, অর্থাৎ যুগ-পরম্পরার রীতি অনুসারেই উপনিবেশের মধ্য দিয়ে ধন-তন্ত্রের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? বুদ্ধিজীবীর কর্ত্তব্য হল লেবার-পার্টির হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে শ্রমিকদের হাতে দেওয়া, সেই সঙ্গে উপনিবেশ-গুলিকে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষকে মুক্তি দেওয়া। ষ্ট্রেচী যুগধর্ম্মের প্রকৃতি ও ইতিহাসের রীতিনীতি বুঝে শ্রমিকতন্ত্রে বিশ্বাসী, এবং পিঙ্ক্ সাহেব ইতিহাসের মর্ম্ম না গ্রহণ করে যুগ-ধর্ম্ম অনুসারে বুদ্ধিজীবীর দ্বারা সভ্যতা-সৃষ্টির প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

পরিচয়ের পাঠকবর্গকে ষ্ট্রেচীর অন্তত ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্য নামের তিনটি অধ্যায় পড়তে অনুরোধ করছি। ধর্ম্ম কেন এখন য়ুরোপ থেকে লোপ পেয়েছে, বিজ্ঞান কেন সেখানে আর অগ্রসর হতে না পেরে মিথ্যাদর্শনের আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছে, বর্ত্তমান সাহিত্যে কেন এমন ভীষণ নৈরাশ্যের ছাপ পড়েছে জানবার জন্য বইখানি পড়া আবশ্যক। ষ্ট্রেচীর মতে কারণ হল এই যে সমাজের বর্ত্তমান গঠনে সব মূল্যের মাপকাঠি হয়েছে টাকা—তাই হতে বাধ্য, যতদিন সমাজ এমন শ্রেণীর থাকবে যাঁদের সকল কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি করা। যেদিন মুনাফার বদলে কল্যাণ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করতে পারবে সেদিন ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সুদিন আসবে। যতদিন শ্রেণীবিভাগ থাকবে ততদিন কল্যাণ-চিন্তাও অসম্ভব, ততদিন ধর্ম্ম হবে সামাজিক ক্ষতের প্রলেপ মাত্র, বিজ্ঞান হবে যুদ্ধবিদ্যার অঙ্গ, ও সাহিত্য হবে নিরর্থক বুদ্ধিবিলাস। ষ্ট্রেচীর বই মুখ্যত ইংরেজের জন্য লেখা হলেও, তার মূল কথাগুলি নিয়ে আলোচনা করলে ভারতবাসীর লাভ বই ক্ষতি হবে না। এ ধরণের নির্ভীক বই এ দেশে লেখা সম্ভব নয়—এইটাই সব চেয়ে বড় দুঃখ। বাংলা দেশের প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রীর বইটা পড়া উচিত বললে যথেষ্ট বলা হলো না। তাঁরা যদি ভাল করে এই বইটা পড়েন তা হলেই বুঝব যে ভবিষ্যৎ সমাজ রচনা করবার জন্য তাঁরা খানিকটা প্রস্তুত হয়েছেন। সমাজতত্ত্ববিষয়ক এত উৎকৃষ্ট বই সচরাচর চোখে পড়ে না।

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক—শ্রীজগবন্ধু দত্ত, ষ্টিফেন হাউস, ৪ ও ৫, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।
মডার্ণ আর্ট প্রেস, ১।২, দুর্গা পিতুড়ি লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীজগবন্ধু দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।